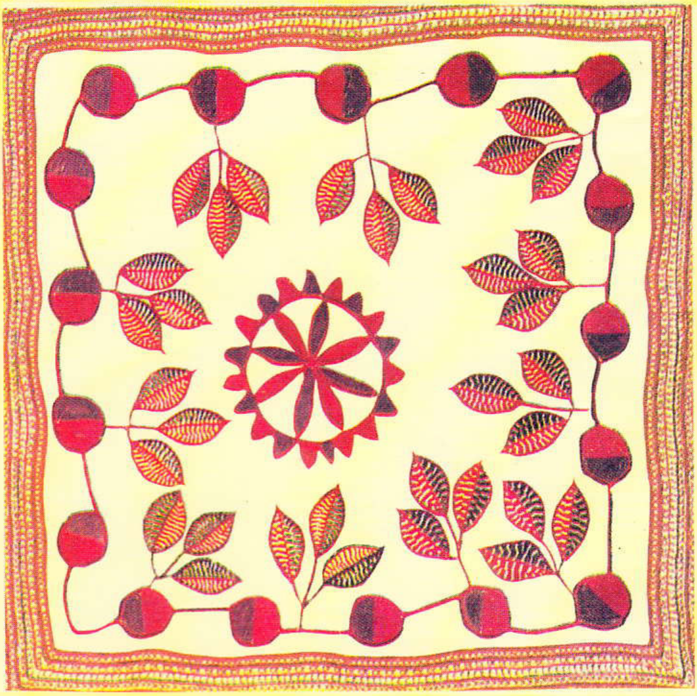
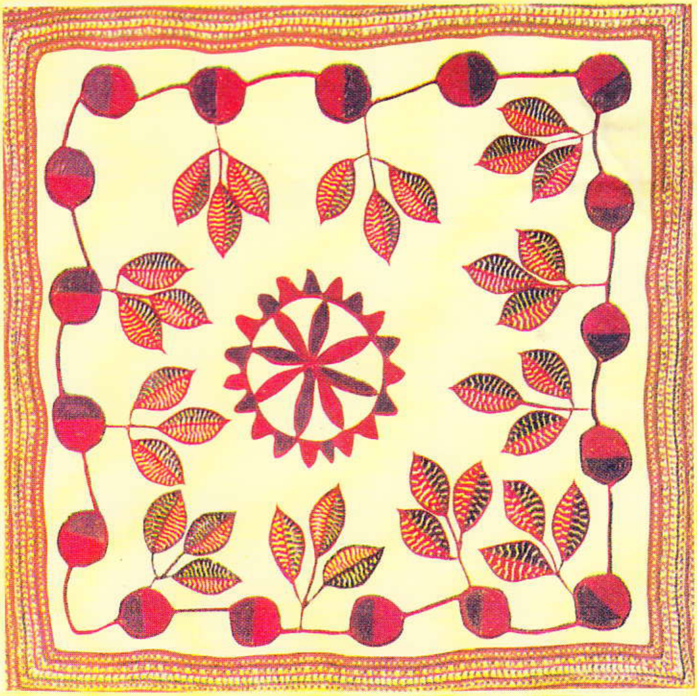


অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ শিল্প প্রবন্ধাবলী



আলোকিত মানুষ চাই

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ শিল্প-প্রবন্ধাবলি

সম্পাদনা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ৪৭

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
ফাল্গুন ১৩৯৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
আষাঢ় ১৪১৮ জুন ২০১১

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা ১০০০ ফোন ৯৬৬০৮১২ ৮৬১৮৫৬৭

মুদ্রণ
প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
৬৭ নয়াপল্টন, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আমীরুল ইসলাম

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0046-9

BEST ESSAYS ON AESTHETIC by ABANINDRANATH TAGORE
Publised by Bishwo Shahitto Kendro
14, Kazi Nazrul Islam Avenue Dhaka 1000 Bangladesh
3rd Edition : June 2011; Price **Tk. 120.00** only

ভূমিকা

অমর চিত্রকর, কথাশিল্পী ও নন্দনতত্ত্ববিদ অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুরবাড়িতে ১৮৭১ সালে। সম্পর্কে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাইপো, তবে রবীন্দ্রনাথ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাঁর একটি পরিচিতি ছিল—তাঁর সাহিত্যরচনা, তাঁর চিত্রাঙ্কন-শিল্প ছিল নিজস্বতায় ভাস্বর। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ যদিও কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ থেকে অনেক বেশি পরিচিত, তাঁর সাহিত্যপ্রতিভা ছিল সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর নানা লেখায় এই প্রতিভার পরিচয় মেলে। চিত্রকর বিনোদবিহারীর মতে, অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠেছিল কবির আবেগ ও চিত্রশিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গির মিলন ও সংঘাতের মধ্যদিয়ে, অর্থাৎ তাঁর সাহিত্য ও চিত্রকলার মধ্যে একটি যোগসূত্র সবসময় কার্যকর ছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁকে বলেছিলেন : 'তুমি লেখো না, যেমন করে তুমি মুখে মুখে গল্প কর, তেমনি করেই লেখো'; আর তিনি নিজে বলতেন, তিনি যখন লেখেন, ছবি আঁকার মতো সহজে সব কথা কাগজে চলে আসে। অর্থাৎ অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সহজাত শিল্পী। কিন্তু এই সাহজাত্য কোনো তাৎক্ষণিক প্রস্রবণের ব্যাপার ছিল না, বরং এটি অর্জিত হয়েছিল মনন ও মেধার চূড়ান্ত উৎকর্ষের মধ্যদিয়ে যেমন, ঠাকুরবাড়ির শিল্প-সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে আশৈশব লালিত হওয়ার মধ্যদিয়েও তেমনি।

শিল্পচর্চায় অবনীন্দ্রনাথ যে-প্রাচ্যরীতির প্রবর্তন করেন, যে-কারণে তাঁকে ওরিয়েন্টাল আর্টের পুনরুজ্জীবক বলা হত, তা থেকে তাঁর সাহজাত্যের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। একদিকে এই চিত্রকলা ছিল সহজ ও সুললিত, অবনীন্দ্রনাথের ভাষায় তাঁর তুলি ছিল রঙের একটি যন্ত্র, যা সুরে ও তালে বেজে চিত্র সৃষ্টি করত। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে, অন্যদিকে, এই চিত্রকলার অন্তর্নিহিত রুচি, পরিচ্ছন্নতা, সুমিতি, পরিমিতি এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল চোখে পড়ে। এতসব গুণাবলি একসাথে ধরে রাখা সাধারণ কোনো শিল্পীর পক্ষে-যে সম্ভব নয়, বলাই বাহুল্য। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভা ছিল সেই বিরল শ্রেণীর যার স্পর্শে সামান্যও অসামান্য হয়ে উঠত। প্রতিদিনের পরিচিত দৃশ্যাবলি যেত পাল্টে, দর্শকের গূঢ় অন্তঃপুরে তাঁর ছবির বাণী সহজেই প্রবেশ করত। তাঁর অসংখ্য ছবি থেকে মাত্র দুটি ছবির উদ্ধৃতি দিয়ে বোঝার চেষ্টা করা যায় তাঁর ছবিকে কেন অনেক সমালোচক রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তুলনা করেছেন। ছবি দুটি হল : 'কোনার্কের পথে' ও 'কোনার্কের প্রান্তে'। আভাস ও ব্যঞ্জনা দিয়ে সসীমকে অসীমে মূর্ত করা, আবার অনন্তকে সান্তের মধ্যে ধরে রাখা এতখানি পরিপূর্ণভাবে শুধু রবীন্দ্রনাথের গানেই সম্ভব।

অবনীন্দ্রনাথের বেড়ে-ওঠার মধ্যেই ছিল গান, সুর, চিত্ররেখা এবং গল্পকাহিনীর নানা উপাদান। প্রয়োজনীয় প্রতিভাস্পর্শে একসময় এই সম্ভাবনা যখন বাস্তব রূপ নিয়েছে, তিনি

হয়ে উঠেছেন অপ্রতিরোধ্য কথাশিল্পী, চিন্তাবিদ, চিত্রকর ও নন্দনতত্ত্ববিদ। চিত্রকর্মের উৎসাহ তিনি পেয়েছেন তাঁর পিতা-পিতামহের কাছ থেকে। পিতামহ গিরীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী, পিতা গুণেন্দ্রনাথ আর্টস্কুলের প্রথম কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম। বৃদ্ধ বয়সেও অবনীন্দ্রনাথ তাঁর দুই সহোদর গগনেন্দ্রনাথ ও সমরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সান্নিধ্যে থেকে ছবি আঁকার কাজটি চালিয়ে গেছেন। জসীমউদ্‌দীন তাঁর 'অবন ঠাকুরের দরবারে' নামক স্মৃতিরচনায় এই তিন সহোদরের একটি বর্ণনা দিয়েছেন : 'সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া একখানা ঘর পার হইয়া দক্ষিণধারের বারান্দা। সেখানে তিনটি বৃদ্ধলোক ডানধারের তিনটি জায়গায় আরামকেদারায় বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। কোথাও টুঁ-শব্দটি নাই। দুইজন ছবি আঁকিতেছেন, আর একজন বই পড়িতেছেন। প্রত্যেকের সামনে একটি করিয়া আলবোলা।' ঠাকুরবাড়ির যে-কোনো বর্ণনায় এই পরম সম্পৃক্তি ও সহযোগিতার চিত্রটি পাওয়া যায়। যে-কোনো শৈল্পিককর্ম-যে এই পরিবেশে উৎকর্ষ লাভ করে, তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

অবনীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পী হিশেবে বিকাশের পক্ষে যতখানি সম্ভাবনা ও সুযোগ ছিল, কথাশিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং উৎকর্ষ লাভের সুযোগ-সম্ভাবনাও ছিল তেমনি। তিনি উভয়ক্ষেত্রে তাঁর পূর্ণ অভিনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। প্রধানত রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে অবনীন্দ্রনাথ একের পর এক 'শকুন্তলা' 'রাজকাহিনী' 'ক্ষীরের পুতুল' 'ভূত পত্‌রীর দেশ' 'বুড়ো আংলা' ইত্যাদি কথাকাহিনী লিখে ফেলেন। রানি চন্দসহ যাঁরাই অবনীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে গেছেন, তাঁরাই তাঁর অসাধারণ গল্পবলার ক্ষমতার কথা লিখেছেন। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে তিনি নানা গল্প বলতেন, তারা সম্মোহিতের মতো শুনত। তাঁর ছেলে অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর দীর্ঘদিন পর পিতৃস্মৃতি তর্পণ করতে গিয়ে লিখেছেন : 'সন্ধ্যা হলেই আমরা চারজন—তিনবোন আর একভাই তিনতলার পাথরের ঘরে সেজের আলো জ্বেলে বসতুম আর বাবা মহাভারত কিংবা রামায়ণ থেকে ছোটদের উপযোগী করে মুখে-মুখে গল্প শোনাতেন। কী চমৎকার গল্প বলতে পারতেন, যে সব ছোট ছেলেমেয়েরা তাঁর মুখে গল্প শুনেছে, তারা কোনোদিন তা ভুলতে পারবে না।'

অবনীন্দ্রনাথের সকল লেখার প্রধান যে-গুণ, তা হল পাঠককে সম্মোহন করার বা তাঁকে ধরে রাখার ক্ষমতা। তাঁর কথাকাহিনীর বেশিরভাগ পৌরাণিক নানা সূত্র, প্রচলিত লোককাহিনী ইত্যাদি থেকে নেয়া, অনেকগুলি তাঁর নিজের সৃষ্টি। তাদের গল্প বা আখ্যানভাগটি যখন তাঁর বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে ওঠে, পাঠক তার প্রবল আকর্ষণে নিপতিত হন। কিন্তু এসব কাহিনীতে ও তাঁর অন্যান্য গল্পে শুধু গল্পকাঠামোর অনিবার্যতাই পাঠক-সম্মোহনের জন্য দায়ী তা নয়, বরং তাঁর ভাষা-ব্যবহার ও গল্পের একটি বুদ্ধিগত দিক নির্দিষ্ট করে দেওয়াও সমানভাবে উল্লেখযোগ্য। অবনীন্দ্রনাথ সহজ কথাকে সহজে বলার অসাধ্য সাধন করেছিলেন, কিন্তু জটিল কথাকে সহজে বলার দুরূহ প্রক্রিয়াটিও রপ্ত করেছিলেন। ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রানি বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিশেবে শিল্প ও নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে তিনি যে-উনত্রিশটি বক্তৃতা দেন, সেগুলো পড়লে বোঝা যায়, অনুভবের ব্যাপ্তি কতটা বিশাল হলে একজন চিন্তাবিদ এত জটিল বিষয়ে এত সহজে পদচারণা করতে পারেন। কিন্তু যখন শিল্প-প্রবন্ধাবলি পড়তে বসি,

সরাসরি বিষয়ের গভীরে আমরা প্রবেশ করি; ভাষা বাধা না-হয়ে চমৎকার পথপ্রদর্শকরূপে কাজ করে, আমাদের চিন্তাকে জাগ্রত ও সংহত করে।

অবনীন্দ্রনাথের নন্দনচিন্তায় যে-সিনক্রেটিজম বা সমন্বয়বাদ কার্যকর ছিল, তা তাঁর বহুবিচিত্র কর্মপ্রয়াসকে একটি কেন্দ্রে সংহত করার প্রচেষ্টা থেকেই উদ্ভূত। এ-কারণে তাঁর শিল্পসৃষ্টির বৈচিত্র্য সত্ত্বেও যেমন সাহিত্যসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর কোনো সংঘাত নেই, তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির বৈচিত্র্যময় জগতেও তেমন কোনো অসঙ্গতি চোখে পড়ে না। কথা-কাহিনীর সঙ্গে ভ্রমণবৃত্তান্তের, স্মৃতি রোমন্থনের সঙ্গে তাত্ত্বিক আলোচনার কোনো বিরোধ নেই। কারণ সব লেখার মূলে একটি তাড়না—শৈশবে গল্প-শোনার ও পরে গল্প-বলার আসরে যা বর্ণনাকারী ও শ্রোতার মধ্যে যোগাযোগটি রচনা করত—অন্তর্নিহিত বাণীটি যথাস্থানে পৌঁছে দেয়া। যেখানে অনেক লেখা অস্পষ্ট, ঘোলাটে অথবা ভাষার চালাকিতে পর্যুদস্ত, সেখানে অবনীন্দ্রনাথ সাবলীল, সহজ এবং সুখপাঠ্য, চারুবাক। যে-স্থানে তিনি ধ্বনির আকর্ষণে কিছুটা বিপথগ্রস্ত, সেখানেও তাঁর প্রকাশ অনন্য। ভূদেব চৌধুরী অবনীন্দ্রনাথকে এভাবে মূল্যায়ন করেছেন : ''অবনীন্দ্রনাথের বাক্‌রীতির অপরূপ জাদু ঐ তুলনাহীন সরলতার লাবণ্যে : এ তাঁর 'শিশুসুলভ' 'কল্পনা'র—ইংরেজি করে বলতে হয় 'ফ্যান্সি ও ফ্যান্টাসি'র অবাধমুক্তির রহস্য দিয়ে গড়া...। শিশুর মতো তরুণ-চোখ এবং গোটা মনটিও ছিল অবনীন্দ্রনাথের, আর ছিল শৈশবমুগ্ধ অতৃপ্ত অদম্য ভালোবাসা। সেসবই বিছানো আছে তাঁর আগাগোড়া লিপিকর্মে। ব্যক্তিত্বের সেই নিভৃতি থেকে জাগে রেখাবলয়িত কথার স্রোত—ছবিকে, অর্থকে ছাপিয়ে যা সুর হয়ে দেখা দেয়।'

বিচিত্র ধরনের অনেক লেখা লিখেছেন অবনীন্দ্রনাথ : রূপকথা বা গল্পকাহিনী, শিল্পতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, বিবৃতিমূলক লেখা, প্রবন্ধ, ইতিহাস-বিষয়ক আলোচনা, স্মৃতিকথা, ব্যক্তিজীবনী, ভ্রমণকাহিনী, কবিতা। এর কোনোটি চলিত ভাষায় রচিত, কোনোটি সাধুভাষায়। সাধুভাষায় যখন লেখেন অবনীন্দ্রনাথ, তাতে নিরীক্ষাধর্মী অনেক উপাদান থাকে, বিচিত্র হয়ে ওঠে সেই ভাষা। শব্দের ব্যঞ্জনার প্রতি তাঁর ছিল প্রবল আকর্ষণ। অনেক সময় এমন সব শব্দ আবিষ্কার করেছেন, যেগুলি ধ্বনিকে অনর্গল প্রকাশ করে, কিন্তু কোনো অভিধানে তাদের অস্তিত্ব নেই। 'খানিক পরেই গাড়ির শব্দ—বড় দাড়ালু চাড়লু নাইডু, বর দারলু চারলু নাইডু , গডু দাড়ালু গুডু দারলু—ছিরিকর্ম বললে মান্দ্রাজি মেল ছাড়ল।' মদ্রাজি মেলের নিজস্ব গতির চাল এই উদ্ভট শব্দাবলিতে ধ্বনিত হয় বটে, কিন্তু পাঠককে ক্ষণিকের জন্য হলেও এক বিচিত্র ধ্বনির জগতে নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতাকে পরিবর্তিত করার জন্য এই শব্দ-ব্যবহার অত্যন্ত কার্যকরী। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর গম্ভীর প্রবন্ধসমূহের কোনো-কোনো স্থানেও শব্দ নিয়ে খেলায় মেতে যান, পাঠকের নিজস্ব শব্দকল্প ও দৃশ্যকল্পের ভেতরে একটি সংযোগ ঘটানোই যেন তাঁর উদ্দিষ্ট। শিশুসাহিত্য বা রূপকাহিনীতে এর প্রয়োজন অনেক, কিন্তু প্রবন্ধসাহিত্যে এর উপযোগিতা একটি গূঢ় নন্দনতাত্ত্বিক বিচারেই শুধু বৈধ। সেই নন্দনতাত্ত্বিক বিচারটি কল্পনার সার্বভৌমত্ব থেকে উদ্ভূত।

বাগেশ্বরী শিল্প-প্রবন্ধাবলিতে অবনীন্দ্রনাথ কল্পনাকে ভাব ও ভাষার সেতুবন্ধ বলে বর্ণনা করেছেন, এই কল্পনা আবার লীলার বাহন। যদি ভাবের দ্বার অবারিত না হয়,

লীলার অশেষ চিত্রটি ধরা দেবে না। এজন্য অবনীন্দ্রনাথের লেখায় বারে বারে আহ্বান আসে মনকে ছাড়িয়ে দেয়ার, কল্পনার ঘোড়াকে ছুটিয়ে দেয়ার। একটি উদ্ভট বাক্যবন্ধ, কয়েকটি খাপছাড়া শব্দও-যে এই আহ্বান ধ্বনিত করতে পারে, সচেতন এই জীবনশিল্পী তা ঘনিষ্ঠভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ভাষার সাধু ও চলিত রীতিতে যত সম্ভাবনা আছে, সব তিনি এই উপলব্ধি থেকেই যেন রূপায়িত করেছেন। ১৩২২ সালের আগে পর্যন্ত তাঁর সকল গল্প বা গল্পশ্রেণীর লেখায় সাধুগদ্য ব্যবহৃত হয়েছে। আবার যখন চলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন—বাগেশ্বরী প্রবন্ধাবলি যেহেতু বক্তৃতা, সেহেতু চলিত ভাষায় রচিত; কিন্তু এর বাইরেও অনেক প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা এমনকি গল্পও চলিত ভাষায় রচিত—তখন এই ভাষারীতির অন্তর্গত সকল সম্ভাবনাকে মূর্ত করেছেন একই কুশলতায়। অবনীন্দ্রনাথ প্রকৃতই ভাষার শিল্পী, কিন্তু ভাষা তাঁর চিত্রকলার মতো, এত জীবনসংলগ্ন এবং পরিমার্জিত যে মনে হয় তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে পাঠকের রুচিকেই পরিবর্তিত করতে চাচ্ছিলেন। মানুষ যাতে জীবনঘনিষ্ঠ হয়, যাতে মানুষের ভাষা তাঁর ভাবকে প্রকৃষ্টভাবে বহন ও প্রকাশ করতে পারে এবং এই প্রকাশ হয় মননশীল, পরিশীলিত—এই ছিল তাঁর অধ্যবসায়। রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ সম্পর্কে, যে তিনি 'দেশকে উদ্ধার করেছিলেন আত্মনিন্দা থেকে আত্মগ্লানি থেকে তাঁকে নিষ্কৃতি দান করে তাঁর সম্মানের পদবি উদ্ধার করেছেন।' এ শুধু ভারতীয় চিত্রকলার সুবর্ণ পুনরুত্থানের মধ্যদিয়ে নয়; কল্পনার সঞ্জীবনী শক্তিকে সর্বত্র উত্তরণের উপায় হিসেবে দেখিয়ে, সাহিত্যে একটি অধঃপতিত জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশভঙ্গির পুনরুজ্জীবন দেখিয়ে নন্দনতাত্ত্বিক এক জীবনবোধ ও সত্যনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির পুনর্জাগরণ দেখিয়ে তিনি এই বিশাল কর্মটি সম্পাদন করেছিলেন। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে যাদের সামূহিক পরিচয় আছে, তারা জানবেন একটি ক্ষুদ্র রূপকথা বা রাজাকাহিনী অথবা সামান্য একটি স্মৃতিচারণের মধ্যদিয়েও তিনি পাঠকের অন্তরে কী অনায়াসে প্রবেশ করেছেন। সেখানে একটি গোপন তন্ত্রীতে অতঃপর ঘা দেয়া এবং এর পরিণামে ঐ পাঠকের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় কোনো 'নিষ্কৃতি' লাভ আর দুঃসাধ্য কিছু থাকে না।

'শকুন্তলা' দিয়ে শুরু হয় অবনীন্দ্রনাথের যাত্রা। শকুন্তলা, কন্বদেব—দুষ্মন্ত-দুর্বাসার গল্প, পৌরাণিক তাঁর উৎস। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের হাতে তা হয়ে উঠল আমাদের চিরচেনা কোনো গল্পকাহিনী। তাঁর আরম্ভটা পাঠককে থমকে দেয় : 'এক নিবিড় অরণ্য ছিল। তাতে ছিল বড় বড় বট, সারি সারি তাল-তমাল, পাহাড়-পর্বত, আর ছিল—ছোট নদী মালিনী।' অবনীন্দ্রনাথের শব্দবৈচিত্র্য, অনুপ্রাস ও ধ্বনিপ্রীতি এবং ক্রিয়াপদের আশ্চর্য ব্যবহারের সঙ্গে আমরা পরিচিত হই এবং আমাদের এই পরিচিতি তাঁর শেষ লেখাটি পর্যন্ত অটুট থাকে। ১৮৯৫ সালে 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সেই 'তুমি লেখোই না' অভয়বাণী মাথায় নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। তাঁর নিজের ভাষায় : "একদিন সাহস করে বসে গেলুম লিখতে। লিখলাম একঝোঁকে একদম শকুন্তলা বইখানা। লিখে নিয়ে গেলুম রবিকাকার কাছে, পড়লেন আগাগোড়া বইখানা, ভালো করেই পড়লেন। শুধু একটি কথা 'পল্বলের জল' ওই একটিমাত্র কথা লিখেছিলেম সংস্কৃতে। কথাটি কাটতে গিয়ে 'না থাক' বলে রেখে দিলেন। আমি ভাবলুম, যাহ্। সেই প্রথম জানলুম, আমার বাংলা বই লেখার ক্ষমতা আছে। এত-যে অজ্ঞতার ভিতরে ছিলুম,

তা থেকে বাইরে বেরিয়ে এলুম।" সেই আসা ছিল একটি চমৎকার যোগাযোগের ব্যাপার : রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ এবং তাঁর নিজের উদ্যম।

লক্ষণীয় : অবনীন্দ্রনাথ নিজের কাছে, নিজের ভাষার কাছে, নিজের সম্ভাবনার কাছে ছিলেন কতখানি বিশ্বস্ত। তারপর ঠাকুর-পরিবারের 'বাল্যগ্রন্থাবলি' সিরিজে তিনি লিখেছেন 'ক্ষীরের পুতুল', ১৮৯৬ সালে যা প্রকাশিত হয়। লিখেছেন 'রাজকাহিনী', 'ভূত পত্রীর দেশ', 'নালক'। প্রতিটি রচনার একটি পটভূমি আছে, প্রতিটি লেখা একটি সচেতন সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে দিনের আলোতে এসেছে। যদিও 'শকুন্তলা' প্রসঙ্গে বলেছেন অবনীন্দ্রনাথ যে একঝোঁকে লিখে গেছেন, এই স্বতঃস্ফূর্ততার মধ্যে ছিল ভাষা ও ভাবের প্রতি একনিষ্ঠ অভিনিবেশ, ছিল গল্পের ভিতরে একটি চিন্তার বীজ ছড়িয়ে দেয়া, যা এই রূপকথাটিকেও নতুন দৃষ্টি নিয়ে দেখার সুযোগ করে দেয়। অবনীন্দ্রনাথের গদ্যশৈলীর বড় গুণ এই যে, তাঁর বক্তব্য কখনো দীর্ঘায়িত হয় না, অপ্রয়োজনীয় বা একপেশে হয়ে পড়ে না, বর্ণনা অতিরঞ্জন বা একঘেয়েমির ছোঁয়া থেকে থাকে মুক্ত। সুখপাঠ্য ঝরঝরে ভাষা, বিষয়বস্তু সুনির্দিষ্ট স্পষ্ট। পড়া হয়ে গেলে আবার পড়ার ইচ্ছা জাগে।

যদিও শিশুসাহিত্য বা গল্প বা কাহিনী-লেখক হিসেবে তিনি সুপরিচিত, বর্তমানের পাঠক তাঁকে নন্দনতত্ত্ববিদ হিসেবে মূল্য দেয় বেশি—হ্যাভেলের ছাত্র হিশেবে, ওরিয়েন্টাল আর্ট-এর পুনরুজ্জীবক হিসেবে তিনি যে-কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, শিল্পগুরুর অভিধাটি সর্বাংশে সার্থক করেছেন, তাঁর একটি তাত্ত্বিক প্রকাশ দেখা যায় শিল্পতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখা বা পঠিত প্রবন্ধাবলিতে। বাংলাদেশের শিল্প-দর্শনের বিরান অঞ্চল অবনীন্দ্রনাথ প্রায় একাই দখল করে আছেন। তাঁর মতো মৌলিক শিল্পচিন্তার অধিকারী রবীন্দ্রনাথের পর, সারা ভারতেও কম ছিলেন। কেন্টিশ কুমার স্বামী বা আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে এক্ষেত্রে অবনীন্দ্রনাথই ছিলেন একমাত্র মৌলিক চিন্তাবিদ। এজন্য তাঁর শিল্প-প্রবন্ধাবলির গুরুত্ব অপরিসীম।

কিন্তু গদ্যশিল্পী অবনীন্দ্রনাথকে জানতে হলে 'শকুন্তলা' থেকে শুরু করে তাঁর অগ্রগতি ও পালাবদলের সাথে সম্যকভাবে পরিচিত হতে হয়। অবনীন্দ্রনাথ শিল্পীর চোখ দিয়ে পৃথিবীকে দেখতেন, তাঁকে মূর্ত করতেন শিল্পীর দরদ ও বিশ্বস্ততা দিয়ে। তাঁর ভাষাও এজন্য হয়ে উঠত এতটা প্রাণময়।

'বাগেশ্বরী-শিল্প প্রবন্ধাবলি'-তে যদিও অবনীন্দ্রনাথ শিল্প ও শিল্প-প্রকরণ, সুন্দর ও অসুন্দর ইত্যাদির তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়ে পড়লেন, তাঁর প্রকাশের ভাষাটি হয়ে থাকল পূর্বের চেনা সহজ ও সরল ভাষা; তাঁর বর্ণনাভঙ্গির বিশিষ্ট সম্মোহনী শক্তিটি রইল অপরিবর্তিত। বাইরের পৃথিবীকে সরিয়ে এবার অবনীন্দ্রনাথের দৃষ্টি উঁকি দিল শিল্পের ও শিল্পীর গভীর অন্তঃপুরে। তিনি লিখলেন : 'শব্দের সঙ্গে রূপকে জড়িয়ে নিয়ে বাক্য যদি হল উচ্চারিত ছবি, তবে ছবি হল রূপের রেখার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে রূপকথা; অভিনেতার ভাষাকেও তেমনি বলতে পারো রূপে চলা-বলা-নিয়ে চলন্তি ভাষা।' শিল্পের নানা প্রকরণের সমন্বয়ে আবার এক সিনক্রেটিক শিল্পভাবনা। লীলা মজুমদার প্রয়াস পেয়েছেন এইসব প্রবন্ধে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পজিজ্ঞাসার একটি নির্ঘণ্ট নির্মাণে : 'শিল্প কাকে বলে জানতে হলে শিল্পী কাকে বলে তাও জানা চাই। কেন শিল্পী শিল্প সৃষ্টি করে,

সৃজনের কুঁড়ি কোথায় প্রথম রূপ ধরে, কোন্ নিয়মে সৃষ্টিকার্য চলে, এমনকি আদৌ কোনো নিয়মে চলে কি-না, শিল্পশাস্ত্র শিল্পীর মনে কতখানি রস জোগায়, এসবও জানা দরকার। শিল্পী কোথায় শিল্পের সামগ্রী খুঁজে পায়? বাইরের দৃশ্যমান জগতের সঙ্গে তার কী সম্বন্ধ? সে কি শুধু সুন্দরকেই খোঁজে? এই সুন্দরই বা কাকে বলে?—এত প্রশ্নের উত্তর তো সহজে মেলে না।'

মেলে না বটে, তবে অবনীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেছেন এবং অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। শিল্প নিয়ে যাঁরা ভাবেন, তাঁদের তিনি ভাবিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : 'বিশ্বজনের আত্ম-উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন।'

১৯৫১ সালে এই মহৎ শিল্পীর জীবনাবসান হয়।

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

সূচি

সুন্দর

কী সুন্দর এবং কী সুন্দর নয় এ নিয়ে ভারি গোলমাল বাধে যে রচনা করছে এবং যারা রচনাটি দেখছে বা পড়ছে কিংবা শুনছে তাদের মধ্যে; কেননা সবারই মনে একটা করে সুন্দর অসুন্দরের হিশেব ধরা রয়েছে, সবাই পেতে চায় নিজের হিশেবে যা সুন্দর তাকেই, কাজেই অন্যের রচনার সৌন্দর্যের হিশেবে সে নানা ভুল দেখে।

নিজের রচনাকে ইচ্ছা করে খারাপ করে দিতে কেউ চায় না, যথাসাধ্য সুন্দর করেই রচনা করতে চায় সবাই, কেউ পারে সুন্দর করতে কেউ বা পারে না। আমার হাতে বাঁশি দিলে বেসুরে বাজবেই, অকবি যে সে কবিতা লিখতে গেলে মুশকিলে পড়বেই। কচ্ছপ জলে বেশ সাঁতার দিত কিন্তু বাতাসে গা ভাসান দেওয়া তার পক্ষে একনিমেষও সম্ভব হয়নি, অথচ আকাশে ওড়ার মতো কবিতা ছবি ইত্যাদি রচনার ঝোঁক তাবৎ মানুষেরই মধ্যে রয়েছে। গান শুনে মনে হয় বুঝি আমিও গাইতে পারি, মন মেতে ওঠে এমন যে ভুল হয়ে যায় সুরের পাখি বুকের খাঁচায় ধরা দেয়নি একবারেই। বালক যখন সুরে-বেসুরে তালে-বেতালে মিলিয়ে নেচে গেয়ে চলল তখন তার সব অক্ষমতা সব দোষ ভুলিয়ে দিয়ে প্রকাশ পেলে শিশুকণ্ঠের এবং সুকুমার দেহের ভাষাটির অপূর্ব সৌন্দর্য, কিন্তু বড় হয়ে ছেলেমো করা তো সাজে না একেবারেই! তবেই দেখা যাচ্ছে স্থান-কাল-পাত্র হিশেবে সুন্দর ও অসুন্দর এই ভেদ হচ্ছে নানা রচনার মধ্যে। হরিণ সে-বাঁশি শুনে ভোলে, সাপ সে-বাঁশি শুনে ফণা তুলে তেড়ে আসে, সাপ-খেলানো বাঁশি সাপের কানে সুন্দর সুর দিলে, মানুষের কানে হয়তো খানিক সেটা ভালো ঠেকল, তাই বলে বিয়ের রাতে শানাই উঠিয়ে নহবৎখানায় সাপুড়ে এনে বসিয়ে দেয় কেউ? অবশ্য রুচিভেদে গড়ের বাদ্যি ঢাকের বাদ্যি বিয়ের রাতে এসে জোটে, ঘুমন্ত পাড়ার কানের শ্রবণশক্তি তেজস্কর পদার্থ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে কনসার্টের দলও অলিতে-গলিতে এসে আবির্ভূত হয়; কিন্তু নিজের মনকে প্রশ্ন করে দেখ, সে নিশ্চয়ই বলবে যে কিছুক্ষণের জন্য বলেই এসব সইছে; ঢাকের বাদ্যি থামলেই মিষ্টি—এটা মানুষের মন বলেই দিয়েছে বহুকাল আগে, কিন্তু প্রতি সন্ধ্যায় আকাশ ভরে যে শাঁখ-ঘণ্টা বাজে তার স্বরমাধুর্য সম্বন্ধে অন্য মত কারও আছে বলে তো বোধহয় না। গড়ের বাদ্যি গড়ের মাঠে সুন্দর লাগে, মন্দিরের শাঁখ-ঘণ্টা দূরে থেকেই ভালো লাগে। সভাস্থলে বীণা বেণু মন্দিররা, ঘরের মধ্যে সোনার চুড়ির ঝিনঝিন স্থান-কাল-পাত্রের হিসেবে সুন্দর অসুন্দর ঠেকে। মাঠ ছেড়ে গড়ের বাদ্যি যদি ঘরের মধ্যে ধুমধাম লাগায় তবে সে স্থান-কাল-পাত্রের হিশেব ডিঙিয়ে চলে ও সেই কারণেই ভারি বিশ্রী ঠেকে কানে। মন্দির যখন নদীর ওপার থেকে আরতির ঝনঝন অনেকখানি বাতাস আলো দিয়ে ধুয়ে পাঠায় এপারে তখনি সুন্দর ঠেকে সেটি। সন্ধ্যাপ্রদীপ সন্ধ্যাতারা একজন খুব ঘরের কাছে অন্যজন খুব দূরের কিন্তু সুন্দর হিশেবে দুজনে সমান বলে আলোর তীক্ষ্ণতা স্তিমিত করে নিয়ে দুজনেই সুন্দর হল মানুষের চোখে!

দখিন হাওয়া শরতের আলো এসবের মাধুর্যের পরিমাপ তাপমান যন্ত্রের দ্বারা হয় না, মনের বীণায় এরা আপনার সুন্দর পরশ বুলিয়ে দিয়ে জানায় যখন, তখন বুঝি কতখানি মধুর এবং কতখানি সুন্দর এরা। মানুষের মধ্যে যারা ওস্তাদ নয় তারা নিজের হাতে কাঠের বীণাটায়

ঘা দিতে থাকে মাত্র, মনে ঘা দেওয়ার কৌশল জানে না তারা। সৌন্দর্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার উত্তর মানুষ না-পেলে বাহির থেকে, না-পেলে তার নিজের ভিতর থেকে, এইজন্যই মনে হয় দেশে-দেশে কালে-কালে সৌন্দর্যতত্ত্ব নিয়ে মানুষ ক্রমাগত আলোচনা করে চলেছে। পণ্ডিত থেকে অপণ্ডিত সবাই জানে সুন্দর আছে, কিন্তু কার কাছে কেমনটি সুন্দর কেমনটি নয় এর মীমাংসা হল না আজও। স্থান কাল দুই অনুকূল প্রতিকূল হয় সুন্দর সম্বন্ধে—এটা কতকটা স্থির হয়ে গেছে; কিন্তু পাত্র হিশেবে কার চোখে কী যে সুন্দর এর মীমাংসা প্রত্যেকে নিজেরাই করছি। শাঁখ-ঘণ্টা দূর থেকে একটা সময়ে ভালো লাগল বলে কানের কাছে তাকে যদি কেউ টেনে এনে বলে, শোনো কী সুন্দর, তবে তর্কের ঝড় না-উঠে যায় না; এ-কথা গড়ের বাদ্যি ইমামবাড়ার আজান সবারই সম্বন্ধে খাটে। দূরে থাকার দরুন অনেক জিনিশ সুন্দর ঠেকে, দূরত্ব ঘুচিয়ে কাছে টেনে আনলেই তাদের সব সৌন্দর্য চলে যায়।

এইযে ব্যক্তিগত মতামত, সুন্দর অসুন্দরকে নিয়ে এইযে সব ছোটখাটো তর্কবিতর্ক, যার কোনো শেষ দেখা যায় না, নানা সুন্দরের সৃষ্টি করে-করে মানুষ দেখতে চেয়েছে এটিকে নিরস্ত করতে পারে কি না। রচনাকে স্থান-কাল-পাত্রের অতীত করে দিতে চেয়েছে মানুষ; শোনাবার জন্য যেসব রচনা তা মানুষ উপযুক্ত ছন্দোবন্ধ সুর-সার ইত্যাদি দিয়ে, দেখাবার জন্যে যে-রচনা তা যথোপযোগী রঙ-চঙ ও নানা কায়দা দিয়ে সব সময়ে সবার উপভোগ্য ও সুন্দর করার চেষ্টা করে গেল কালে-কালে। সুরকে সঙ্গীতশাস্ত্রের মধ্যে, কথাকে ছন্দশাস্ত্রে, ছবিকে বর্ণশাস্ত্রের মধ্যে ধরে মানুষ দেখতে চলল কী হয়, কিন্তু বাস্তবিক যা সুন্দর তা ধরা গেল না একটা কিছুর মধ্যে, সে বিচিত্রতা ও বিস্তার চেয়ে বাঁধন কাটতে থাকল বারে-বারে। কোনো ছবি বর্ণ ছেড়ে খালি রেখার ছন্দ ধরে হয়ে উঠল ভারি সুন্দর, কোনো গান শাস্ত্রমতো তাল মান সুর ছেড়ে প্রায় সহজ কথা হয়ে পড়ে হল সুন্দর, আবার কোথাও ছবি হয়ে হতে চলল সুন্দর, তিন শাস্ত্রের পাতা উল্টেপাল্টে এক হয়ে গেল, ছন্দ পেয়ে ছবি অথবা ছবি পেয়ে ছন্দ সুন্দর হয়ে ওঠে, বোঝা কঠিন হল, বোঝানোও কঠিন হল ! রচনাতে স্থান-কাল-পাত্রের সীমা অতিক্রম করার জন্য নতুন-নতুন উপায়ের সৃষ্টি হয়েই চলল। আকাশের চাঁদকে আমরা প্রায় সকলেই সুন্দর দেখি, কিন্তু কী নিয়ে চাঁদ সুন্দর যদি এ-প্রশ্ন করা যায় তবেই গোলযোগ বাধে। কেউ বলে চাঁদনি নিয়ে চাঁদ সুন্দর, কেউ বলে তার ছাঁদটি নিয়েই চাঁদ সুন্দর, কেননা অনেক শিল্পী দেখেছি কালো চাঁদ এঁকেছেন অথচ ছবিটির সৌন্দর্যহানি একটুও ঘটেনি। আর্টিস্ট মানুষের অনেকরকম পাগলামি থাকে, সুতরাং কালো চাঁদের উদাহরণটি সবাই স্বীকার করতে নাও রাজি হতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই উপায় দেখেছি প্রকৃতিদেবীও অবলম্বন করেছেন নিজের রচনাতে—শাদা তুষারকে কালো নীলবর্ণ করে দেখিয়েছিলেন তিনি আমাকে যতদিন পাহাড়ে বাস করেছিলেম ততদিন—প্রত্যেক প্রভাতে সোনার আকাশপটের মাঝখানে কালো তুষারের ঢেউ অথচ দৃশ্যপটে একটুও সৌন্দর্যহানি হল না।

চাঁদনি রাতের বেলায় আমরা বলে থাকি, দিব্যি ফুটফুটে রাত, অন্ধকার রাতের বেলায় দিব্যি ঘুটঘুটে অন্ধকার তো বলিনে ! কিন্তু কবিরা দুটোই-যে সুন্দর তার এত প্রমাণ হাতের কাছে রেখে গেছেন যে তা উঠিয়ে লেখা বড় করা মিছে। এই সেদিন একখানা চীনদেশের পাখা আর একখানি জাপানের পাখা হাতে নিয়ে দেখছিলেম—জাপানের পাখাখানি শাদা, তার উপরে নানা রঙের ছবির বাহার, দিনের আলোয় সুন্দর পৃথিবীর একটুখানি যেন দেখা যাচ্ছে। চীনের পাখাখানি ঠিক এর উল্টো ধরনে আঁকা; অন্ধকার রাত্রির একটিমাত্র প্রলেপ, তার মধ্যে কোনো ছবি কি কোনো রঙ নেই—স্নিগ্ধ গভীর ঘুম-পাড়ানো কালো অথচ ভারি সুন্দর। এইযে সুন্দরকে দেখতে দুই দেশের দুই শিল্পী পাখা মেললে, একজন দিনের দুয়ার

দিয়ে আলোর মাঝে উড়ে পড়ল প্রজাপতির মতো, অন্যজন একেবারে অন্ধকার সাগরে খেয়া দিয়ে চলল—এরা দুজনেই তো দেখে গেল দেখিয়ে গেল সুন্দরকে।

যারা ভারি পণ্ডিত তারা সুন্দরকে প্রদীপ ধরে দেখতে চলে আর যারা কবি ও রূপদক্ষ তারা সুন্দরের নিজেরই প্রভায় সুন্দরকে দেখে নেয়, অন্ধকারের মধ্যেও অভিসার করে তাদের মন। আলোর বেলাতেই কেবল সুন্দর আসেন দেখা দিতে, কালোর দিক থেকে তিনি দূরে থাকেন—এ-কথা একেবারেই বলা চলল না, বিষম অন্ধকার না বলে বলতে হল বিশদ অন্ধকার—যদিও ভাষাতত্ত্ববিদ এরূপ করায় দোষ দেখবেন। কালো দিয়ে-যে আলো এবং রঙ সবই ব্যক্ত করা যায় সুন্দরভাবে তা রূপদক্ষ মাত্রেই জানেন। এইযে সুন্দর কালো এর সাধনা বড় কঠিন। সেইজন্য জাপানে ও চীনদেশে একটা বয়স না পার হলে কালি দিয়ে ছবি আঁকতে চেষ্টা করতে হুকুম পায় না শবরুর কাছ থেকে শিল্পশিক্ষার্থীরা। যে-রচনায় রস রইল সেই রচনাই সুন্দর হল এটা স্থির, কিন্তু রস পাবার মতো মনটি সকল মানুষেই সমানভাবে বিদ্যমান নেই, কাজেই এটা ভালো ওটা ভালো নয় এইরকম কথা ওঠে। মেঘের সঙ্গে ময়ূরের মিত্রতা, তাই কোনো-একদিন নিজের গলা থেকে গন্ধর্বনগরের বিচিত্র রঙের তারা-ফুলে-গাঁথা রঙিন মালা ময়ূরের গলায় পরিয়ে দিয়ে মেঘ তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলে। মানুষ প্রথম ভাবলে, এমন সুন্দর সাজ কারো নেই। তারপর হঠাৎ একদিন সে দেখলে বকের পাঁতি পদ্মফুলের মালার ছলে সুন্দর হয়ে মেঘের বুক থেকে মাটির বুকে নেমে এল; মানুষ বললে, ময়ূর ও বক এরা দুইটিই সুন্দর। আবার এল একদিন জলের ধারে সারস পাখি—মেঘ যাকে নিজের গায়ের রঙে সাজিয়ে পাঠালে। এমনি একের পর এক সুন্দর দেখতে-দেখতে মানুষ বর্ষাকাল কাটালে, তারপর শরতে দেখা দিলে আকাশে নীল পদ্মমালার দুটি পাপড়িতে সেজে নীলকণ্ঠ পাখি। এমনি ঋতুর পর ঋতুতে সুন্দরের সন্দেশবহ আসতে লাগল একটির পর একটি মানুষের কাছে। সবশেষে এল রাতের কালো পাখি আকাশপটের আলো নিভিয়ে অন্ধকার দুখানি পাখনা মেলে—পৃথিবীর কোনো ফুল, আকাশের কোনো তারার সঙ্গে মানুষ তার তুলনা খুঁজে না-পেয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল!

এইযে একটি মানুষের কথা বললেম, এমন মানুষ জগতে একটি-দুটি পাই যার কাছে সুন্দর ধরা দিচ্ছেন সকল দিকে নানা সাজে নানা রূপে বর্ণে সুরে ছন্দে! ময়ূরই সুন্দর, কলবিঙ্ক নয়, কাক নয়—এই কথা যারা বলছে এমন মানুষই পৃথিবী ছেয়ে রয়েছে দেখতে পাই।

সুরের নানা ভঙ্গি দখল না-করে আমাদের গাইয়ে মুখভঙ্গিটাতেই যখন পাকা হয়ে উঠল, তখন সভার লোকে দূর-ছাই করে তাকে গঞ্জনা দিলে, সুরের সৌন্দর্য ফুটল না তার চেষ্টায় বটে কিন্তু ঐ মুখভঙ্গি অঙ্গভঙ্গির মধ্যে আর-একটা জিনিশ ফুটল যেটি হয়ে উঠল একখানি সুন্দর ছবি ওস্তাদের!

আর্টিস্টদের কেউ-কেউ ভুল করে বলেন 'সুন্দরের সন্ধানী'। সুন্দর যাকে ঘিরে থাকে না সেই বেড়ায় সুন্দরের খোঁজে গড়ের মাঠে জু-গার্ডেনে মিউজিয়ামে—এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। সুন্দর কী, সুন্দর কী নয় এই নিয়ে তর্কবিতর্ক লেখালেখি এবং সৌন্দর্যতত্ত্বের রসতত্ত্বের যত পুঁথি আছে তার বচন ধরে-ধরে যেন লাঠি-হাতে চলা। ততক্ষণ সুন্দর যতক্ষণ কাছে নেই, সুন্দর এলেন তো ওসব ফেলে চলল মন স্বচ্ছন্দে অবাধগতিতে সব তর্ক ভুলে। অজ রাজা যখন নগরে প্রবেশ করেছিলেন তখনকার কথা কার না জানা আছে? ফুল ফুটে গিয়েছিল সেদিন আপনা হতেই। মধুকরের কাছে যেভাবে হাওয়া এসে মধুর খবর দিয়ে যায় সেইভাবে খবর আসে সুন্দরের যে-লোক যথার্থ আর্টিস্ট তার কাছে, তাকে ঘুরে বেড়াতে হয় না সুন্দরকে খুঁজে-খুঁজে, আর্টিস্টে আর সুন্দরে লুকোচুরির লীলা চলে অনেক সময়ে কিন্তু সে

দুই ছেলেতে পরিচয় হবার পরে খেলার মতো, ইচ্ছা করে গোপন থেকে পরদা টেনে দিয়ে খেলা—তার মধ্যে রস আছে বলেই খেলা চলে। যে সুন্দরকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্ধান করছে তার ছুটোছুটির সঙ্গে এ-খেলার তফাৎ রয়েছে।

পিঁপড়ে ছুটোছুটি করে চিনির সন্ধানে কিন্তু মধু আহরণে মৌমাছির ছুটোছুটি সে একটি স্বতন্ত্র ব্যাপার। পিঁপড়ের চিনি-সংগ্রহের সঙ্গে তার পেটের যোগ, চিনি না-পেলে সে মরা- ইঁদুরে গিয়ে চিম্‌টি বসায় কিন্তু পেট খুব তাড়া দিলেও মাছের আর মাংসের যুষ দিয়ে মৌচাক ভর্তি করতে চলে না মৌমাছি। মৌমাছি কী খেয়ে বাঁচে এবং আর্টিস্ট তারাও কী খেয়ে জীবনধারণ করে তার রহস্য এখনো ভেদ হয়নি। শুধু এটুকু বলা যায় যে তারা পিঁপড়ের মতো সুন্দর সামগ্রীকে পেটের তাড়নার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে সুন্দরের সন্ধানে বার হয় না। ফুল ফোটে ওধারে সুন্দর হয়ে খবর আসে বাতাসে তাদের কাছে, চলে যায় তারা সুন্দরের নিমন্ত্রণে, সন্ধানে নয়। মৌচাকে যেমন মধু তেমনি ছবি মূর্তি কবিতা গান কত কী পাত্রে ধরলে মানুষ সুন্দরকে, এদিকে আবার বিশ্বজগতে সুন্দর নিজেকে ধরে দিলেন আপনা হতেই ফুলে-ফলে লতায়-পাতায় জলে-স্থলে আকাশে কত স্থানে তার ঠিকানা নেই, এত সুন্দর আয়োজন কিন্তু ভোগে এল শুধু দু-চারজনের, আর বাকি অধিকাংশ তারা এসবের মধ্যে থেকে শুধু সৌন্দর্যতত্ত্বই বার করতে বসে গেল। সেই বেজান্ শহরের কথা মনে হয়; উপবনে সেখানে পাখি গাইল ফুল ফুটল মুকুল খুলল ফল ধরল পাতা ঝরল, সবই সুন্দরভাবে হয়ে চলল দিনে-রাতে, কিন্তু শহরের কোনো মানুষ এগুলো থেকে কিছু নিতে পারলে না, পাথরের চেয়েও পাথর হয়ে বসে রইল, শুধু দু-চারজন পথিক দুটো-একটা হতভাগা ভিখিরি নয় পাগল তারাই কেবল থেকে-থেকে এল গেল সেই দেশের সেই বাগানে যেখানে দৃষ্টি-ভোলানো সুন্দরের সামনে মুখ করে বসে আছে মূক অন্ধ বধির নিশ্চল মানুষের দল ঘোলা-চোখ মেলে।

যার চোখ সুন্দরকে দেখতে পেলে না আজন্ম তার চোখের উপর জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা ঘষে-ঘষে ক্ষইয়ে ফেললেও ফল পাওয়া যায় না, আবার যে সুন্দরকে দেখতে পেলে সে অতি সহজেই দেখে নিতে পারলে সুন্দরকে, কোনো গুরুর উপদেশ-পরামর্শ এবং ডাক্তারি দরকার হল না তার, বিনা অঞ্জনেই সে নয়ন-রঞ্জনকে চিনে গেল।

মাটি থেকে আরম্ভ করে সোনা পর্যন্ত, যে-ভাষায় কথা চলে সেটি থেকে ছন্দোময় ভাষা পর্যন্ত, তারের সুর থেকে গলার সুর পর্যন্ত বহুতর উপকরণ দিয়ে রূপদক্ষেরা রচনা করে চলেছেন সুন্দরের জন্য বিচিত্র আসন, মানুষের কাজে কতটা লাগবে কি না-লাগবে এ ভাবনা তাঁদের নেই। কাদায় যে গড়ে সে কাদাছানা থেকেই সুন্দরের ধ্যান ধরে চলে, না হলে গড়ার উপযুক্ত করে মাটি কিছুতে প্রস্তুত করতে পারে না সে—এ-কথাটা কারিগরের কাছে হেঁয়ালি নয়। চাষের আরম্ভ থেকেই সোনার ধানের স্বপ্ন জমিতে বিছিয়ে দেয় চাষা কিন্তু যার সুন্দরের ধ্যান মনে নেই সে যখন ভালো মাটি নিয়ে বসে যায় এবং দেখে মাটি বাগ মানছে না তার হাতে, তখন সে হয়তো বোঝে হয়তো বোঝেও না কথাটার মর্ম।

ছন্দ, সুরসার এবং রঙ প্রস্তুত ও তুলি টানার প্রকরণ সহজে মানুষ আয়ত্ত করতে পারে কিন্তু তুলি টানা হাতুড়ি পেটা কলম চালানোর আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত সুন্দরের ধ্যানে মনকে স্থির রাখতে সবাই পারে না, এমনকি রূপদক্ষ তারাও সময়ে-সময়ে লক্ষ্য হারিয়ে ফেলছে তাও দেখা যায়।

যে-রচনাটি সর্বাঙ্গসুন্দর তার মধ্যে রচনার কলকৌশল ধরা থাকে না—কথা সে যেন ভারি সহজে বলা হয়ে যায় সেখানে ! এইযে সহজ গতি এ থাকে না যা সর্বাঙ্গসুন্দর নয় তাতে—কৌশল নৈপুণ্য সবই চোখে পড়ে। কবিতা থেকে এর দৃষ্টান্ত দেওয়া চলে, ছবি

মূর্তি সব থেকে এটা প্রমাণ করা চলে। কর্ম কোনোরকমে নিষ্পন্ন হল এবং কর্ম খুব হাঁকডাক ধুমধামে নিষ্পন্ন হল—এ দুয়েরই চেয়ে ভালো হল কর্মটি যখন সহজে নিষ্পন্ন হয়ে গেল কিন্তু কর্মের জঞ্জালগুলো চোখে পড়ল না।

হাড় মাসের কত গাঁঠ খিল বাঁধন কষন ইত্যাদি অত্যন্ত জটিল ব্যাপার নিয়ে তৈরি হল মানুষের দেহযন্ত্র, এইসব যান্ত্রিক ব্যাপার যা নিয়ে মানুষটা চলছে বলছে সেগুলো আড়ালে রইল একখানি পাতলা পরদার ওপারে তবেই সুন্দর ঠেকল মানুষটি। আর্গিন যন্ত্রের ঘেরাটোপ খুলে দিয়ে তার ভিতরের কারখানা যদি চোখের সামনে ধরে দেওয়া যায় তবে সেটা খুব সুদৃশ্য বলে ঠেকে না।

আমি একবার একটা ছাপার কল অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে দেখেছিলেম। যন্ত্রটা একসঙ্গে অনেকগুলো মানুষের কাজ একা করছে, মানুষের চেয়ে সুচারু ও দ্রুতভাবে। এতে করে ভারি একটা আনন্দ হল, কিন্তু একটি পাখিকে উড়তে দেখে যে-আনন্দ তার সঙ্গে সেদিনের আনন্দে তফাৎ ছিল। পাখির ডানার মধ্যে নানা কল-বল কীভাবে কাজ করছে তার খোঁজই নেই, ওড়ার সুন্দর ছন্দই সেখানে দেখা দিয়ে মনকে উড়িয়ে নিয়ে গেল কোন্ দেশে তার ঠিক নেই। সৃষ্টির নিয়মে সমস্ত সুন্দর জিনিশ আপনার নির্মাণের কৌশল লুকিয়ে চলল দর্শকের কাছ থেকে এবং এই নিয়মই মেনে চলল সমস্ত সুন্দর জিনিশ যা মানুষে রচনা করলে—যেখানে নির্মাণের নানা প্রকরণ ও কৌশল ধরা পড়ে গেল সেখানেই রচনার সৌন্দর্যহানি হল, কলের দিক ফুটল কিন্তু রসের দিক সৌন্দর্যের দিক চাপা পড়ে গেল। ঘুড়ি যখন আকাশে ওড়ে তখন যে-কলটি তাতে বেঁধে দেয় কারিগর সেটি বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে যায় তবেই সুন্দর ঠেকে ঘুড়িখানির ওড়ার ছন্দ। জাহাজ এমনকি উড়ো কল তারাও দেখায় সুন্দর এই কারণে এবং সবচেয়ে দেখায় সুন্দর গঙ্গার উপরে নৌকাগুলি যার চলার হিশেব ও কল-বল প্রত্যক্ষ হয়েও চক্ষুশূল হচ্ছে না। সুন্দর জিনিশের বাইরের উপকরণে আর ভিতরের পদার্থে হরিহর আত্মা যেমন রূপ তেমনি ভাব। বহিরঙ্গ যা তার সঙ্গে অন্তরঙ্গের অবিচ্ছেদ্য মিলন ঘটিয়ে সুন্দর বর্তমান হল। চোখের বাইরে যে-পরকলা তার সঙ্গে চোখের ভিতরে যে-মণিদর্পণ তার যোগাযোগ অচ্ছেদ্য হল, তখনই সুন্দরভাবে দেখতে পাওয়া গেল বিশ্বের জিনিশ, চশমার কাচে আঁচড় পড়ল চোখ রইল পরিষ্কার, কিংবা চোখের মণিতে ছানি পড়ল চশমা রইল ঠিকঠাক, এ হলে সুন্দর দেখা একেবারেই সম্ভব হল না।

মৌখিক আত্মীয়তা ভারি বিশ্রী ঠেকে, কেননা, কথা সেখানে শুধু মুখ থেকে বার হচ্ছে, বুক থেকে নয়; কোলাকুলি সেও বাইরে-বাইরে ছোঁয়াছুয়ি, বুকে-বুকে লাগা একে বলতে পারা গেল না! ভারি সুন্দর লাগে যখন মানুষটির সঙ্গে মানুষের হৃদয় বাইরেটির সঙ্গে ভিতরের ভাবগুলি সুন্দর মিল নিয়ে এসে লাগে মনে।

শিল্পসামগ্রী সংগ্রহের সময়ে দু-একখানা পার্সি কেতাবের খালি-মলাট হাতে পড়ে সেখানে মলাটখানাই একটা বাইরের এবং ভিতরের সৌন্দর্য নিয়ে উপস্থিত হয় সামনে। এইভাবে কত সমুদ্রের ঝিনুক ফুলের পাপড়ির মতো হাতে পড়েছে, আশ্চর্য বর্ণ আশ্চর্য সৌন্দর্য নিয়ে। প্রত্যেকবারেই লক্ষ্য করেছি চোখ এবং মন দুই-ই আকর্ষণ করে বস্তুগুলি। শাস্ত্রে সুন্দরের কতকগুলো লক্ষণ দিয়ে বলা হয়েছে এই হলেই হল রমণীয়, কিন্তু শুধু-চোখে এবং দূরবীক্ষণ লাগিয়ে ও তারপরে অণুবীক্ষণ দিয়ে দেখেও সুন্দর সম্বন্ধে শেষকথা স্বর্গ মর্ত্য পাতালে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। আকাশের রামধনুতে যিনি সুন্দর, তিনি রয়েছেন পৃথিবীর ধূলিকণায়, তিনিই রয়েছেন অতলের তলাকার একটুকরো ঝিনুকের ভিতরে বাইরে সমান সৌন্দর্য ও শোভা বিকীর্ণ করে—হৈ সবমেঁ সহবীতেঁ ন্যারা!

অন্তর বাহির

ফটোগ্রাফের সঙ্গে ফটোকর্তার যোগ পুরো নয়—পাহাড় দেখলেম ক্যামেরা খুললেম ছবি উঠল ফটোকর্তার অন্তরের সঙ্গে পাহাড়ের যোগাযোগই হল না। এইজন্যে আর্টিস্টের লেখা পাহাড় যেমন মনে গিয়ে পৌঁছোয়, ফটোতে-লেখা পাহাড় ঠিক তেমনভাবে মানুষকে স্পর্শ করতে পারে না—শুধু চোখের উপর দিয়েই ভেসে যায় বায়স্কোপের ছবি, মনের মধ্যে তলিয়ে যায় না। খবরের কাগজ খবর দিয়েই চলল অনবরত, আজ পড়লেম দুদিন পরে ভুললেম। কবি গান গেয়ে গেলেন, শিল্পী রচনা করে গেলেন, চোখ কানের রাস্তা ধরে মর্মে গিয়ে পৌঁছোল গান ও ছবি। ক্যামেরার মতো চোখ খুললেম বন্ধ করলেম, একই বস্তু একইভাবে বারংবার এল কাছে—এ হল অত্যন্ত সাধারণ দেখা। শিল্পীর মতো চোখ মেললেম বস্তুজগতের দিকে, রূপ চোখে পড়ল এবং সঙ্গে-সঙ্গে মনের মধ্যে রূপাতীত রসের উদয় হল।

ফটোগ্রাফ বস্তুজগতের একচুল ওলটপালট করতে অক্ষম, কিন্তু শিল্পীর কল্পনা-যে বরফের হাওয়া পেলে—ফটোগ্রাফের মধ্যে যতটা বস্তু তার সমস্তটা পালাই-পালাই করে—সেই বরফের চূড়ায় হর-গৌরীকে বসিয়ে দিলে বিনাতর্কে। চোখের দেখা ও মনের দেখা দিয়ে শিল্পী যখন মিললেন চোখের সামনে বিদ্যমান যা এবং চোখের বাইরে অবিদ্যমান যা তার সঙ্গে, তখন নিয়তির নিয়ম উল্টে গেল অনেকখানি—দেবতা সমস্ত এসে সামনে দাঁড়াল ঠিক মানুষের মতোই দুইপায়ে কিন্তু অসংখ্য হাত অসংখ্য মাথা নিয়ে, নিচের দিকে রইল বাস্তব উপরে রইল অবাস্তব, সম্ভবমতো হল দুইপা, অসম্ভব রকম হল হাত ও মাথা, সৃষ্টির নিয়ম মিলল গিয়ে অনাসৃষ্টির অনিয়মে।

ফটোগ্রাফের যে-কৌশল তা বস্তুর বাইরেটার সঙ্গেই যুক্ত আর শিল্পীর যে-যোগ তা শিল্পীর নিজের অন্তর-বাহিরের সঙ্গে বস্তুজগতের অন্তর-বাহিরের যোগ এবং সেই যোগের পন্থা হল কল্পনা এবং বাস্তব ঘটনা দুয়ের সমন্বয় করার সাধনাটি।

নির্ভুলে ব্যাকরণ ও পরিভাষা ইত্যাদি দিয়ে যেমনটি-তাই ঘটনাকে বলে যাওয়া হলেই যে বলা হল তা নয়, তা যদি হত তো সাহিত্য খবরের কাগজেই বদ্ধ থাকত। তেমনি যা-তা এঁকে চলা মানে শিল্পের দিক থেকে বেঁকে ফটোগ্রাফের দিকে যাওয়া, সুর ছেড়ে হরিবোলার বুলি বলা। অবিদ্যমানকে ছেড়ে বিদ্যমানে বর্তে নেই একদণ্ড এই সৃষ্টি এবং কল্পনাকে ছেড়ে শুধু ঘটনার মধ্যে বর্তে থাকতে পারে না মানুষের রচনা, ঘটনার সঙ্গে কল্পনার মিলন হল, তবে হল একটা শিল্পরচনা। গাছ দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু ফুল পাতা এরা দুলল, কখনো আলোর দিকে মুখ ফেরালে কখনো অন্ধকারের দিকে হাত বাড়ালে। মানুষ বাঁধা রইল মাটির সঙ্গে কিন্তু মন তার বিদ্যমান অবিদ্যমান দুই ডানা মেলে উড়ল, মানুষের শিল্প তার মনের পাখির গতিবিধির চিহ্ন রেখে গেল কালে-কালে—পাথরে কাগজে মাটিতে সোনায় কাঁসায় কাঠে কয়লায়। ইতর জীব তারা বর্তমানটুকুর ঘেরে বাঁধাই রয়েছে, বিদ্যমানের প্রাচীর ছাড়িয়ে যাওয়া শুধু মানুষেরই সাধ্য হয়েছে—ঘোড়া সে কোনোকালে পক্ষিরাজ হবার কল্পনাই করতে পারলে না কিন্তু মানুষ অতিমানুষের

কল্পনা অমানুষি সমস্ত রচনার স্বপ্ন দেখলে, বিদ্যমানের মধ্যে মানুষ আপনাকে ইতর জীবের মতো নিঃশেষে ফুরিয়ে দিতে পারলে না; সে কল্পনা ও স্মৃতি এই দুই টানাপড়েনে প্রস্তুত করে চলল বিশ্বজোড়া মায়াজাল। সে ঘুমিয়ে স্বপন দেখলে, জেগে স্বপন দেখলে, বিদ্যমান থেকে অবিদ্যমান পর্যন্ত তার মন এল-গেল—অবিদ্যমানকে আনলে, অনাবিষ্কৃতকে করলে আবিষ্কার। পাখিরা যে-সুর পেলে সেই সুরেই গেয়ে গেল, অনাহত সুরের সন্ধান তারা পেলে না; দেওয়া-সুরে গাইলে কোকিল, দেওয়া-সুরেই ডাকলে ময়ূর, কিন্তু মানুষের গলায় অবিদ্যমানের সুর পৌঁছোল—অনাহত তারের অপ্রকাশিত সুর, তাই শুনে বিশ্বজগৎ হরিণের মতো কান খাড়া করে স্তব্ধ হয়ে রইল, অগোচর রূপসাগরের জল মানুষ ছুঁয়ে এল, তার হাতের পরশে ফুটল বিচিত্র ছবি বিচিত্র শিল্পকলা, আর-একটি নতুন সৃষ্টি—পলে-পলে কালে-কালে যা নতুন থেকে নতুনতর রাজত্বে চলছে তো চলেছেই।

বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান এই দুই ডানার উত্থান-পতনের গতি ধরে, চলেছে মানুষের মনের সঙ্গে মানুষের মানস-কল্পনার প্রকাশগুলি। অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের মধ্যে ধরে দিচ্ছে মানুষ, অন্তরকে আনছে বাইরে, বাইরেকে নিয়ে চলেছে অন্তর—এই হল শিল্পরচনার মূলের কথা। শিল্প এল সামনে, পিছনে লুকিয়ে রইল শিল্পী—এই হল শিল্পের সঠিক লক্ষণ। ময়ূর শিল্পী নয়, কেননা সে তার চালচিত্র আড়াল করে নিজেকে সামনে ধরে দেয়। রচনাকে ঠেলে বেরিয়ে এল সুচতুর রচয়িতা এটা একটা মস্ত দোষ, ছবিটাকে আড়াল করে ছবি-লিখিয়ে তাড়াতাড়ি তোড়জোড় নিয়ে যদি সামনে দাঁড়ায়, ছবির কোণের নামটা এবং তুলির টানটাই দেখবার বিষয় বলে, তবে সে-লোককে কি সহা যায় চিত্রবিদ বলে? অবিদ্যমানের দিকে কল্পনার দিকে অগোচরের দিকে যে-চিরন্তন টান রয়েছে সমস্ত শিল্পের সমস্ত শিল্পীর, এটা যে না-বোঝে চিত্রের বিচিত্র রহস্য সে বোঝে না, তার কাছে বাস্তব ও কাল্পনিক দুয়েরই অর্থ অজ্ঞাত থেকে যায়, দাঁড়ে-বাঁধা পাখির মতো শিল্পশাস্ত্রের বুলিই সে আউড়ে চলে অনর্গল; যথা : 'সশ্বাসমিব যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং' কিংবা 'তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম। বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ ॥' [১] অথবা 'সুপ্তং চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ ॥' [২] যে ওস্তাদ বোল সৃষ্টি করে সে বোঝে বোলের মর্ম কিন্তু খোল সে বোল বলে মাত্র, বলে কিন্তু বোঝে না বোলের সার্থকতা অথবা প্রয়োগের কৌশল। মানুষের লেখা পুঁথিগত শিল্পের চেহারা এক, আর মানুষের মনোমতো-করে-রচা শিল্পের রূপ অন্য। শাস্ত্রকার চাইলেন শিল্পী আঁকুক ঠিক-ঠিক তরঙ্গ অগ্নিশিখা ধূম নিম্ন উন্নত সুপ্ত মৃত জীবিত এককথায় সশ্বাসমিব চলন্ত বলন্ত ইংরেজিতে যাকে বলি লাইফ-লাইক ছবি—কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পূর্ব-পশ্চিমের বিস্তার ছাড়িয়ে যে-শিল্পলোক এবং কল্পনার রাজ্য তার যে-অধিবাসী তারা এঁকে চলল এর ঠিক বিপরীত, শুধু নকল-নবিশেরাই ধরে রইল সামনে বিদ্যমান শাস্ত্রের বচন ও বস্তুজগৎ।—'Do not imitate ; do not follow others—you will be always behind them'—COROT. আসল মেঘ চলে যায় পলে-পলে রূপ বদলাতে-বদলাতে, নকল মেঘের বদল নাই, এটা শাস্ত্রকার পণ্ডিতের ঢের আগে শিল্পী আবিষ্কার করে গেছে, তাই সে বলেছে—অনুসরণ অনুকরণ অনুবাদ, এসব করলে পিছিয়ে পড়বে, পটের 'সশ্বাসমিব' অবস্থায় স-সে-মি-রা হয়ে হবে পুঁথির ও পরের তল্পিদার মাত্র, শিল্পী হবে না শিল্পকে পাবে না—'Nothing is so tiring as a

constant close imitation of life one comes back inevitably to imaginative work—WEERTZ.

'তরঙ্গাগ্নিশিখাধূমং বৈজয়ন্ত্যম্বরাদিকম্। বায়ুগত্যা লিখেৎ যস্তু বিজ্ঞেয়ঃ স তু চিত্রবিৎ ॥" [৩] অথচ 'সুপ্তং চ চেতনাযুক্তং মৃতং চৈতন্যবর্জ্জিতম্। নিম্নোন্নতবিভাগঞ্চ যঃ করোতি স চিত্রবিৎ ॥' [৪]—এ হল শিল্পে বাস্তবপন্থীর কথা—যেন ঢেউ উঠছে পড়ছে, যেন আগুন জ্বলছে, নিশান লটপট করছে, আঁচল উড়ছে বাতাসে, যেন ঘুমন্ত যেন জীবন্ত যেন মৃত যেন নিম্নোন্নত—এককথায় 'সশ্বাসমিব' হল চরম কথা। কিন্তু এই মতের অনুসরণে গিয়ে কি মানুষ অনুকরণেই ঠেকে রইল না শিল্পী সে-ছবি লিখে চলল বায়ুর চেয়ে গতিমান কল্পনার সাহায্যে নিজের বর্ণ ও রেখাসমস্তকে কখন তরঙ্গায়িত শিখায়িত ধূমায়িত করে দিয়ে—এমন মেঘ এমন আগুন এমন সমুদ্রের এমন ঢেউ যা বাস্তব জগতে দেখেনি কেউ! শিল্পের জয়পতাকা কল্পনার বাতাসে উড়ে অচেতন রেখা চেতন হয়, সচেতন রঙ ঘুমিয়ে পড়ে কল্পনার সোনার কাঠির স্পর্শে, শয়ন ছেড়ে জেগে ওঠে মনের মধ্যেকার সুপ্ত ভাব, স্থির বিদ্যুল্লেখার মতো শোভা পায় স্বপ্নপুরের অলক্ষ্য রূপরেখা! কল্পনার যেখানে প্রসার নেই সেখানে রেখা শুধু দপ্তরির রুলটানা আলো-ছায়া অ্যানাটমি পারস্পেক্টিভ ইত্যাদির ঘূর্ণাবর্ত, শুধু কুস্তির মারপেঁচ, ভূষণ সেখানে বারাঙ্গনার সাজের মতো অপদার্থ এবং বর্ণ সেখানে বহুরূপীর রঙ-চঙ-করা সঙ মাত্র, তা সে শাস্ত্রমতো অনুলোম পদ্ধতিতেই আঁকা হোক বা প্রতিলোম পদ্ধতিতেই টানা হোক। 'To make a thing which is obviously stone, wood or glass speak is a greater triumph than to produce wax-works of peep-shows.'—RODIN. শিল্পী কতখানি প্রকাণ্ড কল্পনা নিয়ে বাস্তব জগৎ থেকে সরে দাঁড়াল যখন সে কাঠ পাথর কাগজকে কথা বলাতে চাইলে! শিল্পের প্রাণ হচ্ছে কল্পনা, অবিদ্যমানের নিশ্বাস। চৌরঙ্গীর মার্কেটে যে মোমের পুতুলগুলো বিক্রি হচ্ছে তারা একেবারে 'সশ্বাসমিব', চোখ নাড়ে ঘাড় ফেরায় হাসে কাঁদে, 'পাপা' 'মামা' বলেও ডাকে কিন্তু 'ইব' পর্যন্তই তার দৌড়! কোনো শিল্পী যদি শিল্পশাস্ত্র লিখতে চায় তবে এই 'ইব' কথাটি তার চিত্রশব্দ-কল্পদ্রুম থেকে বাদ দিয়ে তাকে লিখতে হবে 'সশ্বাসমিব' নয় 'সশ্বাসং যচ্চিত্রং তচ্চিত্রং'।

শিল্পীর মানস-কল্পনা যে-কল্পলোকের দিব্য নিশ্বাসে প্রাণবন্ত হয় সে-হাওয়া কি এই বাতাস যা ঐ লাটপ্রাসাদের নিশান দুলিয়ে গড়ের মাঠের ধুলোয় কলের ধুলোয় মলিন হয়ে আমাদের নাকে-মুখে দিবারাত্রি যাওয়া-আসা করছে? আর্টিস্টদের মনোরথ যে-বাতাস কেটে চলে সে-বাতাস হচ্ছে এমন এক তরল হাওয়া যার উপর পালকের ভার সয় না অথচ বিশ্বরচনার ভার সে ধরে আছে! শিল্পশাস্ত্র খুবই গভীর, তার একটা লাইনের অর্থ হাজার রকম, কিন্তু তারচেয়ে গভীর জিনিশ হল শিল্প, যার একটা লাইনের মর্ম ঝুড়ি-ঝুড়ি শিল্পশাস্ত্রেও কুলোয় না, আবার শিল্পের চেয়ে গভীর হল শিল্পীর মন যার মধ্যে বহির্জগৎ তলিয়ে রইল—স্মৃতির শুক্তিতে ধরা মুক্তি, নতুন জগৎ সৃষ্টি হল জলের মাঝে বড়বানল। এইযে শিল্পীর মন, এর কাজই হল বাইরে গিয়ে আবিষ্কার এবং ভিতরে থেকেও আবিষ্কার, আবির্ভূত যে-জগৎ এই গাছপালা জীবজন্তু আকাশ আলো এর সামনে এসে শিল্পীর মন থমকে দাঁড়িয়ে শুধু নকল নিয়ে খুশি হয় না, সে খুঁজে-খুঁজে ফেরে অনাবিষ্কৃত রয়েছে যা তাকে! শিল্পীর মন দেহপিঞ্জরের অন্তঃপুরে জাদুঘরের মরা-পাখির মতো দিনরাত সুখে-দুঃখে সমভাবে থাকে না—সে বোধ করে স্বপন দেখে স্বপন রচনা করে চলে অসংখ্য অদ্ভুত অতি বিচিত্র! নিছক ঘটনা আর নিছক কল্পনা এ

দুয়েরই কথা শাস্ত্রকার লিখলেন। একদিকে বলা হল 'সশ্বাসমিব যচ্চিত্রং, তচ্চিত্রং শুভলক্ষণম্', দর্পণে যে-প্রতিবিম্ব পড়ে তারচেয়ে সচল সশ্বাস—রূপে প্রমাণে ভাবে লাবণ্যে সাদৃশ্যে বর্ণিকাভঙ্গে সম্পূর্ণ চিত্র আর-কিছুই হতে পারে না। কিন্তু সবাই তো এ-বিষয়ে একমত হতে পারলে না; এর ঠিক উল্টো রাস্তা ধরে একদল শাস্ত্রকার বললেন : 'অপি শ্রেয়স্করং নৃণাং দেববিম্বমলক্ষণম্। সলক্ষণং সত্যবিম্বং ন হি শ্রেয়স্করং সদা ॥' [৫] কিছুর প্রতিকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট কথা বলা হল—'মানবাদীনামস্বর্গ্যাণ্যশুভানি চ।' শাস্ত্র পড়ে শিল্পী হতে চললে এই দোটানা সমস্যায় পড়ে হাবুডুবু খেতে হবে; নানা মুনির নানা মত! মানুষের শিল্প-যে নানা রাস্তা ধরে চলেছে তার অন্ধিসন্ধি এত যে তার শেষ নেই, বিদ্যমান এবং অবিদ্যমান ঘটনা এবং অঘটন কল্পনা এই দুই খাত রেখে চলেছে শিল্পের ধারা—কিন্তু এই দুয়েরই গতি কোন্‌দিকে—রসসমুদ্রের দিকে, এই দুয়েরই উৎপত্তি কোন্‌খানে—রসের উৎসে, সুতরাং ভারত-শিল্পই বলো আর যে-শিল্পই বলো রসের সংস্পর্শ নিয়ে তাদের বিচার।

শিল্পে বাস্তবিকতা কিংবা অবাস্তবিকতা কোন্‌টা প্রয়োজনীয় এ-কথার উত্তর শাস্ত্রকার তো দিতে পারে না! শাস্ত্র হল নানা মুনির নানা মতের সমষ্টি এবং নানা শিল্পের নানা পথে পদক্ষেপের হিসাবের খাতা মাত্র, কাজেই শাস্ত্র পড়ে শিল্পের স্বরূপ কেমন করে ধরা যাবে? সমুদ্র ঘাঁটলে মাছ ওঠে নুন ওঠে মুক্তাও ওঠে কিন্তু হীরক ওঠে না, সেখানে মাটি ঘাঁটতে হয় যে-মাটিতে শিল্পী জন্মেছে ও গড়েছে। শাস্ত্র ঘাঁটলে শাস্ত্রের বচন পাই শাস্ত্রজ্ঞান পাই, শিল্পীর রচনারহস্য ও শিল্পজ্ঞান শিল্পের মধ্যেই গোপন রয়ে যায়। শাস্ত্রকার যখন ছিল না এমন দিনও তো পৃথিবীতে একদিন এসেছিল, সে-সময়কার শিল্পী শাস্ত্র না-পড়েও শিল্পজ্ঞান লাভ করে গেছে—জগতের সমস্ত আদিম অধিবাসীদের শিল্পকলা এর সাক্ষ্য দিচ্ছে—এই আদিম শিল্পচর্চা করে দেখি মানুষ জলের রেখা ফলের ডৌল পাখির পালক মাছের আঁশ এমনি নানা জিনিশের স্মৃতি কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে সাজাচ্ছে ঘটি-বাটি কাপড়-চোপড় অস্ত্র-শস্ত্র সমস্ত জিনিশের উপরে এমনকি মানুষের নিজের গায়ের চামড়ায় পর্যন্ত স্মৃতি ও কল্পনার জাল পড়েছে! মানুষের চিরসহচরী এই কল্পনা ও স্মৃতি, শিল্পের দুই পার্শ্বদেবতা! বিদ্যমান জগৎ বাঁধা-জগৎ, আর কল্পনার জগৎ সে অবিদ্যমান, কাজেই বাঁধা-জগতের মতো সসীম নয়। অনন্ত প্রসার মানুষের কল্পনার—তেপান্তর-মাঠের ক্ষীর-সমুদ্রের ইন্দ্রলোক-চন্দ্রলোকের। বিদ্যমান জগৎ নির্দিষ্ট রূপ পেয়ে আমাদের চারিদিকে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে—তাল বট তেঁতুল কোকিল ময়ূর কাক গরু-বাছুর মানুষ হয় হস্তী সিংহ ব্যাঘ্র এরা কালের পর কাল একই রূপ একই ভঙ্গি একই সুর নিয়ে খালি আসা-যাওয়া করছে। পৃথিবীটা খুব বড় এবং এখনো মানুষের কাছ থেকে আপনার অনেক রহস্য সে লুকিয়ে রেখেছে, তাই এখনো মানুষ উত্তরমেরু ধবলগিরি অতিক্রম করার কল্পনা করছে, দুদিন পরে যখন এ দুটো জায়গাই মানুষের জানা-জগতের মধ্যে ধরা পড়বে তখন মানুষের চাঁদ-ধরার কল্পনা সত্য হয়ে উঠবার দিকে যাবে! এমনি বাস্তব এবং কল্পনা, কল্পনা ও বাস্তব এই দুটি পদচিহ্ন রেখে চলেছে ও চলবে মানুষ সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এবং তার পরেও নতুন যুগে যেসব যুগ এখনো মানুষের কল্পনার মধ্যেই রয়েছে!

অঘটিত ঘটনা অবিদ্যমান সমস্ত কল্পনা আজ যেগুলো মানুষের মনোরাজ্যের জিনিশ সেগুলো কালে সম্ভব হয়ে উঠবার প্রতীক্ষা করছে না, জোর করে এ-কথা কে বলতে পারে? এক যুগের খেয়ালি যা কল্পনা করলে আর-এক যুগে সেটা বাস্তব হয়ে উঠল, এর প্রমাণ

মানুষের ইতিহাসে বড় অল্প নেই, কত যুগ ধরে পাখিদের দেখাদেখি মানুষ শূন্যে ওড়ার কল্পনা করে এল, এতদিনে সেটা সত্যি হয়ে উঠল কিন্তু এতেও মানুষের কল্পনা শেষ হল না, ওড়ার নানা ফন্দি ডানায় বিনা-ডানায়, এমনি নানা কল্পনায় মানুষের মন বিদ্যমানকে ছেড়ে চলল অবিদ্যমানের দিকে। হঠযোগ থেকে গরুর গাড়ি ঘোড়ার গাড়ি ইস্টিম গাড়ি দু-চাকার গাড়ি শেষে হাওয়া-গাড়ি এবং উড়োজাহাজে কল্পনা এসে ঠেকেছে কিন্তু ওড়ার কল্পনা এখনো শেষ হয়নি, রাবণের পুষ্পক রথে গিয়ে ঠেকলেও মানুষ আরো অসম্ভব অদ্ভুত রথের কল্পনা করবে না তা কে বলতে পারে? দেশলাইয়ের কল্পনা চকমকি থেকে এখন মেঘের কোলে বিদ্যুতে গিয়ে ঠেকেছে কিন্তু এখনো নিষ্প্রভ আলো তাপহীন আগুন এ সমস্তই অবিদ্যমানের কোলে দুলছে একদিন বিদ্যমান হবার প্রতীক্ষায়।

অবিদ্যমান হচ্ছে বিদ্যমানসমস্তের জননী, অজানা প্রসব করছে জানা-জগৎ। অসম্ভব চলেছে সম্ভব হতে কল্পনার সোপান বেয়ে। 'অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল, সমস্তই চিহ্নবর্জিত ছিল, অবিদ্যমান বস্তুর দ্বারায় সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন, বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তিস্থান নিরূপণ করিলেন।' আগে সৃষ্টির কল্পনা তবে তো সৃষ্টি! ইউরোপের স্বরগ্রামে শুনেছি আগে নিখাদ স্বরটা একেবারে অজ্ঞাত ছিল হঠাৎ এক খেয়ালি সেই অজানা সুরের কল্পনা ধরে বসল এবং তারি সন্ধানে মরীচিকালুব্ধের মতো ছুটল অবিদ্যমান যে-সুর তাকে বিদ্যমান করতে চেয়ে! সঙ্গীত তখন ইউরোপ পাদরিদের হাতে ধর্মের সেবায় বাঁধা রয়েছে, ছয়-সুরের বেশি আর-একটা সুরের কল্পনা পাদরি সঙ্গীতবেত্তার কাছে অমার্জনীয় ছিল, খেয়ালি লোকটার নির্বাসনদণ্ড ব্যবস্থা হয়ে গেল, সে-একটা কাল্পনিক সুরের জন্যে ঘর ছাড়লে দেশ ছাড়লে নির্যাতন সইলে, তারপর যে-সুর কল্পনায় ছিল তাতে বিদিত হল সে নিজে এবং বিদিত করে গেল বিদ্যমান জগতে। এমনি একটার পর একটা সুরের পাখি ধরে গেছে কল্পনার জালে মানুষ, অনাহতকে ধরে গেছে আহতের মধ্যে।

মানুষের সমস্ত কাজে-কর্মে শিল্পে-সাহিত্যে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কল্পনাটা প্রথম তারপর বাস্তব—এই হল রচনার ধারা ও রীতি। কল্পনাটা মানুষের মধ্যে প্রবল শক্তিতে কাজ করে; এই শক্তি সৃষ্টি করার দিকে মানুষের দৈহিক ও মানসিক আর-সমস্ত শক্তিকে উদগ্র করে দেয়। মাতাল ও পাগলের দেহ বিকল হয়ে গেল, উৎকট কল্পনা তাদের বিকট মূর্তিতে বিদ্যমান হল; কিন্তু যে সুস্থ সাধনের দ্বারায় বিরাট কল্পনাসমস্তকে স্মরণের মধ্যে ধারণ করতে সমর্থ হল সেই বীর হল রূপ ও অরূপ দুই রাজ্যের রাজা; সে হল বীর সে হল কবি সে হল শিল্পী সে হল ঋষি, আবিষ্কর্তা গুণী রচয়িতা। কল্পনাপ্রবণতা হল মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক অবস্থা, কেননা দেখি কল্পনা তার আশৈশব সহচরী। খেয়াল জিনিশটা বিশ্বসংসারকে পুরনো হতে দিচ্ছে না মানুষের কাছে, একই আকাশের তলায় একই ঋতু পরিবর্তনের মধ্যদিয়ে একটা পৃথিবীতেই চলি বলি খাই-দাই ঘুমোই, কিন্তু কল্পনায় গড়ে চলি খেলা করি বিচরণ করি আমরা নতুন নতুন জগতে চিরযৌবন চির বসন্তের স্বপ্ন নিয়ে! বস্তুজগতের এইটুকু ঘটনার স্মৃতিগুলো বড় হয়ে ওঠে কল্পনায়। মানুষের এতবড় ঐশ্বর্য এই কল্পনা, একে হারালে তার মতো দীন ও অধম কে? কোনোদিকে অগ্রসর হবার রাস্তা তার বন্ধ হল, কায়ার মায়াহীন প্রাচীরের সুদৃঢ় বন্ধনে সে বন্দি রইল 'সশ্বাসমিব' কিন্তু সশ্বাস মোটেই নয়।

কাব্যে পুনরুক্তি একটা মহৎ দোষ; পুনঃপুন কেবল পুনরুক্তি সেইখানেই চলে যেখানে উক্তকে সমর্থন করতে হয় একটা কথা বারবার বলে। যে-ছবি হয়ে গেছে তাকে আবার এঁকে কী লাভ, জানালা দিয়ে দিনরাত চোখে পড়ছে যে-আকাশ ও মাঠ ঘরবাড়ি সেটার

সঠিক প্রতিচ্ছবি কী দরকার মানুষের, যদি-না সে স্মৃতির সঙ্গে কল্পনাকে এক করে দেখায়! কল্পিত থেকে বঞ্চিত বাস্তবটা হল মানুষের কাটা হাতপায়ের মতো বিশ্রী জিনিশ, মৃতদেহ সেও স্মৃতি জাগায় কল্পনা জাগায় কিন্তু আসলের নকল কিংবা আসলের থেকে বিচ্ছিন্ন যেটা সেটা প্রাণে বাজে না, বিশ্রীরকমে কানে বাজে চোখে বাজে।

বিদ্যমান বস্তুর প্রতিকৃতি প্রতিবিম্ব সঠিক নকল ইত্যাদির মধ্যেই যারা আর্টকে বদ্ধ করে স্মৃতি ও কল্পনার থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে চায় কিংবা অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের সম্পর্ক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে উন্মত্তকে অবাধ্যতা দিয়ে ছেড়ে দিতে চায় অনির্দিষ্ট পথে তারা শাস্ত্রকার হলেও তাদের কথা শোনায় বিপদ আছে। এমনো লোক আছে যার নেশায় চোখ এমন বুঁদ হয়ে গেছে যে দিন কি রাত, উত্তম কি অধম, বস্তু কি অবস্তু সব জ্ঞান তার লোপ পেয়েছে—টলে পড়ার দিকেই যার ঝোঁক; আবার এমনো লোক আছে যার চোখে রঙ্গ-রসের নেশা একেবারেই লাগল না, সে গট্ হয়ে বসে আছে শাদা-চোখে শাদাসিধে লোকটি, একজন বকে চলেছে প্রলাপবাক্য আর-একজন কিছুই বলছে না বা বলছে শাদা কথা—শিল্পজগতে এই দুইজনের জন্যই স্থানাভাব। নাটকের মধ্যে যেখানে মাতলামি দেখাতে হয় সেখানে একটা সত্যিকার মাতাল এনে ছেড়ে দিলে সে কুকাণ্ড বাধায়, অন্যদিকে আবার যার কোনোকিছুতে মত্ততার লেশ নেই তাকে এনে রঙ্গমঞ্চে ছেড়ে দিলেও সেই বিপদ, দুই পক্ষই যাত্রা মাটি করে বসে থাকে। মাতলামির রঙ যার চোখে ইচ্ছামতো আসে-যায়, নেশা যার চোখের আলো মনের গতিকে নিস্তেজ করে বাস্তব অবাস্তব দুয়ের বিষয়ে অন্ধ ও আতুর করে দেয় না, সেই হয় আর্টিস্ট, মনকে মনের দিকে কল্পনাকে বাস্তবের স্মৃতির দিকে অবিদ্যমানকে বিদ্যমানের দিকে অভিনয়ন করেন আর্টিস্ট 'সশ্বাসমিব' স-সে-মি-রা অবস্থান নয়, মোহগ্রস্ত বা জীবন্মৃত নয় কিন্তু রসের দ্বারায় সঞ্জীবিত প্রস্ফুটিত।

শিল্পশাস্ত্র ঘাঁটতেই যদি হয় তবে গোড়াতেই আমাদের দুটো বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে—কোন্‌টা মত এবং কোন্‌টা মন্ত্র এ-দুয়ের সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণাটি নিয়ে কাজ করতে হবে। মত জিনিশটা একজনের, দশজনে সেটা মানতে পারে নাও মানতে পারে, একের কাছে যেটা ঠিক অন্যের কাছে সেটা ভুল, নানা মুনির নানা মত। মন্ত্রগুলি সম্পূর্ণ আলাদা জিনিশ। মত একটা লোকের অভিমতকে ধরে প্রচারিত হল আর মন্ত্র প্রকাশ করলে আপনাকে সবদিক দিয়ে যেটা সত্য সেইটে ধরে। শিল্পশাস্ত্রে মত এবং মন্ত্র দুটোই স্থান পেয়েছে, মতকে ইচ্ছা করলে শিল্পী বর্জন করতে পারেন কিন্তু মন্ত্রকে ঠেলে ফেলা চলে না।

যথা সুমেরুঃ প্রবরো নগানাং যথাণ্ডজানাং গরুড়ঃ প্রধানঃ।
যথা নরাণাং প্রবরঃ ক্ষিতীশ স্তথা কলানামিহ চিত্রকল্পঃ ॥ [৬]

খণ্ড খণ্ড অনেকগুলো সত্য দিয়ে এটা বলা হলেও সমস্ত শ্লোকটা কলাবিদ্যার সম্বন্ধে একটা প্রকাণ্ড অহমিকা নিয়ে মত আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। যে রাজভক্ত তার কাছে ক্ষিতীশচন্দ্র হলেন শ্রেষ্ঠ কিন্তু এমন অনেক ফটিকচাঁদ আছে রাজাও যার পায়ে মাথা লোটায়। এছাড়া চিত্রকলাই সকল কলার শ্রেষ্ঠ কলা এ-কথা একেবারেই অসত্য কেননা গীতকলা কাব্যকলা নাট্যকলা এরা কেউ কমে যায় না! মতের মধ্যে এই একটা মস্ত ফাঁক আছে, মন্ত্রে কিন্তু তা নেই দেখ—শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কা ভাবাঃ বিভাবজনিতাশ্চিবৃত্তয় ঈরিতাঃ' [৭]—এ সত্যের দ্বারায় পরখ-করা জিনিশ, এ মন্ত্রশিল্পীকে সুমন্ত্রণা দিচ্ছে ভাব ও

তার আবির্ভাব সম্বন্ধে, অতএব এতে কারু দুই মত হবার কথা নয় কিন্তু 'দৌর্বল্যং স্থুলরেখত্বং অবিভক্তত্বমেব চ। বর্ণানাং সঙ্করশ্চাত্র চিত্রদোষা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥' [৮] এটা একটা লোকের মত, মন্ত্রের মতো খুব সাচ্চা জিনিশ নয়, এর মধ্যে অনেকখানি সত্য এবং মিথ্যাও লুকিয়ে আছে, দৌর্বল্য স্থুলরেখত্ব অবিভক্তত্ব বর্ণসঙ্করত্ব হল চিত্রদোষ কিন্তু কিসের দৌর্বল্য কিসের অবিভক্তত্ব টীকা না হলে বোঝা দুষ্কর, তাছাড়া এসব দোষ-যে চিত্রে কোনো কাজে আসে না তা নয়, এসবই চাই চিত্রে; বর্ণসঙ্কর না হলে মেঘলা আকাশ সূর্যোদয় এমনকি কোনোকিছুই আঁকা চলে না, অমিশ্র বর্ণ সে এক ছবি দেয়। মিশ্রবর্ণ সে অন্য ছবি দেয়, ফুলের বোঁটার টান দুর্বল গাছের গুঁড়ির টান সবল দুর্বল স্থুল সূক্ষ্ম সব রেখা সব বর্ণ ভাব ভঙ্গি মান পরিমাণ সুর এমনকি বেসুর তা তো অনেক সময় দোষ না হয়ে গুণই হয়ে ওঠে গুণীর জাদুমন্ত্রে।

এইবার শিল্পের একটা মন্ত্র দেখ, পরিষ্কার সত্য কথা—'রূপভেদাঃ প্রমাণানি ভাবলাবণ্যযোজনম্। সাদৃশ্যং বর্ণিকাভঙ্গ ইতি চিত্রং ষড়ঙ্গকম্ ॥' [৯] ভারতবর্ষ থেকে ওদিকে আমেরিকা কোনো দেশের কোনো চিত্রবিদ এর উল্টো মানে বুঝে ভুল করবে না, কেননা চিত্রকরের কারবারই হল এই ছয়টার কোনোটা কিংবা এর কোনো-কোনোটাকে নিয়ে। একটা চিত্রে পুরোমাত্রায় এ ছয়টা পাব না নিশ্চয় কিন্তু দুটো-চারটে চিত্র ওল্টালেই বুঝব কেউ রূপপ্রধান কেউ প্রমাণসর্বস্ব কেউ ভাবলাবণ্য-যুক্ত কেউ বর্ণ ও বর্ণিকাভঙ্গে মনোহর কেউ ষড়ঙ্গের দুটো নিয়ে চিত্র, কেউ পাঁচটি নিয়ে হয়েছে ছবি।

ও সত্যের দ্বারায় বলীয়ান। ধর্মের যেমন-তেমন শিল্পকলাতেও মানুষ মতও মত অপেক্ষা রাখে সমর্থনের, মন্ত্র যা তা নিজেই সমর্থ—প্রত্যক্ষ প্রমাণ চালিয়েছে মন্ত্রও দিয়েছে। তার মধ্যে মতগুলো দেখি কোনোটা চলেছে কোনোটা চলেনি এবং মত ধরে কোনো শিল্প মরল কোনোটা আধমরা হয়ে রইল কিন্তু শিল্পের মূলমন্ত্রগুলো সেই পৃথিবীর আদিমতম এবং নতুনতম শিল্পে সমানভাবে কাজ করে চলল। মত খণ্ডন হল মহাকলরবের মধ্যে কিন্তু মন্ত্রের সাধন করে চলল মানুষ নীরবে। মানবের ইতিহাসে এটা নিত্য ঘটনা, মানুষের গড়া শিল্পের ইতিহাসেও এর প্রমাণ যথেষ্ট রয়েছে। শাদা মানুষ, সে কালো মানুষ সম্বন্ধে শক্ত মত নিয়ে এগোয় কিন্তু কালো মানুষ পদে-পদে সেই মতের সমর্থন করে চলে না; কিন্তু মানুষ যেখানে মানুষের কাছে মন্ত্র নিয়ে এগোয়—মানুষে-মানুষে অভেদমন্ত্র দয়ার মন্ত্র প্রেমের মন্ত্র—সেখানে মতভেদ হয় না শাদায়-কালোয়; তেমনি শিল্পের বাস্তব ও কল্পনা মানুষি ও মানসী, প্রতিকৃতি ও প্রকৃতি, রিয়্যালিটি ও আইডিয়্যালিটি এইসব নানাদিকে যেসব মতগুলো আছে তা নিয়ে এর সঙ্গে ওর বিবাদ কিন্তু কলাবিদ শিল্পসাধক বাস্তবজগতের এবং কল্পনাজগতের মধ্যথেকে শিল্পের যেসব মন্ত্র আবিষ্কার করেছে সেগুলো গ্রহণ সম্বন্ধে বিচার বিতর্ক অথবা মতামতের কথা কোনো দলের কেউ তোলে না।

বৌদ্ধযুগ থেকে আরম্ভ করে মোগল এবং ব্রিটিশ আমল পর্যন্ত আমাদের কলাবিদ্যা সমস্ত এমনকি কলাবিদদের আকৃতি প্রকৃতি পর্যন্ত নানা মতের চাপনে রকম রকম লক্ষণে চিহ্নিত হয়েছে। এ যে আমাদের নানা কলাবিদ্যার নানা আকৃতি ও প্রকৃতির বিভিন্নতা এগুলো কোনো-এককালের শাস্ত্রমত বা লোকমত বা ব্যক্তিবিশেষের মতের সঙ্গে মেলালে দেখব নিখুঁত মিলছে না—অজন্তার অতুলনীয় চিত্র সে হয়ে যাচ্ছে চিত্রাভাস, মোগলশিল্প হয়ে যাচ্ছে যবন-দোষ-দুষ্ট এবং তার পরের শিল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে সকল দোষের আঁধার! চীন-দোষ, জাপান-দোষ, ব্রিটন-দোষ, জার্মান-দোষ—দোষের অন্ত নেই মতের কাছে।

কিন্তু শিল্পশাস্ত্রের মধ্য থেকে শিল্পের মন্ত্রগুলো বেছে নাও এবং সেইসকল মন্ত্র দিয়ে পরখ করো, একা ভারত-শিল্পের অসংখ্য অবতারণা ঠিক করা যাবে—ভারত-শিল্পের সেই সত্যরূপ যেটি নিয়ে ভারত-শিল্প বিশ্বের শিল্পের সঙ্গে এক এবং পৃথক। কোনো শিল্পের স্বরূপ শাস্ত্রমতের মধ্যে ধরা থাকে না, সেটা শিল্পের নিজের মধ্যেই ধরা থাকে।

ভারত-শিল্পের কেন, সব শিল্পের প্রাণের খোঁজে যে-শিক্ষার্থীরা চলবেন তাঁদের এই মত ও মন্ত্রের পার্থক্য প্রথমেই হৃদয়ঙ্গম করা চাই। মতকে মন্ত্র বলে ভুল করলে চলবে না। যুদ্ধের সময় দুপক্ষের সেনাপতি মত দেন কোন্ পথে কীভাবে ফৌজ চলবে, ব্যূহ রচনা করবে এবং সেইমতো ম্যাপ প্রস্তুত করে নিয়ে ফৌজের চালনা হয়। শিল্পশাস্ত্রকারের মতগুলো এই ম্যাপ, দেশের শিল্প কখন কী মূর্তি ধরেছিল তার প্রথা ও প্রণালীর সুস্পষ্ট ইতিহাস শাস্ত্র থেকে পাওয়া যায় বলে তার মধ্যে কোনো-একটা পথে যদি আজ আমরা শিল্পকে চালাতে চাই তো এইসব প্রাচীন মত শিল্পে পেটেন্ট নেওয়ার বেলা খুব কাজে আসবে, দেশের প্রাচীন আর্টের ইতিহাস লিখতে কাজে আসবে, গত আর্টের নতুন থিসিস্ লিখতে কাজে আসবে, এমনকি আর্টিস্ট না হলেও আর্ট সম্বন্ধে ওরিজিন্যাল রিসার্চ লেখার পক্ষেও এইসব মত যথেষ্ট রকম ব্যবহারে লাগবে; কেননা এদের কপিরাইট বহুদিন শেষ হয়েছে—কিন্তু শিল্পকে যারা চায় তাদের কাছে এইসব মত বেশি কাজে আসবে না। শিল্পশাস্ত্রের মধ্যে এমনকি বৈদ্যশাস্ত্রের বৈষ্ণবশাস্ত্রের এককথায় লিখিত শাস্ত্রের অপার সমুদ্রের তলায় ও শিল্পেরই মধ্যে যেসব মন্ত্রগুলো এখানে-ওখানে লুকিয়ে আছে সেগুলো উপকারে লাগবে।

যে জানতে চায় শিল্পকে তাকে মত ও মন্ত্র দুই উদ্ধার করে-করে চলতে হয়। শুধু যুদ্ধক্ষেত্রের ম্যাপ ধরে চললেই যুদ্ধে জিত হয় না, এটা পাকা সেনাপতি পাকা সেপাই দুজনেই বোঝে, ম্যাপের সীমানার পরে যে অনির্দিষ্ট সীমানা তার কল্পনা সেনাপতিও ধরে থাকে সিপাহীও ধরে থাকে এবং বীরত্বের যে-একটি মন্ত্র দুঃসাহস তাকে মনে পোষণ করে অগ্রসর হয়, জিতলে পুরস্কার হারলে তিরস্কার! নতুনকে জয়ের কল্পনা তাদের মনকে দোলায়, ম্যাপে দাগা মতামতের উল্টোপথে অনেক সময়ে তারা চলে মন্ত্রের সাধনে শরীর পাতনে, হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে তারা মন্ত্রণা করে সেনা ও সেনাপতি, অন্ধকারের মধ্যদিয়ে পথ বিপথ অতিক্রম করে গিয়ে দেয় হানা অজানা পুরীর দরজায়, হঠাৎ দখল হয়ে যায় একটা রাজত্ব যেন মন্ত্রবলে। শিল্পকে পেলে তো কথাই নেই, শিল্পের মন্ত্রগুলো পেলে শিল্প পেতে দেরি হয় না, কিন্তু মতগুলোতে পেয়ে বসলে শাস্ত্রমতে যাকে পাওয়া বলে তাকেই পায় মানুষ, শিল্প রচনাকে পায় না মনোমতো মনোগত এসবের কল্পনাকেও পায় না।

অরূপ না রূপ

অরূপ বীণা রূপের আড়ালে।

বীণা দেখা যায় কিন্তু সুর তাকে দেখা যায় না; কিন্তু চেনা যায় সেই সুর দিয়ে যে এটি বীণা বাজছে, ঢাক নয় ঢোল নয় গ্রামোফোনের বীণা নয়। দেখা-বীণার সঙ্গে না-দেখা যে-সুরটি জড়িয়ে রয়েছে, সেটি বীণার প্রাণস্বরূপ বীণার কাঠামো ধরে আছে প্রাণ।

রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়ে রহিল,
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।

একটি রূপের অশেষ প্রকাশ, দৃষ্টি খুঁজে-খুঁজে রূপসাগরের পায়ে অরূপ বলে একটা-কিছু ধরতে সাঁতরে চলল না, রূপের মধ্যেই তলিয়ে গেল। মন যৌবনের শেষ চাইলে না, নতুন থেকে নতুনতর আনন্দে আপনাকে হারিয়ে ফেলেই চলল। এই হল রূপদক্ষের কথা, রূপসাধনের চরম সিদ্ধি। একসঙ্গে রূপ-লাবণ্য-ভাবভঙ্গি যা চোখে দেখা গেল তা এবং সেইসঙ্গে রূপের মাধুরী তাও পেয়ে গেল যখন মানুষ, তখন সে হল রূপদক্ষ।

রূপ সবারই চোখে পড়ে কিন্তু রূপের মাধুরী তো সবার কাছে ধরা দেয় না। ফুলটা দেখলাম, ফুলের আঘ্রাণ নিয়ে ফুলের সৌরভ কেমন তাও জানলাম, কিন্তু এই হলেই যে ফুলের মাধুরীটিও পেয়ে গেলাম এমন নয়।

রূপের মধ্যে তিনটি জিনিশ—একটি তার আকার-প্রকার, একটি তার অন্তর্নিহিত ভাব আর দুই জড়িয়ে যে মাধুরী ফুটল সেটি। পর্বত যে পর্বত এবং সে-যে বিরাট ভাব নিয়ে বিরাট, এটুকু সাধারণের পক্ষে ধরা শক্ত হয়, কিন্তু পর্বতের নবীন নীরদ শ্যামরূপের মাধুরী সবার ধারণার বিষয় তো হয় না। তেমনি একটা কবিতা ছবি গান এরা যা দেখালে তা পেলেম, অথচ এদের মাধুরী মনকে একেবারেই স্পর্শ করলে না এমন ঘটনা সাধারণ। রূপদক্ষ যাঁরা তাঁরা এই মাধুরীকে পেয়ে যান, তাই সব রূপই তাঁদের কাছে কালে-কালে পুরাতন হয়ে যায় না, কোনোকালে এই আকাশ-পর্বত নদ-নদী জলস্থল এরা পরিচয়ের দ্বারা ঔদাসীন্য এনে দেয় না তাঁদের মনে, পলে-পলে বারে-বারে এরা মনের সঙ্গে এসে লাগে, চোখে এসে লাগে এরা নতুন হয়ে মধুর হয়ে।

পর্বত একবার দুবার দেখলে তাকে দেখার তৃষ্ণা মিটে গেল আমাদের, কিন্তু রূপদক্ষ তাঁরা আমাদের চেয়ে সৌভাগ্যবান, তাঁরা তো শুধু রূপ বা ভাবটাই পেলেন না, পর্বতের বা অরণ্যের বা ফুলের বা কবিতার বা ছবির অথবা গানের—তাঁরা রূপের সঙ্গে রূপের ভাব এবং তাদের মাধুরী যা রূপকে চিরযৌবন দেয় তা পর্যন্ত পেয়ে ধন্য হলেন।

যাঁরা সত্যি রূপদক্ষ তাঁদের আনন্দের শেষ নেই, চোখ মন সব দিয়ে একটি রূপকে তাঁরা বিচিত্রভাবে দেখে যাচ্ছেন নতুন-নতুন—চিরকাল ধরে নতুন। হিমালয় পর্বত সেও রূপের রঙের সঞ্চয় নিয়ে পুরোনো হয়ে শেষ হয়ে গেল যাদের কাছে এমন মানুষ খুব কম নেই, কিন্তু হিমালয়ের একটা পাথর একটি গাছ মাধুরী পেয়ে অফুরন্ত হয়ে রইল, চিরনতুন হয়ে গেল যার কাছে এমন মানুষই কম দেখা যায়।

গানে যে রূপ ফুটছে, কবিতায় যে রূপ, ছবিতে যে রূপ এবং বিশ্বের এই বিশ্বরূপ—সবারই কাজ মাধুরীতে মনকে তলিয়ে দেওয়া। এই মাধুরী স্পর্শ করে চলেছে তাবৎ জীব, কেউ এতে তলিয়ে যাচ্ছে, কেউ সমুদ্রের জলে তেলের মতো উপরে-উপরে ভাসতে থাকছে তলাতে পারছে না।

চন্দ্রোদয় দেখে 'আহা সুন্দর' বলে না এমন লোক কম, কিন্তু তারা সবাই চাঁদের মাধুরীকে পেয়ে যায় না। এই ধরনের সাধারণ ভাবপ্রবণতা চন্দ্রকান্তমণির মতো চাঁদ উঠতেই ভিজে ওঠে, কিন্তু কিছু উৎপন্ন করে না মনের সামগ্রী। অসাধারণ ভাবপ্রবণতা হল মাটির মতো, রসে সেজে, বীজে ফল ধরায়, শক্তি গজায়, ফুল ফোটায়, ফল দেয় নানা রকম।

জিনিশটাকে বার থেকে বেশ করে চেনা হল এবং তার ভিতরের ভাবটাও যাহোক নিপুণভাবে বার করে দেখা হল কিন্তু বাকি রইল তখনো আসল যেটা পাবার সেটি পাওয়া—রূপের মাধুরীটুকু।

আর্টের সঙ্গে আর্টিস্টকে পাই তাই আর্টের আদর করি, রূপের আড়ালে অরূপকে দেখি তাই রূপের আদর করি, এমনি কতকগুলো বচন আর্ট-সমালোচনাতে প্রচলিত হয়ে গেছে। আর্টিস্টের এবং অরূপের কাছে পৌঁছে দিতে রূপ এবং আর্ট যেন আমাদের সোপান। রূপ সিঁড়িও নয় প্রহরীও নয় আর্ট এগজিবিশানের, যে তাকে ধরে আর্টিস্টের সঙ্গে পরিচয় করতে চলবে, বা অরূপ অদ্ভুত একটা বাজি দেখবে তার কাছে ছাড়পত্র নিয়ে!

মাধুরী দিয়ে রূপের সাগর ভাসিয়ে নিতে তলিয়ে নিতেই রূপ আছে, রূপ আছে আর্টিস্টের কথা অরূপের ধ্যান ভুলিয়ে দিতেই। সুরূপাদের শিরোমণি তাজবিবি সে মিলিয়ে গেল রাতের অন্ধকারে, কিন্তু তার রূপ সে এসে বললে, "এই রইলেম আমি রূপের স্বপ্নে বাঁধা এই পাথরের ভিতরে বাহিরে সুপ্রত্যক্ষ, অরূপে মিলাল না রূপ আমার, রূপের সঙ্গে মিলল এসে আমার নতুন রূপ।' তাজমহলের দর্শন শিল্পীর নাম ও পরিচয় বা ইতিহাসের এক অধ্যায় পড়ে নেওয়াতে তো নয়, তাজমহলের রূপের মাধুরী পাওয়াই হচ্ছে দেখার শেষ। রূপ থেকে মাধুরীকে পেয়ে যাওয়াতে রূপের এবং রূপদক্ষের সার্থকতা। দেহতত্ত্ব আধ্যাত্মিকতত্ত্ব এমনি শক্ত রকমের একটা তত্ত্ব পেয়ে রূপ বা রূপদক্ষ ধন্য হয় না কোনোকালে।

বর-কনের বিয়ের দিনে অনেকগুলো লোক থাকে যারা কেউ 'তত্ত্ব' বয়, কেউ শাস্ত্র কয়, কেউ বর-কনের দাম কত যাচাই করে—এমনি নানা ঘটনা নিয়ে উৎসব একটা রূপ পেয়ে বসে সবারই কাছে। কিন্তু উৎসবের মাধুরিমা পেয়ে যায় শুধু দুটি-তিনটি লোক—বর-কনে কনের মা এমনি দু-চার অন্তরঙ্গ, যারা হাসে কাঁদে একসঙ্গে।

বিশ্বজোড়া রূপ মাধুরী-সাগরে টলমল করছে—বাতাসে মাধুরী সাগরজলে মাধুরী আকাশে মাধুরী ধরিত্রী মাধুরী বহন করছে, অরণ্যে মাধুরী পথের ধূলা তাতেও মাধুরী। এত মাধুরী ধরা রইল দশদিকে কিন্তু এর উপভোগের উপযুক্ত হল না মানুষ ছাড়া আর-কোনো জীব। এই-যে শ্রেষ্ঠ দান কবির কবি রচয়িতার রচয়িতা আর্টিস্টেরও আর্টিস্টের কাছ থেকে এল, একে পেয়ে মানুষ পরিতৃপ্ত হবে, না এতে খুশি হয়ে দাতারই কথা স্মরণ করবে—এই ভাবনা হিমালয়ে বসে আমার মনে উঠেছিল। আমার দেবতাকে আমি প্রশ্ন করেছিলেম, দান দেখেই যে ভুলে থাকি তোমায়, দেখতে চোখও চায় না মনও চায় না—এ কেমন দান তোমার!

সত্যই যে দান দাতাকে ভুলিয়ে দেয় সেই তো বড় দান, যে দান ঠেলে দাতা আপনি এগিয়ে আসেন সে দান তো তুচ্ছ দান। রূপদক্ষতার চরম তো সেইখানে যেখানে রচনার রূপ রঙ সমস্তই ভুলিয়ে দিলে রূপদক্ষকে, শুধু তার দান-করা রূপের মাধুরী মনকে পরিপূর্ণ করলে।

ছবির কবিতার সঙ্গীতের উদ্দেশ্য রচয়িতাকে সুপরিচিত করা—এ হতেই পারে না। রচয়িতা যেখানে গোপন, রূপদক্ষের পূর্ণ দক্ষতা সেখানে। ছবির সঙ্গে আর্টিস্টকে জানছি এ নয়, আর্টিস্টকে জানলেম না শুধু জানলেম রচনাকে এবং পেলেম তা থেকে মাধুরী যা পাবার তা—এই হল ঠিকভাবে রূপের উপভোগ। কিন্তু এ না হয়ে ছবি নিয়ে কবিতা নিয়ে সঙ্গীত নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখতে চললেম কোথায় তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা দার্শনিকতা প্রভৃতি নানা তত্ত্বের সিংহাসনে আর্টিস্ট বসে আছেন—এতে রূপকে কোনোদিক দিয়ে দেখাশোনা কিছুই হল না। ভোলাতেই রূপের সৃষ্টি হয়েছে যখন, তখন রূপকে অতিক্রম করে অরূপ প্রভৃতির সন্ধান কতকটা যেন বরকন্যার যুগলমূর্তির সামনে বসে দুজনের কুলপঞ্জি এবং তাদের আয়-ব্যয় ও ধর্ম-কর্মের হিশেব দেখে খুশি হয়ে যাওয়ার মতো কাজ।

মধুভরা আকাশে বাতাসে আলোর মধ্যে ফুলের কুঁড়ি প্রাণের পাত্র খুলে ধরলে, মধু সঞ্চিত হল যেখানে, তেমনি রূপদক্ষ রচনার সামনে হৃদয় পেতে দিলেন, মধুতে পরিপূর্ণ হল পাত্র—রূপের সবখানি এতেই পাওয়া হয়ে গেল। এটা কবিকল্পনা নয়, সৃষ্টির রূপের রহস্য এই নিয়ে এবং এই নিয়ে আর-সব জীবের চেয়ে মানুষ আমরা বড় হলেম—'অমৃতস্য পুত্রাঃ'। বর্ষার আকাশ জলই ঝরায় তাদের কাছে যারা মেঘের পেছনে মেঘবাহন ইন্দ্র নয়তো মেঘনাদ নয়তো বৃষ্টিতত্ত্ব গোছের একটা-কিছু দেখার চেষ্টা করে, আর সেই মেঘ অমৃত বর্ষণ করে তার প্রাণে যে মেঘের রূপ দেখেই ভুলে থাকে, কার দেওয়া মেঘ কোথাকার মেঘ কী দরের মেঘ এসব খোঁজই নেয় না।

মধুকরের সঙ্গে রূপদক্ষের তুলনা দেওয়া হয় কখনো-কখনো, কিন্তু রূপদক্ষ ফুলের মাধুরী ফুলের রূপের সঙ্গে পায়, মধুকর শুধু পায় ফুলের মধু, ফুলকে পায় না। রূপের মধ্যে মধুকর ছাঁকা অরূপ রস পেয়ে বঞ্চিত হল, আর রূপদক্ষ মানুষ রূপে রসে সমান অধিকার পেয়ে চরিতার্থ হয়ে গেল।

রূপ কী তা বোঝাতে হয় না কাউকে, রূপ চোখে পড়লেই জানায় আপনি কী বস্তু; কিন্তু রূপের মাধুরী সে-যে অন্তরের জিনিশ, তাকে বোঝাতে গেলেও বোঝানো হয় না, রূপদক্ষ যারা তারা তা জানে কিন্তু জানাতে পারে না। যাকে জানা গেল কিন্তু জানানো গেল না তেমন বস্তু নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেওয়া চলে না, কাজেই রূপ সম্বন্ধে চর্চা করি শুকনোভাবে, মাধুরী তোলা থাক কিছুকালের জন্য।

মাধুর্য এবং রূপ দুটোর বিষয়েই 'উজ্জ্বল নীলমণি'তে লেখা আছে কিন্তু রূপ যে দেখলে না, রূপের মাধুরী হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করলে না, সে হাজারবার 'নীলমণি' উল্টেপাল্টে পড়েও কিছুই পেলে না। রূপ দেখে ভুলে যাওয়া যার হল না সে পড়েই চলল পুঁথি। রূপ যে নিজের দৃষ্টির বিষয় এবং তার মাধুরী নিজের মনের বিষয়, অন্যের—এমনকি খুব বড় কবিরও—পিছনে-পিছনে গিয়ে তাদের চোখে দেখলে রূপ দেখা হয় না, অন্যের দেখার মতো করে দেখা হয়।

মহাকবি কালিদাস একরূপে হিমালয় পর্বত দেখে খুব সম্ভব কল্পনা করেই লিখলেন—

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা
হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপুরৌ তোয়নিধীবগাহ্য
স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ [৩৯]

বড় কবির দেওয়া এই মানদণ্ড, এ দিয়ে হিমালয় পর্বতের রূপের পরিমাপ করে দেখতে গেলে দেখব এই শ্লোকের দুটো ছত্র এবং এরি প্রতিরূপ। এ ছাড়া আর কিছু ভালো-মন্দ চোখে পড়বেই না এবং দেখব মনও এই শ্লোকের প্রতিধ্বনি ধরে চলছে চোখের সঙ্গে পাহাড়ে ও অরণ্যে পরের দেওয়া রূপ ও রসের ভালো-মন্দর মধ্যে—রেলের উপরে গাড়ির মতো বাঁধা-পথে।

মহাকবির চশমা নিজের চশমার চেয়ে বড় চশমা, কিন্তু বৃদ্ধের চশমা যুবা চোখে পরলে অথবা যুবার চশমা বুড়োয় পরলে কী দশা হয় সেটাও তো দেখা চাই! আমি যদি কালিদাসি করে লিখি যে—গিরিচূড়ার মতো উন্নতনাসা, তার উপরে ধরা রয়েছে সোনার তারের দুইধারে ধরা দুখানি মোতিয়াবিন্দু, সে তো চশমা নয়, সে রূপ অরূপ দুই সমুদ্রের জলের পরিমাণ করে নেবার দাঁড়িপাল্লাখানি!—তবে হয় লোকে বলবে আমার চোখ খারাপ কিংবা উল্টো চশমা পরেছি। এর চেয়ে বেশিও বলবে। হিমালয়কে একটা মাটির ঢেলা ওজন করবার দাঁড়িপাল্লার মতো দেখায় মজা আছে, রসও একরকমের আছে, কিন্তু তাই বলে সেটা হিমালয়ের উপযুক্ত বর্ণনা একেবারেই নয়। বলতে সাহস হয় না, তাই বলি যে মহাকবি কালিদাসের ভুল-বর্ণন চাঁদের কলঙ্ক, আর চশমা-চোরা অকবির ভুল-বর্ণন তার নিজের মুখের চুনকালির প্রায়। এ-কথাটা সহজ সত্যকথা, কিন্তু এ-কথামতো চলা অত্যন্ত কঠিন সেইজন্যে জগতে অনেক কবি নেই, অনেক আর্টিস্ট নেই, অনেক রসিকও নেই, ঋষিও নেই, যাঁদের আর্ষপ্রয়োগ মাপ করা চলে। তিন মাস আমি নিজের লাঠি ধরে পাহাড় প্রদক্ষিণ করেছি, কোনোদিন পর্বতের কাছে বকশিশ পেয়েছি, কোনোদিন পাইনি। মহাকবির চাদরের খুঁট ধরে গেলে হয়তো পদে-পদে কিছু -না-কিছু প্রসাদ পেতেম। কিন্তু আমার প্রশ্ন এই যে, কবির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পর্বতকে পাওয়া অকবির বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে পাওয়ার চেয়ে ভালো হলেও নিজে খুঁজে পাওয়ার আনন্দের একবিন্দুর সঙ্গে তার পরিমাপ হয় কি? মহাজনের সঙ্গে চলা নিরাপদ এটা সবাই বলে, কিন্তু মহাজন নিজের চোখের চশমা অন্যের চোখে পরিয়ে-যে সহজ-দেখার পথ বন্ধ করেন এ তো মিছে কথা নয়। রূপ নিজের দৃষ্টির বিষয়, সে মধুর কি মধুর নয় তা নিজে দেখে বুঝি। 'রূপের পর্দা পরিয়ে অরূপকে দেখ'—এটা মহাজনদের কথা, কিন্তু রূপ রূপ-দেখাতেই তো আছে এটা সহজ মানুষের কথা।

পূর্ণচন্দ্রের আলোকে পরাস্ত করে পর্বতের উপরের তারাটি জ্বলছে, তার রূপ দেখেই আনন্দ, তারাটা কোন্ তারা, তারার অন্তরে কোন্ দেবতার দীপ্তি—এসব মনে নাইবা এল। যার রূপ আছে সে রূপ দিয়েই মন টলায়, নকিবের দরকার তার যার নিজের রূপগুণাদির পরিমাণ যথেষ্ট নয়। ইন্দুমতীর স্বয়ংবরসভায় রূপ নকিবের দেওয়া সাজ না-পেয়েই বরমাল্য লাভ করলে। রূপের দর্শন করে আনন্দিত হওয়াতেই তার পরিণতি, রূপ থেকে স্বতন্ত্র রঙ থেকে স্বতন্ত্র বর্ণহীন রূপহীন অরূপের প্রতীক হওয়াতে রূপের সার্থকতা নয়। প্রতিমার মর্যাদা প্রতীক হয়ে পড়াতে নয়, রূপের আসনেই তার গৌরবের আসন। গৌরীশঙ্কর হিশেবে বরফের পাহাড় দেখা পাহাড়কে সত্য দেখা বলে তো মনে হয় না।

একটা সমুদ্রের তরঙ্গ ঘোড়া হিশেবে দেখে কবিদের আনন্দ হয়, কেননা কবি ভাবুক কিন্তু আর্টিস্ট তিনি যে রূপদক্ষ।

দেশলাইয়ের বাক্স একটা, সিগারেটের টিন একটা, লোহার সিন্দুক একটা এবং কালীঘাটের কৌটো একটা—এদের ভালো-মন্দের হিশেব এদের রূপের মধ্যেই রয়েছে। দেশলাইয়ের বাক্সর কবি বাক্সটার রূপ বড় উপমার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে হয়তো কালীঘাটের কৌটোর চেয়ে তাকে ভালো বলে প্রমাণ করতে পারেন কারো কাছে, কিন্তু আর্টিস্ট রূপ দিয়েই রূপের পরিমাণ করে দেখবে, উপমার ভালো-মন্দ দিয়ে নয়।

কি প্রাচীন কি আধুনিক ভারত-শিল্পের একটা রূপ আছে, শুধু তাই দিয়েই তার ভালো-মন্দ উচ্চ-নীচ বিচার। আধ্যাত্মিকতার প্রশংসাপত্রের উপরে তাকে বসালে সে-যে জগৎশিল্পে বড় জিনিশ বলে চলে যাবে এ-কথা ভাবাই ভুল। গুণের অপেক্ষা না-রেখেই রূপবান সহজেই প্রমাণ করে যে সে রূপবান। অষ্টাবক্র তিনি ঋষি হয়েও একটা ছেলের কাছে ধরা পড়লেন যে তিনি রূপবান একেবারেই নন, নির্দোষকে তিনি অভিসম্পাত দিয়ে প্রমাণ করিছেলেন তিনি বড় ঋষি।

ইন্দুমতীকে নিয়ে সহচরী সুনন্দা এক-এক রাজার রূপগুণের বর্ণনা কত ব্যাখ্যান দিতে-দিতে চলল, মালা পড়ল না কারু গলায়। অজ রাজার সামনে এসে সুনন্দা শুধু বলল, 'আর্য্যে ব্রজামোহন্যতঃ।' অজ রাজা যে রূপবান ছিলেন সুতরাং সেখানে সুনন্দার ব্যাখ্যানার প্রয়োজন একেবারেই রইল না। রূপের পর্যাপ্তির মধ্যে রূপের একটু-আধটু খুঁত যেমন, তেমনি গুণেরও বাহুল্যের মধ্যে কুরূপের সবটা তলিয়ে যায়। পয়সার পর্যাপ্তি রূপ গুণ সবার দোষ ফিল্টার করে পাত্রটিকে বিয়ের সভায় হাজির করে, কিন্তু তাই বলে কালো কোনো দিন শাদা হয় না, যা কুরূপ তা অরূপের ছাড়পত্র পেয়েও সুরূপ হয় না।

অনেক সময় দেখি কুরূপ সেও সয়ে গেছে চোখে। যেমন দেখতে-দেখতে সয়ে গেলে রূপের খুঁত চোখেই পড়ে না, তেমনি রূপ অনেক সময়ে অতিপরিচিত হয়ে মর্যাদাও হারায় আমাদের কাছে। হিমালয় পর্বত তার দিকে ফিরেও দেখে না পাহাড়ী মানুষ, আর তিন মাস ধরে প্রতিমুহূর্তে তার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে আমার তৃপ্তি আর মানল না।

হারমোনিয়ামের শব্দ অত্যন্ত বদ কিন্তু কেমন করে আমাদের কানে সয়ে গেছে বুঝতেই পারিনে যে দেবী বীণাপাণির কান লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে সেটা দেখামাত্র। আমি সেদিন একটা ছদ্মবেশের সভায় চীনের জুতো আর কোর্তা পরে গেলেম, বন্ধুরা আমায় দেখে চাপা হাসি হাসলেন, কিন্তু আমার পাশেই আধখানা ধুতি আধখানা কোট পরে কত লোক এল গেল, কারু চোখে তার কদর্যতা ধরা দিলে না; সয়ে গেছে বলেই তো!

রূপ সম্বন্ধে বলবার সময় অরূপের কথা ওঠে প্রায়ই দেখি এবং অরূপের আধার রূপ এও বলা হয় এবং অরূপের সাধনার জন্যেই আর্টে রূপের অবতারণা এমনও বলা প্রচলিত হয়ে গেছে চিত্র-সমালোচনাতে, সুতরাং গত তিন মাস ধরে পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে ছবিতে এই রূপ-অরূপের ঠিক যোগাযোগটা কী ভাবের তা ধরার চেষ্টায় রইলেম। দেখতেম পর্বতের সামনে যখন কুয়াশা তখন অরণ্য নেই, পাহাড়ের ঝরনা নেই, চোখের কাজ ফুরিয়ে গেছে তখন, মনের এবং কানের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। জলের শব্দ শুনছি, পাখির গান শুনছি আর ভাবছি কত কী, কিন্তু এটা-যে পাখি গাইছে ওটা-যে ঝরনা ঝরছে তা মনে-ধরা রূপ-সমস্ত কুয়াশা হবার আগে থেকেই জানিয়েছে আমাকে। আবার পর্বতের উপরে অমাবস্যার রাত্রি যে কী ভয়ানক অন্ধকার তা পাহাড়বাসীমাত্রই জানেন, পায়ের তলা থেকে মনের কাছ থেকে পথ সম্পূর্ণ হারিয়ে যায়, অরূপ ঘিরে নেয় চারিদিক, দূরত্ব

নৈকট্য আর থাকে না, বিষম ভ্রান্তির মধ্যে স্তব্ধ হয়ে খুঁজে বেড়ায় চোখ আর মন দুজনেই হারানো রূপ আর তার স্মৃতি।

যার কোনো পরিচয় আমার কাছে ধরা পড়ল না সেই রইল আমার কাছে অরূপ হয়ে বর্তমান। বড় সভায় বক্তার সামনে দুই-একজন পরিচিত এবং নিকটবর্তী অপরিচিত মানুষ ছাড়া বেশির ভাগ শ্রোতাই নিজের নিজের রূপ না-দেখিয়ে লোকে পরিপূর্ণ ঘর এইটুকু মাত্র জানাতে থাকে;—এ একভাবে রূপ-অরূপের যোগাযোগ, এর ধারণা ছবিতে পৌঁছে দেওয়া চলল। অবগুণ্ঠিতা সুন্দরী সবাই আঁকে, পর্দানশীন সবাই আঁকে, সেখানে মানুষটি ছেড়ে দেওয়া গেল দর্শকের কল্পনার উপরে, শুধু অবগুণ্ঠন এঁকেই খালাস চিত্রকর। যন্ত্রসঙ্গীতে আরো এগোল, গোটাদুই সুরের টান কানের কাছে দিয়ে এক-একটা রূপ জাগালে, সকাল বিকাল কত কী'র কবিতার ব্যঞ্জনা সুরের রঙের রেখার রেশ দিয়ে যা বলতে পারলে না দেখাতে পারলে না, তা দেখালে শোনালে। ইশারায় বলা হল যা তাকে আর যাই বলি অরূপ বললে ভুল হয়। এক রূপ আর-এক রূপের, এক রঙ আর-এক রঙের, এর সুর অন্যকিছুর ইঙ্গিত করলে—এ পর্যন্ত চলে আর্টে, বেরঙ দিয়ে বোঝানো চলে বাদলা, কিন্তু বেরঙ দিয়ে রঙ, বিনা রেখার ছবি এসব তত্ত্বকথার কথা। পর্বতে বসে রূপ-অরূপ দুয়েরই হিশেব দিয়ে ছবি দেখে আমি অনেকগুলো নোটখাতায় টুকে এনেছি, তাই নিয়ে এ-সমস্যাটা আর-একটু পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব।

"সকালে ফোটা সূর্যমুখী ফুলটিকে নীল আকাশ আলোর খবর এনে দিতে-না-দিতেই প্রথম পৌষের দুরন্ত কুয়াশা দিকবিদিক ঘিরে নিলে।"

কিংবা যেমন—"পাহাড় তলিয়ে যাচ্ছে হিমের প্লাবনে, বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে সকালের আলো—কূল-হারানো একলা হাঁস।"

অথবা যেমন—"সন্ধ্যার আকাশ চেয়ে দেখছে দিনের শেষে আলোর জয়পতাকা শীতের কুয়াশা নামিয়ে রাখছে ফুলের বনের পায়ের কাছটিতে।"

তিনটি ছোট-ছোট স্থান, চিত্রও নয় কবিতাও নয় গল্পও নয়। হাতের লেখায় ধরা দিলে ছবি কটা সহজে কিন্তু তুলির আগায় এদের আটকাতে গেলে দেখব—দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দুটিই ছবি হয়ে রূপ পেয়ে বসে আছে কিন্তু প্রথমটির বেলায় মুশকিল, সেখানে রূপ শাদা কাগজ থেকে পিছলে পড়তে চায়, ঘন কুয়াশা পটের সবটা অধিকার করতে চায়। বাদলের আকাশ যেমন শুধু রঙ দিয়ে জানায় জলের ধারা আছে তার বুকে, তেমনি এখানে কুয়াশা না-দেখা ফুল পাতা ইত্যাদি রূপের পরিমল বহন করে সার্থক একখানি ছবি হতে চাইলে। শাদা রঙের একটা প্রলেপ দিয়ে পাহাড় পর্বত ফুল পাতা সব ধরে দেওয়া পটের উপরে—এ মানুষের কর্ম নয়। ছবি করতে হলেই তাকে হয় রূপ নয় রূপের আভাসের মধ্যে বদ্ধ থাকতে হবেই। পর্বতের আভাস না দিয়ে পর্বতের কুয়াশার ঠিক রূপ এবং মাঠের আভাস না দিয়ে পাহাড়তলার কুয়াশার ঠিক রূপ দেওয়া বিশ্বকর্মার কাজ, মানুষের ক্ষমতায় কুলোয় না।

রূপ যতটুকুই হোক-না কেন সে রূপ ছাড়া অরূপ নয়। জলের মতো হালকা রঙ দিয়ে পাহাড় লিখি, গাছ লিখি, কুয়াশায় গাছ পাহাড় তলিয়ে গেলে তাও লিখি—সে হল ছবি নয় ছাপ। রেখা মাত্রেই রূপবান, রেখা ছেড়ে ছবি কোথায় এবং রঙ ছেড়েই বা রেখা কোথায়? এই রঙ আর রেখার যোগাযোগ ছবিকে সুনির্দিষ্ট অনির্দিষ্টভাবে ধরে চোখে।

রূপের বাঁধন-ছেঁড়া রঙ সেই শুধু রূপের কতকটা আভাস দিতে পারে, যেমন আকাশের গভীর নীল, রঙিন কাপড়ের নিথর রঙ; কিন্তু তারা ছবি নয় ভাবের বাহন, রঙের

একটা-একটা স্ফূর্তি দিয়ে মনে এক-এক ভাব ও রস জাগায় রূপের অপেক্ষা না-রেখেই। সুর কতকটা যে-কাজ করে, রঙ কতকটা সেই কাজই করে; বসন্তবাহার সুর আর বাসন্তী রঙের আলো দুই-ই অনির্দিষ্ট রূপের ধ্যানে মগ্ন করে দেয় মনকে, কিন্তু বাঁধা রঙ ও রূপের পাথারের মনকে তলিয়ে নিয়ে চলাই রেখার কাজ।

ছবি যারা লেখে তারাই জানে রূপ রঙ ইত্যাদি দিয়ে সম্পূর্ণ ফুটতে দিলে এবং সম্পূর্ণ না-ফুটিয়ে দিলে একই বস্তুর দুটো ছবি দুরকম রস দেয় দর্শককে। পটখানির মধ্যে তলিয়ে আছে যে-রূপ, আর পট ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে যে-রূপ—দুটি দুরকম জিনিশ, কিন্তু দুটিই রূপের বাইরের জিনিশ নয়, দুটিই রূপ, একের ঘোমটা আছে অন্যের ঘোমটা নেই এই তফাত। জগৎশিল্প এই তলিয়ে-থাকা রূপ এবং ফুটে-ওঠা রূপ—এই দুই তটের মধ্যে ধরা। সব দেশের সব শিল্পের ধারা ধরা গেছে এই দুই কিনারার মধ্যে। এই দুই পারের হিশেব নিয়ে কলা-রসিকদের মধ্যে দুটো দল সৃষ্টি হয়েছে আইডিয়্যালিস্ট ও রিয়্যালিস্ট নামে এবং ছোটখাটো দঙ্গলও সৃষ্টি হচ্ছে-যে কত তার ঠিকানা নেই, যথা ফিউচারিস্ট, কিউবিস্ট ইত্যাদি-ইত্যাদি, দলে-দলে দলপতিতে-দলপতিতে ঝগড়ারও সীমা নেই। ইম্‌প্রেশনিস্ট বলে একটা কথা চলেছে শিল্প-সমালোচনায়; মিস্টিক কথা তাও ভারত-শিল্পের পরিচয়পুস্তকে স্থান পেয়েছে। ছবিকে নাতিস্ফুট না অতিস্ফুট, নির্দিষ্ট না অনির্দিষ্ট হতে হবে এই নিয়ে তর্কের সীমা ছাড়িয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর গালাগালির বন্যায় গিয়েও ঠেকবার জোগাড় হয়েছে। এই তর্কজাল কুয়াশার মতো যখন সরে যায় তখন দেখি পর্বতে-পর্বতে শুধু স্ফুট-অস্ফুট দুরকমের ছবি ঝরনা দিয়ে বয়ে আসছে দৃষ্টিপথে, এবং এও স্পষ্ট দেখি যে, যে-খাত বেয়ে স্বভাবের দৃশ্যাবলি সেই খাত বেয়েই ভারত-শিল্পও চলেছে কি পুরাতন কি নূতন, অথচ সেটা হল অস্বাভাবিক কারো-কারো কাছে এবং এই অস্বাভাবিক শব্দটাই কর্কশতা মেটাতে গিয়ে ভারত-শিল্পকে আধ্যাত্মিক বলে সুখানুভব করার চেষ্টাও করছেন দেখি কেউ-কেউ। ভারত-শিল্প সত্যিই যদি ছেঁড়া-পকেট হয় তো তাকে উল্টে ছেঁড়া বালিশের খোল বলে প্রমাণ করে মজা করা যেতে পারে কিন্তু ছেঁড়া বটে—এটা তো ঢাকা পড়ে না!

হীরকের প্রভা জ্বলজ্বল করছে, চন্দ্রকান্তমণির প্রভাব কুয়াশার মধ্যে টলটল করছে—বাজারে দিলে একটাকে বহুমূল্য অন্যটাকে স্বল্পমূল্য বলে। অরূপের যে পক্ষপাতী সে চন্দ্রকান্তমণিকে প্রাধান্য দিয়ে বলবে, এ যে অরূপের ধ্যান ধরে আছে—অতি ভালো জিনিশ, রূপের যে পক্ষপাতী সে হীরেকে হাতে তুলে বলবে, এর রূপের রঙের সীমা নেই, এর তুল্য এটা নয়। অপক্ষপাতী শিল্পী মণিদুটোকেই একসূত্রে গেঁথে বলবে, এরা দুটি মাণিকজোড়—হীরকের সুপরিস্ফুট জ্যোতির মধ্যে হীরের মতো পলতোলা বা বাহ্য রূপ তলিয়ে আছে, চন্দ্রকান্তমণির নিটোল সুবিম্বিত রূপের মধ্যে তার জ্যোতি তলিয়ে আছে। অনুপমের মধ্যে রূপ, রূপের মধ্যে অনুপম, অনির্দিষ্ট জ্যোতির অবগুণ্ঠনে সুনির্দিষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট রূপের গর্ভে অনির্দিষ্ট জ্যোতি, রসিকের কাছে দুয়ের উচ্চ-নীচ ভেদ কোথায়? ভিন্ন দেখে তারাই যারা রূপের র'ও দেখে না, কেবল 'রূপ-অরূপ রূপ-অরূপ' করে মালা জপে।

ঘরের দেওয়ালে-ঘেরা জীবনে যে-মাধুর্য আকাশের তারা-খচিত নীল ঘেরা-টোপে-ঢাকা জীবনের মাধুর্যের চেয়ে তা কম জিনিশ এটা বলা চলে না। এটা এতখানি ওটা ততখানি এও বলা নিরাপদ নয়, অনেক সময়ে ঠকতে হয়—জীবনের স্বাদ বিচিত্রতা হারায়। তেমনি রূপের এক প্রস্থ অরূপের আর-এক প্রস্থ ভাগ করে নিয়ে যারা দুটো দেখে,

তারা রসের এক নদীর চমৎকারী রূপ দেখতে পায় না, নদীর থেকে সরিয়ে-আনা দুটো খালের কিনারায় বসতি বেঁধে বসে যায়।

মাটির প্রদীপখানি মাটির ঘরের কোণে; আকাশের তারা চেয়ে প্রদীপের দিকে, প্রদীপ চেয়ে তারার দিকে—এই দুই চাওয়ার সূত্রটি কেটে দেখতে চায় যে, সে পায় ছেঁড়া মালার এ-আধখানা নয়তো ও-আধখানা। রসের ও রূপের পূর্ণ পাত্র পড়ে না তার হাতে।

পর্বতে বসে দেখতেম এক পাহাড় কুয়াশাতে ঝাপসা, আর-এক পাহাড় আকাশপটে সুস্পষ্ট টানা—কিন্তু দুয়েরই থেকে এক ঝরনা ঝরছে একই ছন্দে সুরে। তেমনি ইট পাথর ও কাঠের পাহাড় নগরের কোথায়ও রস নেই এটা মনে করলে অট্টালিকার অরণ্য আর পাহাড়ের ঝাউবন দুই-ই রহস্যময় ছবি দেখায়। পাহাড়ের বসতি আর আমার ঘরের পাশে সিংহির বাগানের বস্তি—রূপ হিশেবে কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বলা শক্ত, রঙ আর সুর পেয়ে দুটোই মধুর লাগে চোখে। ঘরের মধ্যে এতটুকু টিপ-পরা কালো মেয়েটি আর পর্বতের উপরকার অরণ্যের কোলে সন্ধ্যাতারা—দুজনেই সমান রূপবতী, দুজনেই প্রত্যক্ষ রূপ নিয়ে মধুর, অপ্রত্যক্ষের ইঙ্গিত না দিয়েও মধুর—এটা অস্বীকার করা তো যায় না। আবার পাটের শাড়ির মধ্যে ঘোমটা-টানা শহুরে নববধূ এবং পূর্ণ চন্দ্রিমার আলোর ঘোমটা-টানা পাহাড়ের কোলে চা-গাছের নতুন ফোটা ফুলের আড়ালে না-দেখা ঝরনা—দুজনের নূপুরধ্বনি মধুর হয়ে শুধু কানে বাজে না, প্রাণেও যে বাজে।

নগর তার এবং নগরবাসীর স্বভাবের অনুরূপ রূপটি যখন দিলে তখন সেটি স্বাভাবিক ছবি হল। স্বভাবদৃশ্য কথার অর্থই থাকে না যদি আর্টিস্টের নিজের ভাব দৃশ্যের মধ্যে অনুরূপ রূপটি লাভ করেছে—এটা ছবি প্রমাণ না করে। ভারতবাসীর পক্ষে যেটা স্বাভাবিক, লন্ডনবাসীর পক্ষে তা স্বাভাবিক মোটেই নয়, কিন্তু তাই বলে ভারতীয় ছবি অস্বাভাবিক রূপ সমস্ত নিয়ে কারবার করলে এটা বলা বিষম ভুল। বানরের ডানা স্বাভাবিক নয়, বাদুড়ের ডানা স্বাভাবিক—এ তর্ক করে বানরকে বাদুড়ের চেয়ে কম স্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রূপ যখন স্বভাবের নিয়ম ধরে স্ফুট অস্ফুট দুই সীমা মেনে চলল, সুর যেখানে স্বাভাবিক, চলা বলা সমস্তই যেখানে স্বাভাবিক ছন্দ পেলে সেখানেই মাধুরী ফুটল, এর বিপরীতে বিশ্রী কাণ্ড হল। আমার পক্ষে ভারত-শিল্প স্বাভাবিক, ইংরেজের পক্ষে নয়। নূপুর পায়ের ছন্দে মধুর বাজে, পোষা কুকুর যখন সেটাকে নিয়ে টানাহেঁচড়া করে তখন বিরক্তি উৎপাদন ছাড়া আর কিছু করে না।

আলোককে অন্ধকারের সঙ্গে পৃথক করে দেখা চলে না, প্রত্যক্ষ রূপকে অপ্রত্যক্ষ রূপের সঙ্গে পৃথক করেও দেখা চলে না। একের সঙ্গে অন্যের ঠিক যোগাযোগ না-করতে পারলে ছবিও হয় না, শাদা পাথরে কালো পাথরে শাদা কাগজে কালো কাগজে যারা কিছু রচনা করে তারাই জানে যে এই যোগাযোগের কৌশলই হল রূপদক্ষের সাধনার বিষয়।

পর্বতে-পর্বতে অপরিসীম রূপের সামনে বসে মন একটি দিন উঠেছিল রূপের পর্দার ওপারের না-দেখা আর্টিস্টের একটু পরিচয় পেতে। রূপকে প্রশ্ন করলেম, সে বললে, আর্টিস্টকে ভুলিয়ে দেওয়ার জন্যেই তো আমি আছি, আমাকে এ প্রশ্ন করা মিছে, আমি রূপবান রূপের মাধুরী আগলে রেখেছি, আমার আড়ালে আমার মধু। বনফুলের বুকের মধুবিন্দু তাকে প্রশ্ন করি, সে বলে, আমি কমলা ফুলের মধু, আমার উপরে ফুলের প্রতিবিম্ব, আমার ভিতরে ফুলের পরিমল!

মন অধীর হয়ে বলে, ফুলের মধ্যে যে মধু ধরলে তার খবর পাই কোথা? ভ্রমর এসে বললে, তুমি মধু নাও তো নাও, নয় আমার পথ ছাড়ো। নিরুপায় হয়ে আমি নিজেকে

তখন প্রশ্ন করি, মন উত্তর দেয়—এই-যে বসে-বসে নানারূপ ছবিতে নানা রস ধরছ, এগুলো মিথ্যা মায়া বলে যদি কোনো লোক ছিঁড়ে ফেলে তোমার সঙ্গে মিলতে আসে এবং তোমার একটা ফটো তুলতে চায় তুমি তাকে কী ভাবো?

কবির সঙ্গে তাঁর রচনা দিয়ে পরিচয় হল না, তাঁর নামটা লেখা ফোটোগ্রাফ দিয়ে পরিচয় হল—এ যেন একের লেখা পর্বত-বর্ণনা কিংবা রূপ-অরূপের সমস্যা দিয়ে মস্ত একটা বক্তৃতা নিয়ে হিমালয়ে দেখার কাজ হয়ে গেল বলে মনে করা।

ভূগোলের এক-একটা পাতায় কত নদ নদী পাহাড় পর্বত সেইগুলো পড়েই তো পৃথিবী দেখার কাজ হয়ে যেতে পারত। 'পরলোক-ভ্রমণ' বলে একখানা বই আছে তাতে সেখানে পরিক্রম করবার আটঘাটের বর্ণন এমনকি সেখানকার অধিকারী আলোর পর্দা খাটিয়ে তার মধ্যে ঘুমোচ্ছেন এও লেখা আছে। এই ভূগোল এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত দুখানা মুখস্থ করে দক্ষতা পাওয়া গেল বলে কেউ কি ভুল করে?

পাহাড়ে যাবার সময় উড়ো-সাপের মতো রেল যখন এক পাহাড় থেকে আর-এক পাহাড়ে, এক মেঘ থেকে আর-এক মেঘে আমাদের নিয়ে চলল সেই সময় পাশের একটা ছোটছেলেকে বললেম, পাহাড় কীরকম ভাবতিস? তার কথার পুঁজি কম, সে শুধু পর্বতের দিকে হাঁ করে চেয়ে বললে, পাহাড় যে এরকম তা একেবারেই মনে হয় না। ছেলের মনের পাহাড়ের রূপটা ছিল একটা ঢিবি যার এপার-ওপার দৌড়ে ওঠানামা যায়, তাতে গাছ ছিল না ঝরনা ছিল না পাথর ছিল না—রূপের মরুভূমির মাঝে বালির স্তূপ, কিংবা একটা বড় গাছের গুঁড়ি—তার বেশি একটুও নয়; ছেলের মনে আগের-দেখা পাহাড় এবং পরের-দেখা পাহাড়ে যে-বিষম তফাত, ঠিক ততটাই তফাত চোখের-দেখা থেকে বিচ্ছিন্ন অরূপ আর প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ হচ্ছে যে-রূপ তার মধ্যে। দাঁড়িপাল্লার বামদিকে রাখো লিখিয়ের কালি কলম কাগজ রঙ তুলি, বীণা-বাঁশি এবং রূপ-অরূপের জল্পনার ভার, আর দক্ষিণে চাপাও শুধু তার চোখে-দেখা রূপের মাধুরী-বিন্দুটি—জল্পনার বাটখারা ক্রমেই উঠবে আকাশে, চোখে-দেখার বাটখারা ক্রমেই নামবে মাটির দিকে। ভারত-শিল্পে যে-সকল দেবদেবী মূর্তি দেখি, যেসব ছবি দেখি, তার সবটাই ধ্যান এবং আধ্যাত্মিকতা এবং অরূপ—এটা আমি একসময়ে কতবার বলেছি তা মনে নেই, কিন্তু তাই বলে সেই ভুল আঁকড়ে ধরে থাকা চিরকাল তো সম্ভব হল না—রূপ-যে চোখ ভুলিয়ে নিলে মন মাতিয়ে দিলে এ-কথা তো আজ বলতে হচ্ছে।

পাহাড়-পর্বত নদী-নির্ঝর অরণ্য-আকাশ রূপের সত্তায় বলীয়ান, টোলের পণ্ডিতের রূপ-অরূপের তর্ক কিংবা বিশেষ কোনো ধর্মের ও জাতির আধ্যাত্মিকতা প্রমাণ করতে তারা নেই। বরফের চূড়া দেবীপুরাণের একটা শ্লোকের জন্য বড়, নিরুপম নীল আকাশ কৃষ্ণলীলার পদাবলীর ছাঁদ পেয়ে যে বড়—তা তো মনে হয় না! নানা রূপক উপমা অতিক্রম করে বিদ্যমান এই যেসব রূপ রঙ এদের সামনে দাঁড়িয়ে অস্বীকার করা চলে না যে, রূপ নিজেতে নিজে স্বপ্রতিষ্ঠিত।

সেই স্বপ্রতিষ্ঠিত রূপের কথাই যেমন হিমালয়ের শিখরে-শিখরে তেমনি সমস্ত ভারত-শিল্পেরও প্রত্যেক অঙ্গে দীপ্তি পাচ্ছে। আমাদের ঋষি চিত্রের ষড়ঙ্গ দিলেন, তার প্রথমেই লেখা হল 'রূপভেদাঃ'—বিচিত্র রূপের কথা নিরুপম রূপের কথা। অরূপের কথা সে দর্শনশাস্ত্রের কথা ধর্মশাস্ত্রের কথা ধর্মশাস্ত্রের বিষয়, স্বপ্রতিষ্ঠিত নিরুপম রূপের কথা হল চিত্রের এবং মূর্তির বিষয়।

সুনির্দিষ্ট রূপ, সুব্যক্ত সুর এই নিয়ে প্রকৃতি চারিদিকে ঘিরে রইল মানুষকে। অনির্দিষ্ট সেও একটি রূপ, যাকে বলি অব্যক্ত তাও একটি সুব্যক্ত সুর নিয়ে বর্তমান হল। এই-যে পর্বতের ছবি কুয়াশার মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে আবার আলোর মধ্যে জেগে উঠছে—এ দুটি ছবিই রূপের সুনির্দিষ্ট সীমা কোনোদিন অতিক্রম করে চলছে না। কুয়াশা এখানে রূপ আবরণ করছে না, একটা রূপ থেকে আর-একটা রূপ ফোটাচ্ছে—পাথরের কড়ি-সুর মেঘের কোমল থেকে কোমলতর সুরে মিলে আর-একটা নতুন সুরে পরিণত হতে চলেছে, রূপ রঙ এদের বিচ্ছেদ ফাঁক টেনে দিচ্ছে না, প্রলয় দিচ্ছে না টেনে চোখের এবং মনের উপরে মাধুর্যহীন নীরস নিকষ-প্রলেপ।

রূপকে নষ্ট করে অরূপের স্বাদ দেওয়া রূপদক্ষের কাজ নয়। পাথরের মূর্তি রঙ বাদ দিলে অথচ রঙের স্বপ্ন ধরে রইল, সেই মূর্তিকে পুড়িয়ে এবং গুঁড়িয়ে চূর্ণ করো তাতে মূর্তিতে যা ছিল তা নেই। তেমনি সুন্দর পটখানি চুনের প্রলেপ দিয়ে শাদা করে দিই, কোথায় যায় ছবির রূপ কোথায় বা রঙ, কিন্তু সুন্দর দৃশ্যের উপরে রাত্রির কুয়াশা পড়ুক সে এক নিরুপম রূপ পায় দৃশ্যটি।

ছবির গায়ের চুনের প্রলেপ, রূপের রহস্য তাতে নাই। পর্বত ঢেকে কুয়াশার প্রলেপ—সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত তার দিকে চেয়ে-চেয়ে চোখ এবং মন বসে থাকত, কিন্তু কোনোদিন দেখলে না সে রূপ নেই রঙ নেই, কেবলি দেখলে রঙ-ভোলানো রঙ, রূপ-ভোলানো রূপ এসে মিলল রূপের পাশে রঙের পাশে! বুদ্‌বুদ ফেটে গেল, রূপ মিলিয়ে গেল রঙ মুছে গেল—এ ঘটনা নিয়ে গভীর তত্ত্বকথা লেখা চলল, আধ্যাত্মিক দেহতত্ত্বের কবিতা ও গান লেখা চলল, কিন্তু ছবি লেখা চলল না। ক্ষণভঙ্গুর রূপ মিলোতে চাচ্ছে, রূপ-হারানো অকূলের কিনারায় রূপ রঙে ভরে উঠে বুকের বেদনায় কাঁপছে—এটা ছবির বিষয় হল।

মানুষ যদি কেবল চোখ নিয়েই চারিদিকের রূপসমস্ত দেখত তবে ফটোগ্রাফের ক্যামেরা যেভাবে দেখে সেইভাবে তুলত কেবলি রূপের ছাপ—ছবি নয়—শুধু দেখত রূপ আর রূপ। জলের উপর তেল যেভাবে ভাসে দৃষ্টি সেইভাবে পিছনে চলত, দৃষ্টি রূপের গভীরতা অনুভব করতেই পারত না মানুষ যদি তার চোখের সঙ্গে মন নিয়ে না-দেখত চেয়ে। চোখের দেখা রূপের বাইরে দৃষ্টির স্পর্শ দিয়ে ক্ষান্ত হয়, মনের দেখা রূপের মধ্যে যে-রস তাকে পেতে চলে চোখ মন দুই মিলে, তবে দেখায় রূপের মাধুরীখানি।

খুব প্রাচীনকালে মানুষ যখন গুহাবাস করছে, তখন তারা কী দেখছে এবং কেমনভাবে দেখছে তার ছবি এখনো গুহার দেওয়ালে এবং ছাদে লেখা রয়েছে। এই ছবিগুলোর মধ্যে একপ্রস্থ ছবি দেখি যেগুলো শুধু চোখে-দেখা রূপের নমুনা—হরিণ বসে আছে, গরু চরছে, মানুষ লড়ছে, সবগুলোই কিন্তু চক্ষুহীন; একটাতেও চোখ দেয়নি চিত্রকর, শুধু রূপ—দেওয়ালের গায়ে ছায়া পড়লে যা দেখায় তাই (SPEARING, Childhood of Art. P. 114. Fig, 74.)। আর-এক প্রস্থ ছবি চোখের সঙ্গে মন জুড়ে দেখার নমুনা—হরিণ চেয়ে আছে সামনের বনের দিকে, হরিণ হরিণীর সঙ্গে যাচ্ছে আর ফিরে-ফিরে দেখছে—এই দুই ছবিতে চোখ এঁকেছে যত্নে মানুষ, শুধু হরিণের ছায়াচিত্র নয়, তার রূপ এবং ভাব এক হয়ে পুরো ছবি হয়েছে তখন (Childhood of Art. P. 104-108, Figs. 65 and 70.)।

অনেকে দেখি শুনতে বেশ পায় অথচ সুর-বিষয়ে একেবারে বধির; তেমনি রূপ দেখছে অথচ রূপ দেখছে না এমন লোক বিস্তর। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ দুয়ের সমস্যা শাস্ত্রকার যেভাবে সিমাংসা করেছেন তার জটিলতার মধ্যে যাবার সাধ্য নেই।

শিল্পের দিক দিয়ে এর একটা মীমাংসা উপস্থিত হবার চেষ্টা হয়েছিল। আমরা দেখতে পাই, সেটা থেকে ব্যাপারটা হয়তো আমরা সহজে বুঝব, চীনদেশে 'তাওইস্ট' সাধক—শিল্পের দিক দিয়ে অপ্রত্যক্ষ সাধনার অনেকগুলো উপায় এঁদের ছবি থেকে পাই। তাঁদের প্রধান কথা হল এই যে, পটের ধৌত অংশ (শাদা জমি) এবং লাঞ্ছিত ও রঞ্জিত অংশের যথাযথ হিশেবের উপরে ছবির ভাবের বিস্তৃতি নির্ভর করছে; তাঁরা বলেন যে, ঘর সাজানোর বেলায় নানারূপ জিনিশ দিয়ে ঘর ভর্তি করা মানে ঘরের প্রসার ও সঙ্গে-সঙ্গে মনের এবং দৃষ্টির প্রসার নষ্ট করা। এই হল তাঁদের মত এবং এইভাবে অপ্রত্যক্ষের স্বাদ শিল্পকাজে পৌঁছে দেবার উপদেশ তাঁরা দেন।

আমাদের দেশের শিল্পসাধন এর উল্টোদিক দিয়ে রূপের বিস্তারের পথনির্দেশ করলেন—"দাক্ষিণাত্যের মন্দির ধারণাতীত সংখ্যাতীতরূপে ভরে উঠে একটা বিরাট বিপুলতা এবং অনির্দিষ্টতায় গিয়ে মিলল, লক্ষ্য হারাল গিয়ে দুর্লক্ষ্যতার মধ্যে, রূপ থেকেও রইল না!" চীনের ছবিতে ছবিতে যেটি শাদা অংশ সেটি রূপ না-থেকেও রূপে ভর্তি হল, আমাদের মন্দিরের চূড়া সেটি রূপ থেকেও রূপ না-থাকা দিয়ে পরিপূর্ণ হল। জয়পুরী আঁকা ছবি সেখানে কড়া রঙের তলায় কড়া রেখা তলিয়ে দিয়ে শিল্পী অপ্রত্যক্ষের সমস্যা মিটিয়েছে।

মোগল আমলের আঁকা ছবি কোমল থেকে অতিকোমল রেখাকে প্রায় দুর্নিরীক্ষ্যতার কাছাকাছি টেনে নিয়ে তার উপরে রঙিন ওড়নার আড়াল টেনে এই সমস্যা মিটিয়েছে।

আফ্রিকার শিল্প সেখানে রেখার রঙের সরল টান অদ্ভুত কৌশলে কাটা, সমস্ত রূপের দুনির্দিষ্টতা অরূপের দিকেও যায় না, সেখানে শুধু রূপ আর রূপ, কিন্তু সেখানেও চোখের দেখাকে অতিক্রম করছেন শিল্পী ভীমকান্ত কল্পনার পথ ধরে।

পাহাড়ের ঘরে বসে থাকতেম, সামনের খেলা জানালায় দুটি পাহাড় একখানি আকাশপটে-ধরা ছবির মতো ধরা থাকত, কিন্তু সেইটুকু পলে-পলে নতুন রূপ নতুন ভাবে ভরে উঠতে দেখতেম। পাহাড়পথে চলতেম, দেখতেম—একস্থানে পথ শেষ হয়েছে অপার রূপের কুলে, একস্থানে থেমেছে মনভোলানো কুয়াশায়-ঢাকা শূন্যের পাশে, একস্থানে বা পথ আপনাকে হারিয়েছে গভীর অরণ্যে আলো-ছায়ায় নিবিড় রহস্যের অন্তরালে। ঝরনা রূপ ধরে কোথাও এসে পড়ত কাছে, ঝরনা রূপ হারিয়ে কোথাও শোনাত সুরটুকু—এইভাবে গেছে দিনরাত হৃদয় এবং দৃষ্টি দুজনে মিলে একদিনও এ-কথা ভাবতে পারেনি যে রূপ নেই রহস্য নেই, অরূপ আছে; দিনরাতের মধ্যে রূপ ও রহস্য এরা হরগৌরী যুগলমূর্তির মতো বিরাজ কচ্ছে—এই কথাই বলছে বারবার। আনন্দে পূর্ণ পাত্র পেয়ে চোখ এবং মন কবির ভাষায় বলেছে, ছবির ভাষায় বলেছে—

আমার নয়ন ভুলানো এলে!
আমি কী হেরিলাম হৃদয় মেলে!
শিউলিতলার পাশে পাশে,
ঝরা ফুলের রাশে রাশে,
শিশির ভেজা ঘাসে ঘাসে
　অরুণ রাঙা চরণ ফেলে
　নয়ন ভুলানো এলে!

আলো-ছায়ার আঁচলখানি
　লুটিয়ে পড়ে বনে বনে,

ফুলগুলি ঐ মুখে চেয়ে
কী কথা কয় মনে মনে।
তোমায় মোরা করব বরণ,
মুখের ঢাকা করব হরণ,
ঐটুকু ঐ মেঘাবরণ
দু-হাত দিয়ে ফেল ঠেলে!
নয়ন ভুলানো এলে!

বনদেবীর দ্বারে দ্বারে
শুনি গভীর শঙ্খধ্বনি,
আকাশবীণার তারে তারে
জাগে তোমার আগমনী।
কোথায় সোনার নূপুর বাজে,
বুঝি আমার হিয়ার মাঝে
সকল ভাবে সকল কাজে
পাষাণ-গলা সুধা ঢেলে
নয়ন ভুলানো এলে!

পর্বতের পাষাণের কামনা পাষাণ-গলানো রূপে ঝরনা হয়ে রইল—সে এক রূপ সে এক ভাব সে এক সুর দিলে, মরুভূমির বুক জড়িয়ে ঝরনা নদীরূপে বইল—সে আর-এক রূপ আর-এক ভাব আর-এক সুর দিলে। নদী সমুদ্র হয়ে কূল হারাল, নীল ছন্দে দুলতে থাকল—সে এক,—সমুদ্র ঘন মেঘের দিক-ভোলানো রূপ ধরে নীল পর্বতের কোলে এসে লুকোল বৃষ্টি জলের ঝরনা বইয়ে,—সে অন্য। এই এক থেকে অন্যে, অন্য থেকে আর-একে—এদেরই ধরে-ধরে মন-ভোলানো পাষাণ-গলানো কামনাসূত্রে গেঁথে-গেঁথে রচনা করলেন যিনি রূপদক্ষ তিনি অদৃষ্টপূর্ণ মনোরম রূপের মালাগাছি।

সৌন্দর্যের সন্ধান

সুন্দরের সঙ্গে তাবৎ জীবেরই মনে-ধরার সম্পর্ক, আর অসুন্দরের সঙ্গে হল মনে-না-ধরার ঝগড়া। ইমারতে-ঘেরা বন্দিশালার মতো এই-যে শহরের মধ্যে এখানে-ওখানে একটুখানি বাগান, অনেকখানিই যার মরা এবং শ্রীহীন, এদের পাখি প্রজাপতির মনে ধরেছে তবেই-না এরা এইসব বাগানে বাসা বেঁধে এই ধুলোমাখা রোদে সকাল-সন্ধ্যে ডানা মেলে সুরে ছন্দে ভরে তুলছে শহরের বুকের আবদ্ধ অফুরন্ত স্থানটুকু! আর এইসব বাগানের ধারেই রাস্তায় বসে খেলছে ছেলেরা—শিশুপ্রাণ তাদের মনে ধরেছে বাগানের ফুলকে ছেড়ে রাস্তার ধুলো মাটি, তাই তো খেলছে ওরা ধুলোকে নিয়ে ধুলোখেলা! রথের দিনে রথো-সামগ্রী—শোলার ফুল পাতার বাঁশি—তার সুর আর রঙ আর পরিমল ছড়িয়ে পড়েছে বাদলার দিনে—রথতলার আর খেলাঘরের ছেলে বুড়োর মেলায়, তাই-না আজ দেখছি নিজেদের ঘর সাজাচ্ছে মানুষ শোলার ফুলে মাটির খেলনায়! তেমনি সে আমার নিজের কোণটি, দেওয়ালের ফাঁকে ভাঙা কাচের মতো একখণ্ড আকাশ—ময়লা ঝাপসা প্রাচীরে-ঘেরা চারটিখানি ঘাস চোরকাঁটা আর দোপাটি-ফুলের খেলাঘর, সবই মনে ধরেছে আমার, তাই-না কোণের দিকে মন থেকে-থেকে দৌড় দিচ্ছে, চোরকাঁটার বনে লুকোচুরি খেলছে, নয়তো দোপাটি-ফুলের রঙের ছাপ নিয়ে লিখছে ছবি, স্বপন দেখছে রকম-রকম, আর থেকে-থেকে ঠিক নাকের সামনে মাড়োয়ারিদের আকাশ-বাতাস-আড়াল-করা চৌতলা পাঁচতলা বাড়িগুলোর সঙ্গে আড়ি দিয়ে বলে চলেছে বিশ্রী বিশ্রী বিশ্রী! মাড়োয়ারি গৃহস্থরা কিন্তু ওদের পায়রার খোপগুলোকে সুন্দর বাসা বলেই বোধ করছে এবং তাদের নাকের সামনে আমাদের সেকেলে বাড়ি আর ভাঙাচোরা বাগানকে অসুন্দর বলছে! কাজেই বলতে হবে আয়নাতে যেমন নিজের-নিজের চেহারা তেমনি মনের দর্পণেও আমরা প্রত্যেকে নিজের-নিজের মনোমতোকে সুন্দরই দেখি। কারু কাছ থেকে ধার-করা আয়না এনে যে আমরা সুন্দরকে দেখতে পাব তার উপায় নেই। সুন্দরকে ধরবার জন্যে নানা মুনি নানা মতো আরশি আমাদের জন্যে সৃজন করে গেছেন, সেগুলো দিয়ে সুন্দরকে দেখার যদি একটুও সুবিধে হত তো মানুষ কোন্ কালে এইসব আয়নার কাচ গালিয়ে মস্ত একটা আতশী কাচের চশমা বানিয়ে চোখে পরে বসে থাকত, সুন্দরের খোঁজে কেউ চলত না; কিন্তু সুন্দরকে নিয়ে আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ঘরকন্না তাই সেখানে অন্যের মনোমতোকে নিয়ে থাকাই চলে না, খুঁজে পেতে আনতে হয় নিজের মনোমতোটি।

জীবের মনস্তত্ত্ব যেমন জটিল যেমন অপার, সুন্দরও তেমনি বিচিত্র তেমনি অপরিমেয়। কেউ কাজকে দেখছে সুন্দর, সে দিনরাত কাজের ধান্ধায় ছুটছে; কেউ দেখছে অকাজকে সুন্দর, সে সেইদিকেই চলেছে; কিন্তু মনে রয়েছে দুজনেরই সুন্দর কাজ অথবা সুন্দর রকমের অকাজ! ধনী খুঁজে ফিরছে তার সর্বস্ব আগলাবার সুন্দর চাবিকাঠি, বিশ্রী তালাচাবি কেউ খোঁজে না—আর দেখ চোর সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সন্ধি কাটবার সুন্দর সিঁধ! ভক্ত খুঁজছেন ভক্তিকে, শাক্ত খুঁজছেন শক্তিকে আর নর খোঁজে

গাড়িজুড়ি, বি.এ. পাসের পরেই বিয়েতে সোনার ঘড়ি এবং তার কিছু পরেই চাকরি এবং এমন সুন্দর একটি বাসাবাড়ি যেখানে সব জিনিশ সুন্দর করে উপভোগ করা যায়। হা-হুতাশ কচ্ছেন কবি কল্পনালক্ষ্মীর জন্যে এবং ছবি-লিখিয়ের হা-হুতাশ হচ্ছে কলালক্ষ্মীর জন্যে, ধরতে গেলে সব হা-হুতাশ যা চাই সেটা সুন্দরভাবে পাই এইজন্যে, অসুন্দরের জন্যে একেবারেই নয়। সুন্দরের রূপ ও তার লক্ষণাদি সম্বন্ধে জনে-জনে মতভেদ কিন্তু সুন্দরের আকর্ষণ-যে প্রকাণ্ড আকর্ষণ এবং তা আমাদের প্রত্যেকের জীবনের সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়ানো সে-বিষয়ে দুই মত নেই।

যেভাবেই হোক যা-কিছু বা যারই সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি তার দুটো দিক আছে—একটা মনে-ধরার দিক যেটাকে বলা যায় বস্তুর ও ভাবের সুন্দর দিক, আর-একটা মনে-না-ধরার দিক যেটাকে বলা চলে অসুন্দর দিক, আমাদের জনে-জনে মনেরও ঐ দুরকম দৃষ্টি—যাকে বলা যায় শুভ আর অশুভ বা সু আর কুদৃষ্টি। কাজেই দেখি, যে দেখছে তার মন আর যাকে দেখছে তার মন—এই দুই মন ভিতরে-ভিতরে মিলল তো সুন্দরের স্বাদ পাওয়া গেল, না হলেই গোল। রাধিকা কৃষ্ণকে সুরূপ শ্যামসুন্দর দেখেছিলেন, তারপর অনঙ্গ-ভীমদেব এবং তারপর থেকে আমাদের সবার কাছে রূপকসুন্দরভাবে কৃষ্ণ এলেন, এই দুই মূর্তিই আমাদের শিল্পে ধরা হয়েছে, এখন কোন্ সমালোচকের সৌন্দর্য-সমালোচনার উপর নির্ভর করে এই দুই মূর্তির বিচার করব? আ-কা-শ এই তিনটে অক্ষরে আকাশ-জ্ঞানটাই রূপকের দল বলবে ভালো, কিন্তু রূপের সেবক তারা বলবে 'নব-নীরদ-শ্যাম' যা দেখে চোখ ভুলল মন জুরল, যার মোহন ছায়া তমাল গাছে যমুনার জলে এসে পড়ল সেই সুন্দর।

সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে শেষ কথা যদি কেউ বলতে পারে তো আমাদের নিজের-নিজের মন। পণ্ডিতের কাজই হচ্ছে বিচার করা এবং বিচার করে দেখতে হলেই বিষয়কে বিশ্লেষ করে দেখতে হয়, সুতরাং সুন্দরকেও নানা মুনি নানাভাবে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, তার ফলে তিল-তিল সৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমা গড়ে তোলবার একটা পরীক্ষা আমাদের দেশে এবং গ্রিসে হয়ে গেছে, কিন্তু মানুষের মন সেই প্রথাকে সুন্দর বলে স্বীকার করেনি এবং সেই প্রথায় গড়া মূর্তিকেই সৌন্দর্যসৃষ্টির শেষ বলেও গ্রাহ্য করেনি। বিশেষ-বিশেষ আর্টের পক্ষপাতী পণ্ডিতেরা ছাড়া কোনো আর্টিস্ট বলেনি অন্য সুন্দর নেই, ঐটেই সুন্দর। আমাদের দেশ যখন বললে—সুন্দর গড়ো কিন্তু সুন্দর মানুষ গোড়ো না; সুন্দর করে দেবমূর্তি গড়ো সেই ভালো; ঠিক সেই সময় গ্রিস বললে—না, মানুষকে করে তোলো সুন্দর দেবতার প্রায় কিংবা দেবতাকে করে তোলো প্রায়-মানুষ! আবার চীন বললে—খবরদার, দেবভাবাপন্ন মানুষকে গড়ো তো দৈহিক এবং ঐহিক সৌন্দর্যকে একটুও প্রশ্রয় দিও না চিত্রে বা মূর্তিতে। নিগ্রোদের আর্ট, যার আদর এখন ইউরোপের প্রত্যেক আর্টিস্ট করছে তার মধ্যে আশ্চর্য রঙ-রেখার খেলা এবং ভাস্কর্য দিয়ে আমরা যাকে বলি বেঢপ বেয়াড়া তাকেই সুন্দরভাবে দেখানো হচ্ছে।

সুতরাং সুন্দরের স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র আদর্শ আর্টিস্টের নিজের-নিজের মনে ছাড়া বাইরে নেই, কোনোকালে ছিল না, কোনোকালে থাকবেও না এটা একেবারে নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে। সুন্দর যদি খিচুড়ি হত তবে এতদিনে সৌন্দর্যের তিল ও তাল মিলিয়ে কোনো-এক বেরসিক পরম সুন্দর করে সেটা প্রস্তুত করে যেত তথাকথিত কলারসিকদের জন্য, কিন্তু একমাত্র যাঁকে মানুষ বললে 'রসো বৈ সঃ' তিনিও সুন্দরের পরিপূর্ণ আদর্শ জনে-জনে মনে-মনে ছাড়া আপনার সৃষ্টিতে একত্র ও সম্পূর্ণভাবে কোথাও রাখেননি। তাঁর সৃষ্টি, এটি

সুন্দর অসুন্দর দুই-ই; এবং সবদিক দিয়ে অপূর্ণও নয় পরিপূর্ণও নয় এই কথাই তিনি স্পষ্ট করে যে জানতে চায় তাকেই জানিয়েছেন। শান্তিতে-অশান্তিতে সুখে-দুঃখে সুন্দরে-অসুন্দরে মিলিয়ে হল ছোট এই নীড়, তারি মধ্যে এসে মানুষের জীবনকণা পরম সুন্দরের আলো পেয়ে ক্ষণিকের শিশিরবিন্দুর মতো নতুন-নতুন সুন্দর প্রভা সুন্দর স্বপ্ন রচনা করে চলল। এই হল প্রথম শিল্পীর মানস-কল্পনা ও এই বিশ্বরচনার নিয়ম, এ নিয়ম অতিক্রম করে কোনোকিছুতে পরিপূর্ণতাকে প্রত্যক্ষ রূপ দিতে পারে এমন আর্টও নেই আর্টিস্টও নেই। যা বিশ্বের মানুষের মনে বিচিত্র পদার্থের মধ্যদিয়ে বিচিত্র হয়ে ফুটতে চাচ্ছে সেই পরম সুন্দরের স্পৃহা জেগেই রইল, মিটল না। যদি পরম সুন্দরের প্রত্যক্ষ উপমান পেয়ে সত্যই কোনোদিন মিটে যায় মানুষের এই স্পৃহা, তবে ফুলের ফুটে ওঠার, নদীর ভরে ওঠার, পাতার ঘন-সবুজ হয়ে ওঠার, আগুনের জ্বলে ওঠার চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে মানুষেরও ছবি-আঁকা মূর্তি-গড়া কবিতা-লেখা গান-গাওয়া ইত্যাদির স্পৃহা আর থাকে না। চাঁদ একটুখানি চাঁচনী থেকে আরম্ভ করে পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠবার দিকে গেলেও যেমন শেষে একটুখানি অপরিণতি তার গোলটার মধ্যে থেকেই যায়, তেমনি মানুষের আর্টও কোথাও কখনো পূর্ণ সুন্দর হয়ে ওঠে না। মানুষ জানে সে নিজে অপূর্ণ, তাই পরিপূর্ণতার দিকে যাওয়ার ইচ্ছা তার এতখানি। গ্রিস ভারত চীন ঈজিপ্ট সবাই দেখি পরম সুন্দরের দিকে চলেছে, কিন্তু সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা কেউ পায়নি, কেবল পেতে চাওয়ার দিকেই চলেছে। আজ যেখানে মনে হল আর্ট দিয়ে বুঝি যতটা সুন্দর হতে পারে তাই হল, কাল দেখি সেইখানেই এক শিল্পী দাঁড়িয়ে বলছে, হয়নি, আরো এগোতে হবে কিংবা পিছিয়ে অন্য পন্থা ধরতে হবে। পরম সুন্দরের দিকে মানুষের মন ও সঙ্গে-সঙ্গে তার আর্টের গতি ঠিক এইভাবেই চলেছে—গতি থেকে গতিতে পৌঁছোচ্ছে আর্ট, এবং একটা গতি আর-একটা গতি সৃষ্টি করছে, ঢেউ উঠল ঠেলে, মনে করলে বুঝি চরম উন্নতিকে পেয়েছি অমনি আর- এক ঢেউ তাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, চলো, আরো বাকি আছে। এইভাবে সামনে আশেপাশে নানা দিক থেকে পরম সুন্দরের টান মানুষের মনকে টানছে বিচিত্র ছন্দে বিচিত্রতার মধ্যদিয়ে, তাই মানুষের সৌন্দর্যের অনুভূতি তার আর্ট দিয়ে এমন বিচিত্র রূপ ধরে আসছে—চিরযৌবনের দেশে ফুল ফুটেই চলেছে নতুন-নতুন।

মানুষ আয়নায় নিজের প্রতিবিম্ব দেখে মনে-মনে ভাবে, সুন্দর! ঠিক সেই সময় আর-একটি সুন্দর মুখের ছায়া আয়নায় পড়ে; যে ভাবছিল সে অবাক হয়ে বলে, তুমি যে আমার চেয়ে সুন্দর, অমনি স্বপ্নের মতো সুন্দর ছায়া হেসে বলে, আমার চোখে তুমি সুন্দর! এইভাবে এক আর্টে আর-এক আর্টে, এক সুন্দরে আর-এক সুন্দরে পরিচয়ের খেলা চলেছে, জগৎ-জুড়ে সুন্দর মনের সুন্দরের সঙ্গে মনে-মনে খেলা। পরিপূর্ণ সৌন্দর্যকে আর্ট দিয়ে ধরতে পারলে এ খেলা কোন্ কালে শেষ হয়ে যেত। যে মাছ ধরে তার ছিপে যদি মৎস্য-অবতার উঠে আসত তবে সে-মানুষ কোনোদিন আর মাছ-ধরাধরি খেলা করত না, সে তখনি অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে কলম হাতে মাছ বিক্রির হিশেব পরীক্ষা করতে বসত, আর যদি তখনও খেলার আশা তার কিছু থাকত তো এমন জায়গায় গিয়ে বসত যেখানে ছিপে মাছ ধরাই দিতে আসে না, ধরি-ধরি করতে-করতে পালায়! পরম সুন্দর যিনি তিনি লুকোচুরি খেলতে জানেন, তাই নিজে লুকিয়ে থেকে বাতাসের মধ্যদিয়ে তাঁর একটু রূপের পরিমল, আলোর মধ্যদিয়ে চকিতের মতো দেখা ইত্যাদি ইঙ্গিত দিয়ে তিনি আর্টিস্টদের খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান, আর্টিস্টের মনও সেইজন্যে এই খেলাতে সাড়া দেয়, খেলা চলেও সেইজন্যে। এক-একটা ছেলে আছে খেলতে জানে না, খেলার আরম্ভেই

হঠাৎ কোণ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ধরা পড়ে রসভঙ্গ করে দেয় আর সব ছেলেগুলো তার সঙ্গে আড়ি দিয়ে বসে। তেমনি পরম সুন্দরও যদি আর্টিস্টদের সামনে হঠাৎ বেরিয়ে এসে রসভঙ্গ করতে বসেন তবে আর্টিস্টরা তাঁকে নিয়ে বড় গোলে পড়ে যায় নিশ্চয়ই। আর্টিস্টরা ভক্তেরা কবিরা—পরম সুন্দরের সঙ্গে সুন্দর-সুন্দর খেলা খেলেন কিন্তু পণ্ডিতেরা পরম সুন্দরকে অণুবীক্ষণের উপরে চড়িয়ে তাঁর হাড়হদ্দের সঠিক হিশেব নিতে বসেন। কাজেই দেখি যারা খেলে আর যারা খেলে না সৌন্দর্য সম্বন্ধে এ দুয়ের ধারণা এবং উক্তি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরনের। পণ্ডিতেরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট-স্পষ্ট কথা লিখে ছাপিয়ে গেছেন, সেগুলো পড়ে নেওয়া সহজ কিন্তু পড়ে তার মধ্যথেকে সৌন্দর্যের আবিষ্কার করাই শক্ত। আর্টিস্ট তারা সুন্দরকে নিয়ে খেলা করে সুন্দরকে ধরে আনে চোখের সামনে মনের সামনে অথচ সৌন্দর্য সম্বন্ধে বলতে গেলে সব আগেই তাদের মুখ বন্ধ হয়ে যায় দেখতে পাই। 'সুন্দর কাকে বলো' এই প্রশ্নের জবাবে আর্টিস্ট ড্রুরার বললেন, 'আমি ওসব জানিনে বাপু' অথচ তাঁর তুলির আগায় সুন্দর বাসা বেঁধেছিল! লিয়োনার্ডো দ্য ভিন্‌চি যাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টি আর্ট থেকে আরম্ভ করে বিচিত্র জিনিশ নিয়ে নাড়াচাড়া করে গেছে, তিনি বলেছেন—পরম সুন্দর ও চমৎকার অসুন্দর দুই-ই দুর্লভ, পাঁচ-পাঁচিই জগতে প্রচুর।

একসময়ে আর্টিস্টদের মনে জায়গা-জায়গা থেকে তিল-তিল করে বস্তুর খণ্ড-খণ্ড সুন্দর অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ সুন্দর মূর্তি রচনা করার মতলব জেগেছিল। গ্রিসে এক কারিগর এইভাবে হেলেনের চিত্র পাঁচজন গ্রিকসুন্দরীর পঞ্চাশ টুকরো থেকে রচনা করে সমস্ত গ্রিসকে চমকে দিয়েছিল। কিছুদিন ধরে ঐ মূর্তিরই জল্পনা চলল বটে কিন্তু চিরদিন নয়, শেষে এমনও দিন এল যে ঐভাবে তিলোত্তমা গড়ার চেষ্টা ভারি মূর্খতা এ-কথাও আর্টিস্টরা বলে বসল! আমাদের দেশেও ঐ একই ঘটনা—শাস্ত্রসম্মত মূর্তিকেই রম্য বলে পণ্ডিতেরা মত প্রকাশ করলেন, সে-শাস্ত্র আর-কিছু নয় কতকগুলো মাপজোখ এবং পদ্ম-আঁখি, খঞ্জন-নয়ন, তিলফুল, শুকচঞ্চু, কদলীকাণ্ড, কুক্কুটাণ্ড, নিম্বপত্র এইসব মিলিয়ে সৌন্দর্যের এবং আধ্যাত্মিকতার একটা পেটেন্ট খাদ্যসামগ্রী! মনের খোরাক এভাবে প্রস্তুত হয় না, কাজেই আমাদের শাস্ত্রসম্মত সুতরাং বিশুদ্ধ আধ্যাত্মিক যে আর্টিফিশিয়্যালিটি তা ধর্মপ্রচারের কাজে লাগলেও সেখানেই আর্ট শেষ হল এ-কথা খাটল না। একেষাং মতম্ বলে একটা জিনিশ সে বলে উঠল 'তদ্‌রম্যং যত্রলগ্নং হি যস্য হৃৎ', মনে যার যা ধরল সেই হল সুন্দর। এখন তর্ক ওঠে—মনে ধরা না-ধরার উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচার যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে কিছু সুন্দর কিছুই অসুন্দর থাকে না, সবই সুন্দর সবই অসুন্দর প্রতিপন্ন হয়ে যায়, কোনোকিছুর একটা আদর্শ থাকে না। ভক্ত বলেন ভক্তিরসই সুন্দর আর-সব অসুন্দর, যেমন শ্রীচৈতন্য বললেন—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ [১০]

আর্টিস্ট বললেন—কাব্যং যশসে অর্থকৃতে ব্যবহারবিদে শিবেতরক্ষতয়ে[১১] ইত্যাদি। যার মন যেটাতে টানল তার কাছে সেইটেই হল সুন্দর অন্য সবার চেয়ে। এখন সহজেই আমাদের মনে এই দ্বিধা উপস্থিত হয়—কোন্ দিকে যাই, ভক্তের ফুলের সাজিতে গিয়ে উঠি, না আর্টিস্টের বাঁশিতে গিয়ে বাজি? কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায়, ঘোরতর বৈরাগী এবং ঘোরতর অনুরাগী দুইজনেই চাইছেন একই জিনিশ—ভক্ত ধন চাইছেন না কিন্তু সব ধনের যা সার তাই চাইছেন, জন চাইছেন না কিন্তু সবার যে আপনজন তাকেই

চাইছেন, সুন্দরী চান না কিন্তু চান ভক্তি, কবিতা নয় কিন্তু যিনি কবি যিনি স্রষ্টা—সুন্দরের যিনি সুন্দর—তাঁর প্রতি অচলা যে সুন্দরী ভক্তি তার কামনা করেন। আর্টিস্ট ও ভক্ত উভয়ে শেষে গিয়ে মিলেছেন যা চান সেটা সুন্দর করে পেতে চান এই কথাই বলে। মুখে সুন্দরী চাইনে বললে হবে কেন, মন টানছে বৈরাগীর ও অনুরাগীর মতোই সমান তেজে যেটা সুন্দর সেটার দিকে। মানুষের অন্তর-বাহির দুয়ের উপরেই সুন্দরের যে-বিপুল আকর্ষণ রয়েছে তা সহজেই ধরা যাচ্ছে—শুনতে চাই আমরা সুন্দর, বলতে চাই সুন্দর, উঠতে চাই, বসতে চাই, চলতে চাই সুন্দর, সুন্দরের কথা প্রত্যেক পদে-পদে আমরা স্মরণ করে চলেছি। পাই না-পাই, পারি না-পারি, সুন্দর বৌ ঘরে আনবার ইচ্ছা নেই এমন লোক কম আছে। যা-কিছু ভালো তারি সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে দেখা হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। আমরা কথায়-কথায় বলি—গাড়িখানি সুন্দর চলেছে, বাড়িখানি সুন্দর বানিয়েছে, ওষুধ সুন্দর কাজ করছে; এমনকি পরীক্ষার প্রশ্ন আর উত্তরগুলো সুন্দর হয়েছে এ-কথাও বলি। এমনি সব ভালোর সঙ্গে সুন্দরকে জড়িয়ে থাকতে যখন আমরা দেখছি তখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে সুন্দরের আকর্ষণ আমাদের মনকে ভালোর দিকেই নিয়ে চলে, আর যাকে বলি অসুন্দর তারও তো একটা আকর্ষণ আছে, সেও তা যার মন টানে আমার কাছে অসুন্দর হয়েও তার কাছে সুন্দর বলেই ঠেকে, তবে মনে-ধরা এবং মন-টানার দিক থেকে সুন্দরে-অসুন্দরে ভেদ করি কেমন করে? কাজেই সুন্দর-অসুন্দর দুই মিলে চুম্বক পাথরের মতো শক্তিমান একটি জিনিশ বলেই আমার কাছে ঠেকছে।

সুন্দরের দিকটা হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক এবং অসুন্দরের দিকও হল মনকে টেনে নিয়ে চলার দিক। এখন এটা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক যে চুম্বক যেমন ঘড়ির কাঁটাকে দক্ষিণ থেকে পরে-পরে সম্পূর্ণ উত্তরে নিয়ে যায় তেমনি সুন্দরের টান মানুষের মনকে ক্ষণিক ঐহিক নৈতিক এমনি নানা সৌন্দর্যের মধ্যদিয়ে মহাসুন্দরের দিকেই নিয়ে চলে, আর অসুন্দরের প্রভাব সেও মানুষের মনকে আর-একভাবে টানতে-টানতে নিয়ে চলে কদর্যতার দিকেই। কিন্তু সত্যিকার একটা কাঁটা আর চুম্বক নিয়ে যদি এই সত্যটা পরীক্ষা করতে বসা যায় তবে দেখব সুন্দরের একটা চিহ্ন দিয়ে তারি কাছে যদি চুম্বকের টানের মুখ রাখা যায় তবে কাঁটা সোজা সুন্দরের গিয়ে ঠেকবে নিজের ঘর থেকে, আবার ঐ চুম্বকের মুখ যদি অসুন্দর চিহ্ন দিয়ে সেখানে রাখা যায় তবে ও-কাঁটা উল্টো রাস্তা ধরেই ঠিক অসুন্দরে গিয়ে না-ঠেকে পারে না। কিন্তু এমন তো হয় যে, আমি যদি মনে করি তবে অসুন্দরের গ্রাস থেকেও কাঁটাকে আরো খানিক টেনে সুন্দরের কাছে পৌঁছে দিতে পারি কিংবা সুন্দরের দিক থেকে অসুন্দরে নামিয়ে দিতে পারি!

সুতরাং সুন্দর-অসুন্দরের মধ্যে কোন্‌টাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি সমুদয় গিয়ে দাঁড়াবে তার নির্দেশকর্তা হচ্ছে আমাদের মন ও মনের ইচ্ছা। মনে হল তো অসুন্দরে গিয়ে পড়লেম কিংবা সুন্দর থেকে অসুন্দর, অসুন্দর থেকে সুন্দরে দৌড় দিলেম, মন ও মনের শক্তি হল এ-বিষয়ে নিয়ন্তা। টানে ধরলে যে চুম্বক ধরেছে তার মনের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রয়োজন না-রেখেই কাঁটা আপনিই তার চরম গতি পায়, কিন্তু এই গতিকে সংযত করে অধোগতি থেকে উর্ধ্ব বা উর্ধ্ব থেকে অধোভাবের দিকে আনতে হলে আমাদের মনের একটা ইচ্ছাশক্তি একান্ত দরকার। বিল্বমঙ্গল বারবনিতার প্রেমোন্মাদ থেকে বিভুর প্রেমোন্মাদে গিয়ে যে ঠেকলেন সে শুধু তাঁর মনটি শক্তিমান ছিল বলেই। নিকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টে, অসুন্দর থেকে সুন্দরে যেতে সেই পারে যার মন উৎকৃষ্ট ও সুন্দর, যার মন অসুন্দর সেও এইভাবে চলে ভালো থেকে মন্দে। আর্টিস্ট কবি ভক্ত এঁদের মন এমনিই

শক্তিমান যে অসুন্দরের মধ্যদিয়ে সুন্দরের আবিষ্কার তাঁদের পক্ষে সহজ। ভক্ত কবি আর্টিস্ট সবাই একধরনের মানুষ; সবাই আর্টিস্ট, আর্টিস্টের কাছে ভেদ নেই পণ্ডিতের কাছে যেমন সেটা আছে।

আর্টিস্টের কাছে রসের ভেদ আছে, মনের অবস্থাভেদে সু হয় কু, কু হয় সু এও আছে, তাছাড়া রূপভেদও আছে; কিন্তু সু কু-এর যে নির্দিষ্ট সীমা পণ্ডিত থেকে আরম্ভ করে অপণ্ডিত পর্যন্ত টেনে দিচ্ছে, এ-রূপ সে-রূপের মাঝে সেই পাকাপোক্ত পাঁচিল নেই আর্টিস্টের কাছে। নীরসেরও স্বাদ পেয়ে আর্টিস্টের মন রসায়িত হয়, এইটুকুই তফাত আর্টিস্টের আর সাধারণের মনে। তুমি আমি যখন খরার দিনে পাখা আর বরফ বলে হাঁক দিচ্ছি আর্টিস্ট তখন সুন্দর করে খরার দিন মনে ধরে কবিতা লিখলে—'কালবৈশাখী আগুন ঝরে, কালবৈশাখী রোদে পোড়ে! গঙ্গা শুকু-শুকু আকাশে ছাই!' রসের প্রেরণা সুন্দর-অসুন্দরের ধারণাকে মুক্তি দিলে, আর্টিস্টের মধ্যে সুন্দর-অসুন্দরে মিলিয়ে এক রসরূপ সে দেখে চলল। আর্টিস্ট রূপমাত্রকে নির্বিচারে গ্রহণ করলে—কেন সুন্দর কেন অসুন্দর এ-প্রশ্ন আর্টিস্ট করলে না, শুধু রসরূপে যখন বস্তুটিকে দেখলে তখন সে সাধারণ মানুষের মতো আহা-ওহো বলে ক্ষান্ত থাকল না, দেখার সঙ্গে আর্টিস্টের মন আপনার সৌন্দর্যের অনুভূতিটা প্রত্যক্ষ করবার জন্য সুন্দর উপায় নির্বাচন করতে লাগল সুন্দর রঙ চঙ সুন্দর ছন্দোবন্ধ এমনি নানা সরঞ্জাম নিয়ে আর্টিস্টের সমস্ত মানসিক বৃত্তি ধাবিত হল সুন্দরের স্মৃতিটিকে একটা বাহ্যিক রূপ দিতে, কিংবা সুন্দরের স্মৃতিটিকে নতুন-নতুন কল্পনার মধ্যে মিশিয়ে নতুন রচনা প্রকাশ করতে। সুন্দর বা তথাকথিত অসুন্দর দুয়েরই যেমন মনকে আকর্ষণ করবার শক্তি আছে, তেমনি মনের মধ্যে গভীরভাবে নিজের স্মৃতিটি মুদ্রিত করবারও শক্তি আছে—সুতরাং সুন্দরে-অসুন্দরে এখানেও এক। সুন্দরকেও যেমন ভোলবার জো নেই অসুন্দরকেও তেমনি টেনে ফেলবার উপায় নেই। দুই স্মৃতির মধ্যে শুধু তফাত এই, সুন্দরের স্মৃতিতে আনন্দ, অসুন্দরের স্পর্শে মন ব্যথিত হয়, সুখও যেমন দুঃখও তেমনি মনের একস্থানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, শুধু দুঃখকে মানুষ ভোলবারই চেষ্টা করে আর সুখের স্মৃতিকে লতার মতো মানুষের মন জড়িয়ে-জড়িয়ে ধরতেই চায় দিনরাত।

সাধারণ মানুষের মনেও যেমন, আর্টিস্ট মানুষের মনেও তেমনি সহজভাবেই সুন্দর-অসুন্দরের ক্রিয়া হয়, শুধু সাধারণ মানুষের সঙ্গে আর্টিস্টের তফাত হচ্ছে মনের অনুভূতিকে প্রকাশের ক্ষমতা বা অক্ষমতা নিয়ে। দুঃখ পেলে সাধারণ মানুষ বেজায় রকম কান্নাকাটি শুরু করে, আর্টিস্টও যে কাঁদে না তা নয়, কিন্তু তার মনের কাঁদন আর্টের মধ্যদিয়ে একটু অপরূপ সুন্দর ছন্দে বেরিয়ে আসে। অসুন্দরের মধ্যে, অ-সুখের মধ্যে আর্টিস্টের কাছ থেকে রস আসে বলেই আর্ট মাত্রকে সুন্দরের প্রকাশ বলে গণ্য করা হয়, এবং সেই কারণে আর্টের চর্চায় ক্রমে সুন্দরের অনুভূতি আমাদের যেমন বৃদ্ধি পায় তেমন সৌন্দর্য সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক পড়ে কিংবা শুনে হয় না। আসলে যা সুন্দর তা কখনও বলে না, আমি এইজন্যে সুন্দর; আমাদের মনেও ঠিক সেইজন্যে সুন্দরকে গ্রহণ করবার বেলায় এ-প্রশ্ন ওঠে না যে, কেন এ সুন্দর! আসলে যে সুন্দর নয় সেই কেবল আমাদের সামনে রঙ মেখে অলঙ্কার পরে হাব-ভাব করে এসে বলে আমি এই কারণে সুন্দর, মনও আমাদের তখনি বিচার করে বুঝে নেয় এ-রঙের দ্বারা অথবা অলঙ্কারে বা আর-কিছুর দ্বারায় সুন্দর দেখাচ্ছে কি না!

আসলে যা সুন্দর তাকে নিয়ে আর্টিস্ট কিংবা সাধারণ মানুষের মন বিচার করতে বসে না, সবাই বলে—সুন্দর ঠেকছে, কেন তা জানি না। কিন্তু সুন্দরের সাজে যে অসুন্দর আসে

তাকে নিয়ে সাধারণ মানুষ এবং আর্টিস্টের মনে তর্কের উদয় হয়। কিন্তু পণ্ডিতের মন দার্শনিকের মনের ঠিক বিপরীত উপায়ে চলে, অসুন্দরের বিচার সেখানে নেই, সব বিচার বিতর্ক সুন্দরকে নিয়ে। যা সুন্দর আমরা দেখেছি তা নিজের সুন্দরতা প্রমাণের কোনো দলিল নিয়ে এল না কিন্তু আমাদের মন সহজেই তাতে রত হল, কিন্তু পণ্ডিতের সামনে এসে সুন্দর দায়গ্রস্ত হল—প্রশ্নের পর প্রশ্ন উঠল সুন্দরকে নিয়ে—তুমি কেন সুন্দর, কিসে সুন্দর ইত্যাদি ইত্যাদি! সুন্দর, সে সুন্দর বলেই সুন্দর, মনে ধরল বলেই সুন্দর, এ সহজ কথা সেখানে খাটল না। পণ্ডিত সেই সুন্দরকে বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করছেন—কী নিয়ে সুন্দরের সৌন্দর্য? সেই বিশ্লেষণের একটা মোটামুটি হিশেব করলে এই দাঁড়ায়—(১) সুখদ বলেই ইনি সুন্দর, (২) কাজের বলেই সুন্দর, (৩) উদ্দেশ্য এবং উপায় দুয়ের সঙ্গতি দেন বলেই সুন্দর, (৪) অপরিমিত বলেই সুন্দর, (৫) সুশৃঙ্খল বলেই সুন্দর, (৬) সুসংহত বলেই সুন্দর, (৭) বিচিত্র-অবিচিত্র সম বিষম দুই দিয়ে ইনি সুন্দর।

এইসব প্রাচীন এবং আধুনিক পণ্ডিতগণের মতামত সৌন্দর্যের সার ধরবার জন্যে সুন্দর একটি জাল বুনে নেওয়া যে চলে না তা নয়, কিন্তু তাতে করে সুন্দরকে ঠিক-যে ধরা যায় তার আশা আমি দিতে সাহস করি না; তবে আমি এইটুকু বলি—অন্যের কাছে সুন্দর কী বলে আপনাকে সপ্রমাণিত করছে তা আমাদের দেখায় লাভ কী? আমাদের নিজের-নিজের কাছে সুন্দর কী বলে আসছে তাই আমি দেখব। আমি জানি সুন্দর সবসময়ে সুখও দেয় না কাজও দেয় না—বিদ্যুৎশিখার মতো বিশৃঙ্খল অসংযত উদ্দেশ্যহীন বিদ্রুত বিষম এবং বিচিত্র আবির্ভাব সুন্দরের! সুন্দর, এই কথাই তো বলছে আমাদের—আমি এ নই তা নই, এজন্যে সুন্দর ওজন্যে সুন্দর নই, আমি সুন্দর তাই আমি সুন্দর। আর্টের মধ্যে রীতিনীতি, চক্ষু-জোড়ানো মন-ওড়ানো প্রাণ-ভোলানো ও কাঁদানো গুণ, কিংবা এর যে-কোনো একটা যেমন আর্ট নয়, আর্ট বলেই যেমন সে আর্ট, সুন্দরও তেমনি সুন্দর বলেই সুন্দর। সুন্দর নিত্য ও অমূর্ত, নানা বস্তু নানা ভাবের মধ্যে তার অধিষ্ঠান ও আরোপ হলে তবে মনোরসনা তার স্বাদ অনুভব করে—এমন সুন্দর তেমন সুন্দর সুখদ সুন্দর সুপরিমিত সুন্দর সুশৃঙ্খলিত সুন্দর! আমাদের জিভ যেমন চাখে মেঠাই সন্দেশ শরবত ইত্যাদি পৃথক-পৃথক জিনিশের মধ্যদিয়ে মিষ্টতাকে—ঠিক সেইভাবেই জীব বা জীবাত্মা মনোরসনার সাহায্যে আপনার মধ্যে সুন্দরের জন্য যে-প্রকাণ্ড পিপাসা রয়েছে সেটা নানা বস্তু ধরে মেটাতে চলে।

অতএব বলতে হয়, মন যার যেমনটা চায় সেইভাবে সুন্দরকে পাওয়াই হল পাওয়া, আর কারু কথামতো কিংবা অন্য কারু মনের মতো সুন্দরকে পাওয়ার মানে—না-পাওয়াই। মা-বাপের মনের মতো হলেই বৌ সুন্দর হল এ-কথা যে-ছেলের একটুমাত্র সৌন্দর্যজ্ঞান হয়েছে সে মনে করে না। বৌ কাজের, বৌ সংসারী, বৌ বেশ সংস্থানসম্পন্না, এবং হয়তোবা ডাকসাইটে সুন্দরীও হতে পারে অন্য সবার কাছে, কিন্তু ছেলের নিজের মনের মধ্যে কাজ কর্ম সংসার সুরূপ কুরূপ ইত্যাদির একটা যে-ধারণা, তার সঙ্গে অন্যের পছন্দ-করা বৌ মিলল তো গোল নেই, না-হলেই মুশকিল। হিন্দিতে প্রবাদ আছে: 'আপ্ রুচি খানা—পর রুচি পহেরনা', খাবারের স্বাদ আমাদের প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্রভাবে নিতে হয় সুতরাং সেখানে আমাদের স্বরাজ, কিন্তু পরনের বেলায় পরে যেটা দেখে সুন্দর বলে সেইটেই মেনে চলতে হয়, না-হলে নিন্দে; সুতরাং সেখানে কেউ জোর করে বলতে পারে না এইটেই পরি পাঁচজনে যা বলে বলুক, আমরা নিজের বুদ্ধিকেও সেখানে প্রাধান্য দিতে পারিনে, দেশ কাল যে সুন্দর পরিচ্ছদের সম্মান করে তাকেই মেনে নিতে হয়।

একটা কথা কিন্তু মনে রাখা চাই, সাজগোজ পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির সম্বন্ধে কিছু ওলটপালট সময়ে-সময়ে যে হয়ে আসছে তা ঐ ব্যক্তিগত স্বাধীন রুচি থেকেই আসছে। সুতরাং সবদিক দিয়ে সুন্দর-অসুন্দরের বোঝা-পড়া আমাদের ব্যক্তিগত রুচির উপরেই নির্ভর করছে। যদি সত্যই এই জগৎ অসুন্দরের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, নিছক সুন্দর জিনিশ দিয়ে গড়া পরিপূর্ণ সুখদ সুশৃঙ্খল ও সর্বগুণান্বিত একটা কিছু হত তবে এর মধ্যে এসে সুন্দর অসুন্দরের কোনো প্রশ্নই আমাদের মনে উদয় হত না। আমরা এই জগৎ সংসার চিরসুন্দরের প্রকাশ ইত্যাদি কথা মুখে বললেও চোখে তা দেখিনে, অনেক সময় মনেও সেটা ধরতে পারিনে, কাজেই অতৃপ্ত মন সুন্দরের বাসনায় নানা দিকে ধাবিত হয় এবং সুন্দরের একটা সাক্ষাৎ আদর্শ খাড়া করে, দেখার চেষ্টা করে এবং সুন্দরকে অসুন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে আমাদের সৌন্দর্যজগৎ-যে খণ্ড ও খর্ব হয়ে পড়ে তা আর মনেই থাকে না। সুরূপ কুরূপ দুয়ে মিলে সুন্দরের অখণ্ড মূর্তির ধারণা করা শক্ত কিন্তু একেবারে যে অসম্ভব মানুষের পক্ষে তা বলা যায় না।

ভক্ত কবি এবং আর্টিস্ট এদের কাছে সুন্দর-অসুন্দর বলে দুটো জিনিশ নেই, সব জিনিশের ও ভাবের মধ্যে যে-নিত্যবস্তুটি সেটিই সুন্দর বলে তাঁরা ধরেন। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যা-কিছু তা অনিত্য, তার সুখ শৃঙ্খলা মান পরিমাণ সমস্তই অনিত্য, সুতরাং সুন্দর যা নিত্য, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তার সঙ্গে মেলা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব বলা যেতে পারে। আমাদের মনই কেবল গ্রহণ করতে পারে সুন্দরের আস্বাদ—সুতরাং মনোরসনা রোগ বা পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ার মতো ভীষণ বিপত্তি মানুষের হতে পারে না। আর্টের দিক দিয়ে যৌবনই সুন্দর বার্ধক্য সুন্দর নয়, আলোই সুন্দর অন্ধকার নয়, সুখই সুন্দর দুঃখ নয়, পরিষ্কার দিন বাদলা নয়, বর্ষার নদী শরতের নয়, পূর্ণচন্দ্রই চন্দ্রকলা নয়—কেউ এ-কথা বলতে পারে না। যে একেবারেই আর্টিস্ট নয় শুধু তারি পক্ষে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ড ভাবের একটা আদর্শ সৌন্দর্যকে কল্পনা করে নেওয়া সম্ভব। কবীর ছিলেন আর্টিস্ট তাই তিনি বলেছিলেন—'সবহি মূরত বীচ অমূরত, মূরতকী বলিহারী।' যে সেরা আর্টিস্ট তারি গড়া যা-কিছু তারি মধ্যে এইটে লক্ষ্য করছি—ভালোমন্দ সব মূর্তির মধ্যে অমূর্তি বিরাজ করছেন! 'ঐসা লো নহি তৈসা লো, মৈঁ কেহি বিধি কথৌঁ গম্ভীরা লো'—সুন্দর যে অসুন্দরের মধ্যেও আছে এ গভীর কথা বুঝিয়ে বলা শক্ত, তাই কবীর এককথায় সব তর্ক শেষ করলেন 'বিছুড়ি নহিঁ মিলিহো'— বিচ্ছিন্নভাবে তাকে খুঁজে পাবে না। কিন্তু এই-যে সুন্দরের অখণ্ড ধারণা কবীর পেলেন তার মূলে কী ভাবের সাধনা ছিল জানতে মন সহজেই উৎসুক হয়; এর উত্তর কবীর যা দিয়েছিলেন তার সঙ্গে সব আর্টিস্টের এক ছাড়া দুই মত নেই দেখা যায়—'সংতো সহজ সমাধ ভলী, সাঁঈসে মিলন ভয়ো জা দিনতে সুরত ন অন্তি চলি ॥ আঁখ ন মুদুঁ কান ন রূংধু, কায়া কষ্ট ন ধারুঁ। খুলে নয়ন মৈ হঁস হঁস দেখুঁ সুন্দর রূপ নিহারুঁ ॥' সহজ সমাধিই ভালো, হেসে চাও দেখবে সব সুন্দর, যার মনে হাসি নেই তার চোখে সুন্দরও নেই। যার প্রাণে সুর আছে বিশ্বের সুর বেসুর বিবাদী সংবাদী সবই সুন্দর গান হয়ে মেলে তারি মনে। আর যার কাছে শুধু পুঁথির সুরসপ্তক স্বরলিপি ও তাল-বেতালের বোল মাত্রই আছে, তার বুকের কাছে বিশ্বের সুর এসে তুলোট কাগজের খড়মড়ে শব্দে হঠাৎ পরিণত হয়।

এখন মানুষের ব্যক্তিগত রুচির উপরে সুন্দর-অসুন্দরের বিচারের শেষ নিষ্পত্তিটা যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তবে সুন্দর-অসুন্দরের যাচাই করবার আদর্শ কোন্‌খানে পাওয়া যাবে এই আশঙ্কা সবারই মনে উদয় হয়। সুন্দরকে বাহ্যিক উপমান ধরে যাচাই করে নেবার

জন্যে এ ব্যস্ততার কারণ আমি খুঁজে পাইনে। ধরো, সুন্দরের একটা বাঁধাবাঁধি প্রত্যক্ষ আদর্শ রইল না, প্রত্যেকে আমরা নিজের-নিজের মনের কষ্টিপাথরেই বিশ্বটাকে পরীক্ষা করে চললেম—খুব আদিকালে মানুষ আর্টিস্ট যেভাবে সুন্দরকে দেখে চলেছিল—এতে করে মানুষের সৌন্দর্য উপভোগ সৌন্দর্য সৃষ্টির ধারা কি একদিনের জন্য বন্ধ হল জগতে? বরং আর্টের ইতিহাসে এইটেই দেখতে পাই যে যেমনি কোনো জাতি বা দল আর্টের দিক দিয়ে কিছুকে আদর্শ করে নিয়ে ধরে বসল, পুরুষ-পরম্পরায় অমনি সেখানে রসের ব্যাঘাত হতে আরম্ভ হল, আর্টও ক্রমে অধঃ থেকে অধোগতি পেতে থাকল। আমাদের সংগীতে সেই তানসেন ও আকব্বরী চাল, ছবিতে দিল্লির চাল বা বিলিতি চাল যে কুকাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং সেই আদর্শকে উল্টে ফেলে চললেও যা হতে পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণসমস্ত আমাদের সামনেই ধরা রয়েছে, সুতরাং আমার মনে হয় সুন্দরের একটা আদর্শের অভাব হলে তত ভাবনা নেই, যত ভাবনা আদর্শটা বড় হয়ে আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞান ও অনুভবশক্তির বিলুপ্তি যদি ঘটায়। কালিদাসের আমলে 'তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা' ছিল সুন্দরীর আদর্শ। অজন্তার এবং তার পূর্বের যুগ থেকেও হয়তো এই আদর্শই চলে আসছিল, মোগলানী এসে এবং অবশেষে আরমানি থেকে আরম্ভ করে ফিরিঙ্গিনী পর্যন্ত এসে সে-আদর্শ উল্টে দিলে এবং হয়তো কোন্ দিন বা চীনই এসে সেটা আবার উল্টে দেয় তারও ঠিক নেই।

আদর্শটা এমনিই অস্থায়ী জিনিশ যে তাকে নিয়ে চিরকাল কারবার করা মুশকিল। রুচি বদলায় আদর্শও বদলায়, যেটা ছিল এককালের চাল সেটা হয় অন্যকালের বেচাল, ছিল টিকি এল টাই, ছিল খড়ম এল বুট, এমনি কত কী! গাছগুলো অনেককাল ধরে এক অবস্থায় রয়েছে—সেইজন্যে এইগুলোকেই আদর্শ গাছ ইত্যাদি বলে আমাদের মনে হয় কিন্তু পৃথিবীর পুরাকালের গাছ পাতা ফল ফুলের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ আলাদা—অথচ তারাও তো ছিল সুন্দর!—সুতরাং পরিবর্তনশীল বাইরেটার মধ্যে সুন্দর আদর্শভাবে থাকে না। শিশু গাছ বড় গাছ এবং বুড়ো গাছ প্রত্যেকেরই মধ্যে যে-সুন্দরের ধারা চলছে, পরম সুন্দর হয়ে দেখা দেবার নিত্য এবং বিচিত্র চেষ্টা সেই প্রাণের স্রোত নিয়ে হচ্ছে গাছ সুন্দর। এমনি আমাদের মনে বা বস্তু ও ভাবের অন্তরে যে নিত্য এবং সুন্দর প্রাণের স্রোত গোপনে চলেছে তাকেই সুন্দরের আদর্শ বলে ধরতে পারি, আর কিছুকে নয়, এবং সেই আদর্শই সুন্দরকে যাচাই করার যে নিত্য আদর্শ নয় তা জোর করে কে বলতে পারে! সমস্ত পদার্থের সৌন্দর্যের পরিমাপ হল তাদের মধ্যে, অনিত্য রস যা তা নিয়ে বাইরের রঙ রূপ বদলে চলে কিন্তু নিত্য যা তার অদল-বদল নেই। সব শিল্পকে যাচাই করে নেবার জন্যে আমাদের প্রত্যেকের মনে নিত্য সুন্দরের যে-একটি আদর্শ ধরা আছে—তার চেয়ে বড় আদর্শ কোথায় আর পাব? যেভাবেই হোক যে-বস্তুই হোক যখন সে নিত্য তার আস্বাদ দিয়ে আমাদের মনে পরম-সুন্দরের স্বল্পাধিক স্পর্শ অনুভব করিয়ে গেল সে সুন্দর বলে আমাদের কাছে নিজেকে প্রমাণ করলে। আমার কাছে কতকগুলো জিনিশ কতকগুলো ভাব সুন্দর ঠেকে কতক ঠেকে অসুন্দর, এই ঠেকল সুন্দর এই অসুন্দর, তোমার কাছেও তাই, আমার মনের সঙ্গে মেলে না তোমারটি তোমার সঙ্গে মেলে না আমারটি।

সুন্দরের অসুন্দরের অবিচলিত আদর্শ চলায়মান জীবনে কোথাও নেই, সুতরাং যেদিক দিয়েই চলো সুন্দর অসুন্দর সম্বন্ধে বিতর্ক মেটবার নয়, কাজেই এই অতৃপ্তিকেই—এই সুখ-দুঃখে আলো-আঁধারে সুন্দর-অসুন্দরে মেলা খণ্ড-বিখণ্ড সত্য সুন্দর এবং মঙ্গলকে—সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে যে চলতে পারে, সেই সুন্দরকে এক ও বিচিত্রভাবে অনুভব

করবার সুবিধে পায়। জগৎ যার কাছে তার ছোট লোহার সিন্দুকটিতেই ধরা আর জগৎ যার কাছে লোহার সিন্দুকের বাইরেও অনেকখানি বিস্তৃত ধুলোর মধ্যে কাদার মধ্যে আকাশের মধ্যে বাতাসের মধ্যে, তাদের দুজনের কাছে সুন্দর ছোট বড় হয়ে দেখা যে দেয় তার সন্দেহ নেই! সিন্দুক খালি হলে যার সিন্দুক তার কাছে কিছুই আর সুন্দর ঠেকে না, কিন্তু যার মন সিন্দুকের বাইরের জগৎকে যথার্থভাবে বরণ করলে তার চোখে সুন্দরের দিকে চলবার অশেষ রাস্তা খুলে গেল, চলে গেল সে সোজা নির্বিচারে নির্ভয়ে। যখন দেখি নৌকা চলেছে ভয়ে-ভয়ে, পদে-পদে নোঙর আর খোঁটার আদর্শে ঠেকতে-ঠেকতে, তখন বলি, নৌকা সুন্দর চলল না, আর যখন দেখলেম নৌকা উল্টোস্রোতের বাধা উল্টো বাতাসের ঠেলাকে স্বীকার করেও গন্তব্যপথে সোজা বেরিয়ে গেল ঘাটের ধারের খোঁটা ছেড়ে নোঙর তুলে নিয়ে, তখন বলি, সুন্দর চলে গেল!

সুন্দর-অসুন্দর—জীবন-নদীর এই দুই টান—একে মেনে নিয়ে যে চলল সেই সুন্দর চলল আর যে এটা মেনে নিতে পারলে না সে রইল যে-কোনো একটা খোঁটায় বাঁধা। ঘাটের ধারে বাঁশের খোঁটা, তাকে অতিক্রম করে চলে যায় নদীর স্রোত নানা ছন্দে এঁকে বেঁকে—আর্টের স্রোতও চলেছে চিরকাল ঠিক এইভাবেই চিরসুন্দরের দিকে। সুন্দর করে বাঁধা আদর্শের খোঁটাগুলো আর্টের ধাক্কায় এদিক-ওদিক দোলে, তারপর একদিন যখন বান ডাকে খোঁটা সেদিন নিজে এবং নিজের সঙ্গে বাঁধা নৌকাটাকেও নিয়ে ভেসে যায়। আর্ট এবং আর্টিস্ট এদের মনের গতি এমনি করে পণ্ডিতদের বাঁধা এবং মূর্খদের আঁকড়ে-ধরা তথাকথিত দড়ি-খোঁটা অতিক্রম করে উপড়ে ফেলে চলে যায়। বড় আর্টিস্টরা সুন্দরের আদর্শ গড়তে আসেন না, যেগুলো কালে-কালে সুন্দরের বাঁধাবাঁধি আদর্শ হয়ে দাঁড়াবার জোগাড় করে, সেইগুলোকেই ভেঙে দিতে আসেন, ভাসিয়ে দিতে আসেন সুন্দর-অসুন্দরের মিলে যে চলন্ত নদী তারি স্রোতে। যে পারে সে ভেসে চলে মনোমতো স্থানে মনতরী ভেড়াতে-ভেড়াতে সুন্দর সূর্যাস্তের মুখে, আর সেটা যে পারে না সে পরের মনোমতো সুন্দর করে বাঁধা ঘাটে আটকা থেকে আদর্শ খোঁটায় মাথা ঠুকে-ঠুকেই মরে, সুন্দর-অসুন্দরের জোয়ার-ভাঁটা তাকে বৃথাই দুলিয়ে যায় সকাল সন্ধ্যে!

বাঁধা-নৌকা সে একভাবে সুন্দর, ছাড়া-নৌকা সে আর-একভাবে সুন্দর; তেমনি কোনো-একটা কিছু সকরুণ সুন্দর, কেউ নিষ্করুণ সুন্দর, কেউ ভীষণ সুন্দর, আবার কেউ বা এতবড় সুন্দর কি একটুকু সুন্দর—আর্টিস্টের চোখে এইভাবে বিশ্বজগৎ সুন্দরের বিচিত্র সমাবেশ বলেই ঠেকে; আর্টিস্টের কাছে শুধু তর্ক জিনিশটাই অসুন্দর, কিন্তু তর্কের সভায় যখন ঘাড় নড়ছে হাত নড়ছে ঝড় বইছে তার বীভৎস ছন্দটা সুন্দর। সুতরাং যে আলোয় দোলে অন্ধকারে দোলে কথায় দোলে সুরে দোলে ফুলে দোলে ফলে দোলে বাতাসে দোলে পাতায় দোলে—সে শুকনোই হোক তাজাই হোক সুন্দর হোক অসুন্দর হোক সে যদি মন দোলাল তো সুন্দর হল এইটেই বোধহয় চরম কথা সুন্দর-অসুন্দরের সম্বন্ধে যা আর্টিস্ট বলতে পারেন নিঃসঙ্কোচে। আদর্শকে ভাঙতে বড়-বড় আর্টিস্টরা যা আজ রচনা করে গেলেন, আস্তে আস্তে মানুষ সেইগুলোকেই যে আদর্শ ঠাউরে নেয় তার কারণ আর-কিছু নয়, আমাদের সবার মন সত্যিই যে সুন্দর তার স্বাদ পেতে ব্যাকুল থাকে—যে-রচনার মধ্যে যে-জীবনের মধ্যে তার আস্বাদ পায় তাকেই অন্য সবার চেয়ে বড় না বোধ করে সে থাকতে পারে না। এইভাবে একজন, ক্রমে দশজন। এবং এমনও হয়, সৌন্দর্য সম্বন্ধে স্বাধীন মতামত নেই অথচ চেষ্টা রয়েছে সুন্দরকে কাছাকাছি চারিদিকে পেতে, সে, অথবা সুন্দরের কোনো ধারণা সম্ভব নয় শুধু সৌন্দর্যবোধের ভান করছে, সেও,

আর্ট বিশেষকে আস্তে আস্তে আদর্শ হবার দিকে ঠেলে তুলে ধরে—ঠিক যেভাবে বিশেষ-বিশেষ জাতি আপনার-আপনার এক-একটা জাতীয় পতাকা ধরে তারি নিচে সমবেত হয়; সে-পতাকা তখনকার মতো সুন্দর হলেও একদিন তার জায়গায় নতুন মানুষ তোলে নতুন সজ্জায় সাজানো নিজের স্ট্যান্ডার্ড বা সৌন্দর্যবোধের চিহ্ন। এইভাবে একের পর আর এসে নতুন-নতুন ভাবে সুন্দরের আদর্শ ভাঙা-গড়া হতে-হতে চলেছে পরিপূর্ণতার দিকে, কিন্তু পূর্ণ সুন্দর বলে নিজেকে বলাতে পারছে না কেউ। আর্টিস্টের সৌন্দর্যের ধারণা পাকা ফলের পরিণতির রেখাটির মতো সুডৌল ও সুগোল কিন্তু জ্যামিতির গোলের মতো একেবারে নিশ্চল গোল নয়, সচল ঢলঢলে গোল যার একটু খুঁত আছে, পূর্ণচন্দ্রের মতো প্রায় পরিপূর্ণ কিন্তু সম্পূর্ণ নয়; সেই কারণে অনেক সময় বড় আর্টিস্টের রচনা সাধারণের কাছে ঠেকে যাচ্ছেতাই—কেননা সাধারণ মন জ্যামিতিক গোলের মতো আদর্শ একটা-না-একটা ধরে থাকেই, কাজেই সে সত্যকথাই বলে যখন বলে যাচ্ছেতাই, অর্থাৎ তার ইচ্ছের সঙ্গে মিলছে না আর্টিস্টের ইচ্ছে। কিন্তু যাচ্ছেতাই শব্দটি বড় চমৎকার, এটিতে বোঝায়—যা ইচ্ছে তাই, সাধুভাষায় বললে বলি যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ বা যথাভিরুচি, এই যা ইচ্ছে তাই—যা মন চাচ্ছে তাই, সুতরাং রসিক ও আর্টিস্ট এই শব্দটির যথার্থ অর্থ সুন্দর অর্থ ধরেই চিরকাল চলেছে। মনের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বজায় রেখে সুন্দরকে মনের টানের উপরে ছেড়ে যা ইচ্ছে তাই বলে পণ্ডিতানাং মতম্-এর বাইরে বেরিয়ে পড়েছে; খোঁটা-ছাড়া নৌকা বাঁধনমুক্ত-প্রাণ! তাই দেখছি সুন্দর-অসুন্দরের বাছ-বিচার পরিত্যাগ করে তারি সঙ্গে গিয়ে লাগবার স্বাধীনতা আর্টিস্টের মনকে বড় কম প্রসার দেয় না।

বড় মন বড় সুন্দরকে ধরতে চাইছে যখন, বড় স্বাধীনতার মুক্তি তার একান্ত প্রয়োজন; কিন্তু মন যেখানে ছোট সেখানে আর্টের দিক দিয়ে এই বড় স্বাধীনতা দেওয়ার মানে ছেলের হাতে আগুনের মশালটা ধরে দেওয়া—সে লঙ্কাকাণ্ড করে বসবেই, নিজের সঙ্গে আর্টের মুখ পুড়িয়ে কিংবা ভরাডুবি করে স্রোতের মাঝে। বড় মন সে জানে বড় সুন্দরকে পেতে হলে কতটা সংযম আর বাঁধাবাঁধির মধ্যদিয়ে নিজেকে ও নিজের আর্টকে চালিয়ে নিতে হয়। ছোট সে তো বোঝে না যে পরের অনুসরণে সুন্দরের দিকে চলাতেও আলো থেকে আলোতেই গিয়ে পৌঁছোয় মন; আর নিজের ইচ্ছামতো চলতে-চলতে ভুলে হঠাৎ সে অসুন্দরের নেশা ও টানে পড়ে যায়, তখন তার কোনো কারিগরিই তাকে সুন্দরের বিষয়ে প্রকাণ্ড অন্ধতা এবং আর্ট বিষয়ে সংসার-জোড়া সর্বনাশ থেকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না। পণ্ডিতরা আর-কিছু না হোন পণ্ডিত তো বটে, সৌন্দর্যের এবং আর্টের লক্ষণ নিয়ম ইত্যাদি বেঁধে দিতে তাঁরা যে চেয়েছেন তা এই ছোট মনের উৎপাত থেকে আর্টকে এবং সেইসঙ্গে আর্টিস্টকেও বাঁচাতে। যত্র লগ্নং হি যস্য হৃৎ—এ-কথা যাঁরা শিল্প-বিষয়ে পণ্ডিত তাঁরা স্বীকার করে নিলেও এই যা-ইচ্ছে-তাই শিল্পের উপরে খুব জোর দিয়ে কিছু বললেন না। কেননা তাঁরা জানতেন হৃদয় সবার সমান নয় মহৎ নয় সুন্দর নয়, হৃদয়ে যা ধরে তারও ভেদাভেদ আছে, হৃদয় আমাদের অনেক জিনিশে গিয়ে লগ্ন হয় যা অসুন্দর এবং একেবারেই আর্ট নয়, এবং এও দেখা যায় পরমসুন্দর এবং অপূর্ব আর্ট তাতেও গিয়ে হৃদয় লাগল না, মধুকরের মতো উড়ে পড়ল না ফুলের দিকে, কাদাখোঁচার মতো নদীর ধারে-ধারেই খোঁচা দিয়ে বেড়াতে লাগল পাঁকে।

যখন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয় গিয়ে লগ্ন হচ্ছে কুব্জার লাবণ্যে, আর একে পড়েছে চন্দ্রাবলীর প্রেমে অন্যে রাধে-রাধে বলেই পাগল, তখন এই তিনে মিলে ঝগড়া চলবেই। এইসব তর্কের ঘূর্ণাজলে আর্টকে না-ফেলে সৌন্দর্য ও আর্টের ধারাকে

সুনিয়ন্ত্রিত রকমে চালাতে হয় পুরুষপরম্পরায়, তবে পণ্ডিত ও রসিকদের কথিত সমস্ত রসের রূপের ধারার সাহায্য না নিলে কেমন করে খণ্ড-বিখণ্ডতা থেকে আর্টে একত্ব দেওয়া যাবে। আমার নিজের মুখে কী ভালো লাগল না-লাগল তা নিয়ে দু-চার সমরুচি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করা চলে কিন্তু বিশ্বজোড়া উৎসবের মধ্যে শিল্পের স্থান দিতে হলে নিজের মধ্যে যে ছোট সুন্দর বা অসুন্দর তাকে বড় করে সবার করে দেবার উপায় নিছক নিজত্বটুকু নয়; সেখানে ইনডিভিডুয়্যালিটিকে ইউনিভারস্যালিটি দিয়ে যদি না-ভাঙতে পারা যায়, তবে বীণার প্রত্যেক ঘাট তার পুরো সুরেই তান মারতে থাকলে কিংবা অন্য সুরের সঙ্গে মিলতে চেয়ে মন্দ্রমধ্যম হওয়াকে অস্বীকার করলে সংগীতে যে-কাণ্ড ঘটে, আর্টেও সৌন্দর্য সম্বন্ধে সেই যথেচ্ছাচার উপস্থিত হয় যদি সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে একটা-কিছু মীমাংসায় না উপস্থিত হওয়া যায় আর্টিস্ট ও রসিকদের দিক দিয়ে। ধারা ভেঙে নদী যদি চলে শতমুখী ছোটছোট তরঙ্গের লীলা-খেলা শোভা-সৌন্দর্য নিয়ে তবে সে বড় নদী হয়ে উঠতে পারে না। এইজন্যে শিল্পে পূর্বতন ধারার সঙ্গে নতুন ধারাকে মিলিয়ে নতুন-নতুন সৌন্দর্যসৃষ্টির মুখে অগ্রসর হতে হয় আর্টের জগতে। সত্যই যে শক্তিমান সে পুরাতন প্রথাকে ঠেলে চলে, আর যে অশক্ত সে এই বাঁধা স্রোত বেয়ে, আস্তে-আস্তে বড় শিল্প রচনার ধারা ও সুরে সুর মিলিয়ে নিজের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করে চলে। বাইরে রেখায়-রেখায় বর্ণে-বর্ণে, ভিতরে ভাবে-ভাবে এবং সবশেষে রূপে ও ভাবে সুসঙ্গতি নিয়ে আর্টে সৌন্দর্য বিকাশ লাভ করেছে। যে ছবি লিখেছে, গান গেয়েছে, নৃত্য করেছে সে যেমন এটা সহজে বুঝতে পারবে, তেমন যারা শুধু সৌন্দর্য সম্বন্ধে পড়েছে, কি বক্তৃতা করেছে বা বক্তৃতা শুনেছে তারা তা পারবে না। সৌন্দর্যলোকের সিংহদ্বারের ভিতরদিকে চাবি, নিজের ভিতরদিক থেকে সিংহদ্বার খুলল তো বাইরের সৌন্দর্য এসে পৌঁছোল মন্দিরে এবং ভিতরের খবর বয়ে চলল বাইরে অবাধ স্রোতে—সুন্দর-অসুন্দরকে বোঝবার উৎকৃষ্ট উপায় প্রত্যেককে নিজে খুঁজে নিতে হয়।

অসুন্দর

মন সুন্দরের দিকে ফিরে-ফিরে চায়, অসুন্দরের দিক থেকে বারে-বারে সরে আসে—এই জানা কথা বেশি করে জানানো নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু যারি থেকে মন সরে পড়তে চায় তাই অসুন্দর নাও হতে পারে—হয়তো আমাদের নিজেদের দেখার ভুলে চোখের সামনে থাকতেও সুন্দরকে চিনতে পারলেম না এমন হওয়া বিচিত্র নয়। সুন্দরে-অসুন্দরে একটা পরিষ্কার ভেদাভেদ নির্ণয় করে দেওয়া কঠিন, ব্যক্তিগত রুচি ও অরুচির হিশেবে দেখে চললে।

বাইরে থেকে মনের মধ্যে সুন্দর যে-পথে আসছে অসুন্দরও সেই পথ ধরেই আনাগোনা করছে। বসন্তের হাওয়া গায়ে লাগে, আবার বসন্তরোগ সেও গায়ে লাগে—দুয়ের বেলাতেই শরীর কাঁটাও দিয়ে ওঠে, কিন্তু মন বিচার করে বলে এটা সুন্দর ওটা ভয়ঙ্কর বিশ্রী। দাঁতের বেদনা সুন্দর অবস্থা কেউ বলে না, এখানে ব্যক্তিগত রুচি নিয়ে কথাই ওঠে না, কিন্তু দাঁতগুলি কেমন তার বেলা রুচিভেদে তর্ক ওঠে।

চলিত কথায় মনের উপরে সুন্দর-অসুন্দরের ক্রিয়া ভারি সহজে বোঝানো হয়েছে। সুন্দরের বেলায় বলা হল জিনিশটি কি মানুষটি মনে ধরল, আর অসুন্দরের বেলায় বললেম, মনে ধরল না। প্রথমে বহিরিন্দ্রিয়ের বিষয় পরে মনের বিষয় হয়ে মনে রয়ে গেল সুন্দর, অসুন্দর বাইরের বিষয় হল, কিন্তু মনে তার স্থান হল না, পরিত্যক্ত হল মন থেকে অসুন্দর, মন মনে রাখতে চাইলে না অসুন্দরকে, এই হল নিয়ম।

মনের প্রহরী পাঁচ ইন্দ্রিয় সুতরাং প্রহরীর ভুলে অনেক সময় সুন্দর দরজা থেকে ফিরে যায় আর অসুন্দর চলে যায় সোজা বাসরঘরে! এটা ঘটতে দেখা গেছে দরোয়ান দূর করে দিলে পরম বন্ধুকে আর সোজা পথ ছেড়ে দিলে চাঁদাওয়ালাকে।

'হীরা হিরাইলরা কিচঁড়মে।' হীরা কাদার মধ্যে হারিয়ে রইল, চোখে পড়ল ঝকমকে কাচটা, এমন ঘটনাও ঘটে তো? এবং যাই ঝকঝকে তাই সোনা নয়—এ-কথাও বলতে হয়েছে রসিকদের যারা সুন্দরের সম্বন্ধে অন্ধ রইল তাদের শুনিয়ে।

অসুন্দরের মধ্যে একটা ভান থাকে, সুন্দরের কোনোরূপ ভান থাকে না—এটা লক্ষ্য করা গেছে। মিথ্যার আবরণে অসুন্দর নিজেকে আচ্ছাদন করে আসে, সুন্দর আসে অনাবৃত—সত্যের উপরে তার প্রতিষ্ঠা।

আর্ট যা তা সুন্দর ও সত্য, ভান যা তা অসুন্দর এবং অসত্য। আর্ট বস্তুর ও ভাবের সত্যটাই প্রকাশ করে, যা ভান তা শুধু বাইরের জিনিশটা দিয়ে ধোঁকা দিয়ে যায়, এজন্য একেকে বলি সুন্দর অন্যকে বলি অসুন্দর, একেকে বলি সত্য অন্যকে বলি অসত্য। এমনি সুন্দর-অসুন্দর সম্বন্ধে নানা মতামত রয়েছে দেখা যায়। মতামত জিনিশটা সময়ে-সময়ে খুব কাজে লাগে কিন্তু তার একটা দোষও আছে, সে দুর্গপ্রাকারের মতো ভারি শক্ত বস্তু এবং ভারি সীমাবদ্ধ করে দেখায় সুন্দর-অসুন্দর সব জিনিশকে; মতগুলো ছোট গণ্ডির মধ্যে বদ্ধ করে দেখায় বলেই মন সেখানে গিয়ে ধাক্কা খায়। তর্ক সৃজনের বেলায় মতামত কাজে আসে, রসসৃষ্টি সুন্দর কিন্তু সৃষ্টির বেলায় মত ধরে চলে না। অসুন্দর ধোঁকা দেয়

অসুন্দর ভ্রান্তি জন্মায় অসুন্দর অমঙ্গলের কারণ ইত্যাদি প্রচলিত মত সত্ত্বেও আমাদের অলঙ্কারশাস্ত্রের 'সন্দেহালঙ্কার' এবং 'ভ্রান্তিমৎ অলঙ্কার' দুটি অলঙ্কারের উল্লেখ রয়েছে—চলিত কথায় যার নাম ধোঁকা দেওয়া এবং উল্টো বুঝিয়ে দেওয়া। মতামত ধরে চললে এর মধ্যে সত্য সুন্দর ও মঙ্গল তিনের একটিও থাকতে পারে না—কিন্তু আর্ট, যার গোড়ার কথা হল সুন্দরকে দেখা ও দেখানো তার সব উপকরণ-প্রকরণ ভ্রান্তি উৎপাদন করেই চলেছে, মায়াপুরী সৃজন করে চলেছে সুর দিয়ে কথা দিয়ে রঙ দিয়ে, নশ্বরে করেছে অবিনশ্বরের আরোপ। খুব পাকা জাদুকরের চেয়ে আর্ট বেশি ভ্রান্তির সৃজন করছে—বিনা বীজে গাছ ফুল পাতা ফুটিয়ে ধরছে, চাঁদকে করে দিচ্ছে মানুষ, মানুষকে করে দিচ্ছে চাঁদ! সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের পক্ষে যেগুলো প্রকাণ্ড-প্রকাণ্ড বাধা তাই নিয়ে হচ্ছে রূপদক্ষ সকলের কারবার, সিঁধ দিচ্ছে এরা মতামতের দেয়ালে যে-কাঠিটি দিয়ে তার মুখে কালির মতো লেগে আছে এই মতবিরুদ্ধ যা-কিছু তা।

ছেলে একটা কাঠের ঘোড়া নিয়ে খেলতে বসেছে। সত্যিকার ঘোড়ার রঙ গড়ন-পিটন সমস্তই এখানে বাদ পড়ে গেল অথচ ছেলে বুড়ো সবাই দেখছে সেটিকে নিছক সুন্দর। ছেলে ঘোড়াটা পেয়ে খেলছে, সংসারের জিনিশ নয়-ছয় করছে না, হঠাৎ পড়ে গিয়ে হাত-পা ভাঙছে না, এইজন্য বলতে পারি ঘোড়াটি মঙ্গলের কারণ; কিন্তু সত্য তাকে তো ঘোড়ার মধ্যে কোথাও ধরা যাচ্ছে না, ছেলের কাছে যে সেটা সত্যি ঘোড়া তারও প্রমাণ পাচ্ছিনে, কেননা শুনছি ছেলেই দিচ্ছে খেলনাটার নাম 'বাঘামামা'। মতের বাঁধন অস্বীকার করে খেলার ঘোড়া অসুন্দর হল না, সুন্দরই ঠেকল ছেলের ও ঠাকুরদাদার চোখে।

সুন্দর সে শুধু-শুধুই সুন্দর, এ-কারণে সে-কারণে সুন্দর নয় এটা যেমন সত্যি তেমনি সত্যি অসুন্দর সে অসুন্দর বলেই অসুন্দর।

> নরা গজা বিশে শয়
> তার অর্ধ বাঁচে হয়।
> বাইশ বলদা তেরো ছাগলা
> তার অর্ধ বরা পাগলা।

এর মধ্যে সত্য অনেকখানি রয়েছে, মঙ্গলের কারণও এটার যথেষ্ট বিদ্যমান, কিন্তু সুন্দর কবিতা তো এটা হল না!

> দ্বাদশ অঙ্গুলী কাঠি, সূর্যমণ্ডলে দিয়া দিঠি।
> রবি কুড়ি সোমে ষোলো, পঞ্চদশ মঙ্গলে ভালো
> বুধ বৃহস্পতি এগারো বারো, শুক্র শনি চৌদ্দ তেরো।
> হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টশবশবশবণ লভ্য হবে।

পূর্ণ মঙ্গলের আবির্ভাব এখানে এ-কথা অস্বীকার করতে চাইনে, সত্যও আছে ধরে নিলেম কিন্তু সুন্দর তাঁর তো দেখা নেই বলতে হল!

এইবার একটি সুন্দর বচন শোনাই—

> ডাকয়ে পক্ষী না ছাড়ে বাসা
> উড়িয়ে বসে খাবে করি আশা
> ফিরে যায় নিজালয় না পায় দিশা
> খনা ডেকে বলে সেই সে ঊষা।

ঊষার সহজ সুন্দর বর্ণনা, এর মধ্যে কতটা সত্য কতটা মঙ্গল এসব মাপতে গেলে এর রসভঙ্গ হয়। বেদেও ঊষার বর্ণনা আছে, সে আর-এক ভাবের সুন্দর। অথচ এই খনার বচনের মধ্যে যেমন ঊষা কতক সত্য ঘটনা ধরে বর্ণনা করা হল ঠিক তেমনভাবে ঋষিরা ঊষার বর্ণনা করলেন না, সেখানে সত্য ও কল্পনা মিলেমিশে সুন্দর হয়ে দেখা দিলে। সুতরাং তর্ক-বিতর্ক করে সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা হওয়া আমার তো মনে হয় অসম্ভব ব্যাপার। ফোটা ফুল গন্ধ নিয়ে সুন্দর, না তার পাপড়িগুলির যথাযথ বিন্যাসটি নিয়ে, না তার ফোটার আদ্যন্ত রহস্য নিয়ে সুন্দর—এ তর্কের তো শেষ নেই। যাকে বলতে চাই অসুন্দর তার বেলাতেও এই কথা ওঠে—কেন অসুন্দর?

দীপশিখা সে যেমন ভয়ঙ্কর সত্য তেমনি ভয়ঙ্কর সুন্দর কিন্তু যেখানে সে ছেলের হাত পোড়ালে ঘরে আগুন ধরালে সেখানে সুন্দর বলে গৃহস্থ তাকে মনে করলে না। শান্তিনিকেতনে এমনি একটা লঙ্কাকাণ্ড দেখে আমার একটি ছাত্র এতটা মুগ্ধ হয়েছিলেন যে একটি চমৎকার সুন্দর ছবি পরদিনের ডাকেই আমার কাছে এসে পড়েছিল। যদি আর্টিস্টের নিজের ঘরে এই কাণ্ডটা ঘটত তবে তিনি নিশ্চয় সুন্দর দেখতেন না অগ্নিকাণ্ডটি। এখানে দেখলেম, সুন্দর তিনি অমঙ্গলের রাজবেশ ধরে দেখা দিলেন আর্টিস্টকে, আর এ-কথাও তো মিথ্যা নয় এই 'রাজবৎ উদ্ধতদ্যুতি' অগ্নিশিখাগুলি তার কাছে সে-রাত্রে ভারি অসুন্দর ঠেকেছিল যার ঘরদ্বার পুড়ে ছাই হচ্ছিল। একের পক্ষে যা অসুন্দর হল তার স্বার্থে ঘা দিচ্ছে বলে, অন্যের পক্ষে তাই সুন্দর হয়ে দেখা দিলে স্বার্থে ঘা দিলে না বলে। অগ্নিকাণ্ডের ছবিখানা কিন্তু এই দুই মানসিক অবস্থার বাইরের জিনিশ হয়ে তবেই সুন্দর হল, যাদের ঘর পুড়ল তাদের কাছে, যাদের ঘর পুড়ল না তাদেরও কাছে। প্রকৃতির মধ্যে আসল ঘর-পোড়ার সময়ে যে-অমঙ্গলের আশঙ্কা মনকে বিমুখ কচ্ছিল, ছবির অগ্নিশিখার লেলিহান উজ্জ্বল ছন্দটি থেকে সেটি বাদ গেল, রইল শুধু দৃশ্যটির সৌন্দর্য ও রস, কাজেই সুন্দর ঠেকল। এইভাবে আর-একটি সদ্য-জবাই-করা মোরগের ছবি ভয়ঙ্কর সত্যরূপে এঁকে এনেছিল আমার সামনে আমার আর-এক ছাত্র। ভারি বিশ্রী ঠেকল সে-ছবি, আমার সইল না মনেও ধরল না, চোখের কাছে এসেই ঠিকরে পড়ল মাটিতে। এখন যদি বলা যায় এ ছবি নিশ্চয় সুন্দর ঠেকবে অন্যের কাছে, এর জবাব কী দেব?—হাঁ সুন্দর ঠেকবে এই কথাই কি বলতে হবে না? আমাকে যেভাবে ছবিটা পীড়া দিলে যেভাবে অন্যকে নাও দিতে পারে, সুতরাং আমার অসুন্দর অন্যের সুন্দর এটা বলা চলল।

বিশ্বের কতকগুলো জিনিশকে মানুষের মন বিনাতর্কে সুন্দর বলে মেনে নিয়েছে, কতকগুলো জিনিশকে বলে গিয়েছে অসুন্দর। কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কতক জিনিশ সুন্দর বলে প্রশংসা পেয়েছে, কতক জিনিশ এ-পরীক্ষায় এখনো উত্তীর্ণ হয়নি, সেগুলো রয়ে গেছে অসুন্দর। হয়তো দেখব এইসব অসুন্দর হঠাৎ একদিন পরীক্ষা পাস হয়ে গেছে, ওস্তাদের এবং কারিগরের হাতে পড়ে তারা সুন্দর হয়ে উঠেছে, ধুলো-মুঠো হয়ে গেছে সোনা-মুঠো!

বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে দুটি-তিনটি কারিগর রয়েছে এক ওস্তাদের তাঁবেদার, তারা সকালে আসে সন্ধ্যায় আসে দিনে আসে রাতে আসে—আলো-অন্ধকারের অধিবাসের ডালা নানা সাজসজ্জার উপকরণে ভরে নিয়ে। সৃষ্টির জিনিশকে নতুন-নতুন সুন্দর সাজে সাজিয়ে চলাই তাদের কাজ। কোনোদিন অবেলায় আফিসঘরে চুপি-চুপি ঢুকে দেখলে দেখা যায়, সেখানে এসেও এই কারিগর কয়জন অতি অসুন্দর দোয়াত কলম খাতাপত্র টেবিল চেয়ার এমনকি বেহারার ঝাড়নটাকে পর্যন্ত চমৎকার আলো নয়তো চমৎকার ছায়া দিয়ে আশ্চর্য

সৌন্দর্য দিয়ে গেছে—সেই আলো-অন্ধকারের রহস্য; তার মাঝে কালো যে হতভাগা বেড়ালছানাটাকে ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেম সে এসে ঘুমিয়ে আছে অপূর্ব সাজ ধরে রূপকথার বেড়াল রাজকন্যাটির মতো।

যার মধ্যদিয়ে কোনো রহস্য গতাগতি করছে না, যার মধ্যে কোনো বৈচিত্র্য পলকে-পলকে বদল ঘটাচ্ছে না এমন জিনিশ যদি কোথাও থাকে তো সেইটিই অসুন্দর এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে। যা চরিত্রবিহীন তা অসুন্দর। চরিত্র-বিষয়ে একেবারে নিঃস্ব এমন কী জিনিশ আছে তা খুঁজে পাইনে; এটুকু বলা যায় যা তার চারিদিকের সঙ্গে যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন, কটু কি মধু আমাদের কোনো স্বাদই দেয় না—তা আমাদের কাছে থেকেও নেই। বিস্বাদ যা তারও একটা স্বাদ আছে, যার চরিত্র নেই একেবারেই, যা কোনো স্বাদই দেয় না, এমন কিছু থাকে তো তাকেই বলি অসুন্দর। এর চেয়ে পরিষ্কারভাবে অসুন্দরকে দেখানোই শক্ত, কেননা জগতে সুন্দর-অসুন্দর একটা পরিষ্কার ব্যবধান নিয়ে বর্তমান নেই, সুন্দরে-অসুন্দরে মিলে এখানে লীলা চলেছে। যার কোনো শ্রী নেই তো বিশ্রী এটা ভারি সহজ কথা, কিন্তু একেবারে চরিত্রহীন স্বাদহীন শ্রীহীন তাকে কোথায় খুঁজে পাই তা কি কেউ বলে দিতে পারে? আমি কিছুদিন আগে অসুখে পড়ে আবার আস্তে-আস্তে সেরে উঠলেম, সেই সময়ে আমার এক হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বন্ধু এসে আমার কাজকর্ম ছবি-আঁকা বই-লেখা গানবাজনা গল্পগুজব সমস্ত বন্ধ করে আমাকে নিরবচ্ছিন্ন বিস্বাদ জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে উপদেশ দিলেন। শুনে আমার বুকের রক্ত তার সব রঙ হারিয়ে হোমিওপ্যাথি ওষুধের একটি ফোঁটাতে পরিণত হবার যোগাড় হল। দেখলেম ভারি বিশ্রী সেই মনের অবস্থা—এর চেয়ে অসুন্দর কোনোকিছুকে বোধ করিনি আর কোনোদিন।

এই ভাবের অবিচিত্র জীবনযাত্রা অনেক মানুষকে-যে নির্বাহ করতে হচ্ছে না তা নয়। একটা কাজ করতে-করতে কাজ করার স্বাদ ক্রমে ক্ষয় হয়ে গেল, তখন কলের মতো কাজ করে চলল জীবন্ত মানুষ—আফিসে যায় সংসারের ভার বয় ছবি কবিতাও লেখে, কিন্তু কোনোকিছুরই স্বাদ পায় না মনরসনা। ছেলেগুলো নিত্য পাঠশালায় যে যেতে চায় না তার কারণ পড়তে যাওয়া-আসার সঙ্গে পড়ারও স্বাদ পাচ্ছে না ছেলেগুলি, সেই সময়ে তাদের মন উড়ু-উড়ু করতে থাকল এমন যে, তারা দেবতার কাছে নানা অসুন্দর ও অশুভ কামনা জানায়, নিজে হঠাৎ বুড়ো হোক বুড়ো মাস্টার হঠাৎ মরুক ইত্যাদি ইত্যাদি—যে কটি অসুন্দরকে দেখে বুদ্ধদেবও ডরিয়েছিলেন, তাদের ভারি সুন্দর দেখলে ছেলেগুলি। শুভ যা তা সুন্দর, অশুভ যা তা অসুন্দর, এমনি একটা মত আছে। যখন দেখছি কোনো একটি পতঙ্গের কাছে রাত্রির অন্ধকার ভালো ঠেকল না, সে গিয়ে আত্মবিসর্জন করলে আগুনের কাছে, বলি যে, আগুন তাকে পোড়ায়নি সোনার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছিল তার দুখানি ডানা। প্রেমের সুন্দর অগ্নিশিখা নয়, এ-যে অসুন্দর মৃত্যুর লেলিহান জিহ্বা, সেটা বোঝারও সময় পেলে না পতঙ্গটি—এমনি হতভাগ্য। কিন্তু সতীদাহের বেলায় এ-কথা কোনোদিন কেউ বলেনি বরং ওটা দর্শনীয় বলেই দেখতে ছুটত লোকে। রুচি অনুসারে একই জিনিশ সুন্দর বা অসুন্দর আস্বাদ দেয়। চীনে বাড়িতে গিয়ে দেখলেম এক সুন্দর কাচের বাটিতে ছেলেরা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে, বাটিটা সুন্দর লাগল, আহার্যের গন্ধটা কিন্তু চেনা নয় বলেই আমার নাকে ভারি অসুন্দর ঠেকল। এই ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি ইত্যাদির উপরে যে-রচনা উঠতে পারলে তাই যথার্থ সুন্দর হয়ে উঠল। মানুষ যখন নিজেই একটি ব্যক্তি তখন এই ব্যক্তিগত রুচি-অরুচি লোপ করে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষভাবে কিছু

রচনা করা তার পক্ষে অসম্ভব। রচনার বিষয়-নির্বাচন সেও রুচি অনুসারে করে চলে মানুষ; যে চা নিজের জন্য প্রস্তুত করা গেল সে আমার রুচি অনুসারে চিনি দুধ না দিয়ে যেমন-তেমন পাত্রে খেলেও কারো কিছু বলবার নেই, কিন্তু পরকে যেখানে নিমন্ত্রণ দিচ্ছি সেখানে পরের মুখ অনেকখানি চেয়ে কাজটি নিষ্পন্ন করতে হয়, না হলে ব্যাপার পণ্ড হতেও পারে। ঘরে মেয়ে যেমন-তেমন সেজে বেড়াচ্ছে কারো দৃষ্টি পড়ে না সেদিকে, ঘরের মধ্যে একটি বাইরের লোক আসার খবর আসুক তখন মেয়েটাকে সুন্দর করতে তার ঝুঁটি ধরে টানাটানি পড়ে যায়। মেয়েটা সেজেগুজে মুখ দেখাতে চলেছে এমন সময় কাঁচি দিয়ে যদি তার বেনে-খোঁপাটি কেটে দেওয়া যায় তবে যদি মেয়েটি সত্যিই সুন্দরী হয় তবে একটু কাণাভাঙা সুন্দর পেয়ালাটির মতো চোখেই পড়ে না তার রূপের এই সামান্য খুঁত, কিন্তু শুধু সাজের দ্বারাই যাকে সুন্দর দেখাচ্ছে তার পক্ষে বেণীসংহারের মতো এমন দুর্ঘটনা আর-কিছু হতে পারে না। মেয়েরা সৌন্দর্য সম্বন্ধে কোনো পুঁথি পড়ে না অথচ তাদের হাতে দেখি সাজাবার ও দেখাবার সুন্দর এবং আশ্চর্য কৌশলসমস্ত কেমন করে এসে গেছে আপনা হতেই।

সব সুন্দর-রচয়িতা আপনাকে গোপন রাখে, অসুন্দর সে নিজেই এগিয়ে আসে। ফুল কতখানি সুন্দর হয়ে ফোটে তা সে নিজেই জানে না, প্রজাপতি জানে না যে কতখানি সুন্দর তার গতাগতি, শামুক জানে না যে তাজমহলের চেয়ে আশ্চর্য সমাধি গড়ে যাচ্ছে সে! যে-কাজে রচয়িতা 'কেমনটা বানিয়েছি' এইটুকুই প্রকাশ করে গেল সে-কাজ অসুন্দর হল—এর নির্দশন আমাদের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। সেখানে প্রত্যেক পাথর কী কৌশলে একের পর আর স্তূপাকার করে তোলা হয়েছে এইটেই দেখা যায়। কারিগর তার তোড়জোড় নিয়ে সামনে দাঁড়িয়েছে বুক ফুলিয়ে, কিন্তু তাজমহল সেখানে কারিগর কেমন করে পাথরগুলো কোন্ কোন্ খানে জুড়েছে তার হিশেবটিও যতটা সম্ভব মুছে দিয়ে তার সৃষ্টিটাকে এগিয়ে আসতে দিয়েছে সামনে। কাজের থেকে এতখানি আপনাকে লোপ করে দিতে যে না পারলে সে অসুন্দর কাজ করলে। বাড়ির কর্তা যেখানে অভ্যাগতকে আসন দিলে না, নিজেই গট হয়ে জায়গা জুড়ে বসল, সেখানে উৎসব তার পরিপূর্ণ রূপ নিয়ে দেখা দিলে না। এই ভাবের অপূর্ণতা ভারি বিশ্রী জিনিশ। বিয়ের রাতে বর-কনেকে উত্তম আসন দিয়ে গুরুজনেরাও নিম্ন আসনে বসেন, সুন্দর রসের নায়ক-নায়িকার স্থান অধিকার করে বলেই তারা দুটিতে বরেণ্যদেরও বরেণ্য হয়ে বর্তমান হয় সে-রাতে।

বিশ্বের তাবৎ জিনিশের সংস্থানের মধ্যে এই উত্তমাধম বিচারের নিদর্শন স্পষ্ট ধরা যায়। যে আলো দেবে তার স্থান হল উচ্চে, যে সেই আলো পেয়ে সুন্দর হবে তার স্থান হল নিচে। সকল দেশের রঙ্গমঞ্চ থেকে ফুটলাইট এখন উঠে যাচ্ছে যে তার একটা কারণ নিচের আলোতে অভিনেতাদের মুখ ভারি অসুন্দর ঠেকে, সত্যিই চোখে পীড়া দেয় ও সৌন্দর্যহানি ঘটায়। তাই আলোককে উত্তম স্থান দিতে চাচ্ছেন অভিনেতারা। প্রকৃতির দৃশ্যের মধ্যে এই উত্তমাধম ইত্যাদির সম্বন্ধে বিচারের ভুল দু-এক জায়গায় ঘটতে দেখা যায়। সূর্য যখন আপনাকে খুব অনেকখানি সরিয়ে রেখে জল স্থল আলোকিত করছেন তখন বিশ্বরচনা একটা অপরূপ সৌন্দর্য ও সুষমা নিয়ে চোখে পড়ছে, কিন্তু নদীর জলে সূর্য যখন নিজেকেই প্রখরতর করে ফোটাচ্ছেন তখন চক্ষের পীড়া উৎপাদন করছেন তিনি। চাঁদ সুন্দর আলো ফেলতে জানে জলে স্থলে বলেই কখনো এমন ভুলটা করে না। প্রদীপের আলো তারার আলো এরা জানে নিজেদের অপ্রধান রেখে আলো দেওয়ার রহস্য, বিদ্যুতের আলো যাকে মানুষ ঘরে আনলে সে এ-রহস্য জানে না, চক্ষের পীড়া দেখতে-

দেখতে জন্মিয়ে দেয়—কাজেই সেই অসুন্দর আলোকে সুন্দর দেখবার জন্যে মানুষ তার উপরে নানারকম ঘোমটা পরিয়ে দিয়ে চলেছে। বাজারে ছবিগুলির রঙ চঙ ও কায়দা-কানুন ছবিটাকে পিছনে ঠেলে ফেলে এগিয়ে আসে, সেই কারণে আর্টিস্টের কাছে ভারি অসুন্দর ঠেকে সেগুলো, কালোয়াতি আসলে গান সুর ইত্যাদিকে ঠেলে কালোয়াতটিকেই ঘাড়ের উপর ঠেলে দেবার চেষ্টা করে, সেজন্যেই তা অসুন্দর। পাতাটি ফুলটি গাছ থেকে খসে পড়েছে—তারা নিজেদের পড়ার ছন্দটি বাতাসের ছন্দে লুকিয়ে রেখে পড়ছে, তাই সুন্দর ঠেকে তাদের গতি। গাছের তাল বাতাস ছিঁড়ে ধুপ করে পড়ে জানাচ্ছে 'আমি পড়লেম', তাই ভারি অসুন্দর ও বেতালা তার ছন্দ। জলের মধ্যে ঢিলটা পড়ল, ঢিলটার কেউ খোঁজ রাখে না, কী সুন্দর ছন্দে জল দুলে চলল, তাই দেখে লোকে। বায়স্কোপের মধ্যদিয়ে ফুল ফোটার ফুলের ঘুমের ফুলের জাগরণের ছবি দেখেছি— ভারি বিস্ময়কর দৃশ্য—কী সহজে প্রত্যেক পাপড়ি একটির পর একটি খুলল, বন্ধ হল, কত সহজে শিকড়গুলো দৌড়ে চলল জলের সন্ধানে, সুন্দরী নর্তকীর মতো চমৎকার তার হাবভাব, সবই ভালো লাগল, কিন্তু আসল ফুল ফোটানোর বেলায় ঝরানোর বেলায় সেগুলো গোপন রইল। সেই চলাচল ও কৌশলগুলোই বেশি করে পড়ল বায়স্কোপের মধ্যদিয়ে চোখে, কাজেই আর্ট হিশেবে অসুন্দর ঠেকল সমস্তটি আমার কাছে।

বিশ্বরচনার মধ্যে দেখতে পাই সুন্দর আছে অসুন্দরও আছে—ওদিকে কাকচক্ষু নির্মল জল, এদিকে পানা পুকুর। মানুষ এ-দুটোকে আলাদা করে দেখে বলেই তুলনায় দেখে একটা সুন্দর অন্যটা অসুন্দর, কিন্তু বিশ্বরচয়িতা এ-দুটিকেই সৌন্দর্য-ফোটানোর কাজে লাগাচ্ছেন। রূপদক্ষদের কারবার দেখি সুন্দর-অসুন্দর দুইকে নিয়ে। গত বছরের গ্রহণের দিনে শান্তিনিকেতনের পূর্ণিমা-উৎসব ফেলে একা চলে আসছি, রসিকের হাত ধরে সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটল না মনে এই দুঃখ বাজছে সারা পথ, কিন্তু যিনি কবিরও কবি তিনি হঠাৎ একসময়ে রেলের ধারে-ধারে যতগুলি খানা ডোবা ছিল সবাইকে চাঁদের আলোর শাড়ি পরিয়ে আমার চোখের সামনে উপস্থিত করলেন। এই বিস্ময়কর ঘটনা অসুন্দরকে কেমন করে সুন্দর করে তুলতে হয় তা আমাকে একমুহূর্তে শিখিয়ে গেল। তারপর দেখলেম আর্টিস্ট তিনি চাঁদের মুখের সমস্ত আলো মুছে নিলেন, ধরিত্রীর আঁধার-করা ঘরে দেখলেম তাঁর কতকালের হারানো কন্যা ফিরে এল, সূর্যের-দেওয়া আলোময় সাজ ছেড়ে শ্যামাঙ্গিনী সেই ঘরের মেয়েটির দিকে চুপ করে অন্ধকারে চেয়ে রয়েছেন দেখলেম আমাদের জননী যিনি তিনি। সুন্দর-অসুন্দরের রাসলীলার এই মুহূর্তগুলি কী অপূর্ব স্বাদই রেখে গেল মনে।

রূপ

রূপের ভেদাভেদ-জ্ঞান ও রহস্য প্রকাশ হল আর্টিস্টের কাজ, এইজন্যে 'আর্টিস্ট' কথার ঠিক প্রতিশব্দ হল 'রূপদক্ষ'। কুঠার ঠিকরূপে গড়া হল তবেই সে কাটলে ঠিকমতো। প্রথম আর্টিস্ট যখন কুঠার গড়লে তখন সে কুঠারের বাইরের আকৃতিটা ও মান-পরিমাণ হয়তো একরকম দিলে, কিন্তু যে-ধাতুতে কুঠার গড়লে ঠিক কাটবে কুঠার জলের মতো সেটুকুর জন্যে অনেকদিন ধরে অনেক রূপদক্ষের জন্মানো এবং মরার অপেক্ষা ছিল এ- কথা ঠিক। শুধু এই একটিমাত্র কুঠাররূপ নয়, নানা প্রহরণ তারি নানা রূপভেদ এও এক-এক আর্টিস্ট এসে দখল করলে যুগে-যুগে—ক্ষুরপ্র বাণ অর্ধচন্দ্র বাণ শিলীমুখ কত কী রূপের ভেদ। বাঁশপাতা গাছের কাঁটা পাখির পালক সবাই উপদেশ করলে রূপভেদের। রূপটি ঠিক হল তবেই চলল তীর ঠিক লক্ষ্যস্থান ভেদ করতে। রূপটি এমন হল সে এমন করে বিঁধলে, অমন হল রূপ বিঁধলে তেমন করে। সহজ কথা—সুরটি ঠিক বসল গলায়, রাগটি পেলে ঠিক রূপটি, ছন্দ পেলে ঠিক কথা, কথা পেলে ঠিক ছন্দ—কবির কল্পিত রূপটি ঠিক ফুটল তখন। উপযুক্ত রূপ অনুপযুক্ত রূপ এ-কথা আর্টে খাটে কিন্তু সুরূপ কুরূপ বলে স্বতন্ত্র দুটো রূপ আর্টিস্টের কাছে নেই; তার কাছে আছে শুধু নানা রূপ—কোনোটা এ-কাজে উপযোগী সে-কাজে অনুপযোগী এইরকম। যেমন বাঁকাকে নিয়ে তীর গড়া চলল না, তীরের অনুপযোগী সে, আবার ধনুকের বেলায় বাঁকাই যত বাঁকল ততই দেখতেও হল চমৎকার, কাজও দিলে সুন্দর। তীর সোজা ধনুক বাঁকা—সোজাতে বাঁকাতে মিলন, একই ক্ষেত্রে রূপের ভেদ ও অভেদ। এমনি ভেদাভেদ সে সংগীতে সে কবিতায় রূপ ধরে প্রকাশ পায় কথার পারপেঁচ সুরের ঘোরপেঁচ নিয়ে। বাঁকা দিলে এক রূপ, সোজা দিলে অন্য, বাঁকায়-বাঁকায় মিলে এক রূপ, সোজায়-বাঁকায় মিলে অন্য,—এমনি নানা ভেদ রূপের। মেঘের উপরে ইন্দ্রধনু—সে একটিমাত্র রঙিন আলোর বাঁক, তার সঙ্গে আর-একটা উপযুক্তরকম সোজা তীর তো জোড়া হল না; শুধু আলো অন্ধকার রৌদ্র ও মেঘের ভেদাভেদ নিয়ে সুন্দর ফুটল রূপটি বর্ণপ্রধান ও বাঁকা। সমুদ্রতীরে রূপের ভেদাভেদ শব্দ ধরে ফুটল আর স্থিতি ও গতি ধরে ফুটল ঠিক সংগীতের মতোই আকাশ—নিস্তব্ধ নিথর নীল এবং সমুদ্র—সচল সশব্দ নীল।

সূর্যের কিরণচ্ছটায় বাঁকায়-সোজায় মিলিত রূপ, গাড়ির চাকায় বাঁকার কোলে সোজা। ঢেউয়ের পরে ঢেউ সেখানে বাঁকায়-বাঁকায় মিলন, সারি-সারি তালগাছে বৃষ্টিধারা পড়ছে অবিশ্রান্ত—সোজায়-সোজায় মিল। রূপের ঘেরে বন্দি আমরা গোড়া থেকেই, এই বাঁধন থেকে মুক্তি হচ্ছে রূপমুক্তির সাধনা রূপকারের।

যে রূপসমস্ত নিয়ে রূপকারের কারবার তারা বাঁধা-রূপ, আর্টিস্ট তাদের মুক্তি দিলে তবেই তারা পথ পেলেন মন থেকে মনে চলাচলি করবার। রূপসাগরের তলায় সুপ্তি দিয়ে বন্ধ করা রূপকথার রাজকন্যা, রূপমুক্তির সাধনা হল তাকে জাগিয়ে আনা। রেখা মুক্তি পেলে তো রঙ ধরে বাঁধা-রূপের প্রাচীর টপকে সে ভাবরাজত্বে পালাল বন্দি।

কথা থাকে অর্থ দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, কবি তাকে মুক্তি দেন তবে জানায় সে বেদনা গুঞ্জন করে ভ্রমরের মতো হৃদয়পদ্মের পাপড়ি খোলাতে, তখন আর শুধু থাকে না কথা

আর তার অভিধানদোরস্ত মানেটা। যেমন এই 'বাচ্চা' কথাটিতে সে সর্বজীবে সর্বকালেই বাচ্চা এইটেই বুঝায়, কিন্তু এই বাচ্চারূপী কথাটি মুক্তি পেলে যেমনি বলা হল বাছা বাছনি! যেমন জুতো সে মুক্তি পেলে বাঁধা-রূপ থেকে জুতুয়াতে, পাট—পট্ট—পট একই কথা কিন্তু রূপ দেখায় স্বতন্ত্র, তেমনি অসংখ্য কথা ছাড়া পেয়ে গেছে ও যাচ্ছে কবির হাতে বদ্ধ রূপের শিকলকাটা পাখিসমস্ত।

সংগীতে স্বরমালা সাতরাজার ধন সাতটি মাত্র, কিন্তু সাতাশ লক্ষেরও বেশি রূপ পেয়ে ঝলক দেয় সাতসুর—গুণীর কণ্ঠে অপূর্ব সাতনরী হার! উৎসঙ্গে লীনা বীণা সে মুক্তস্বরা, তাকে পরিত্যাগ করে নির্গুণ যখন চলেন একটা বাক্সে-বাঁধা সারগমের অচল ঠাটের মধ্যে গলাটা বলিদান দিয়ে গান গাইতে, তখন রাগ রূপ সমস্ত তারা মুক্তির স্পর্শ পায় না কিন্তু ছাঁদ পায় বাক্সের ও সিন্দুকের, তেমনি এই অ্যানাটমির কিংবা ফটোযন্ত্রের বাক্সের মধ্যে হাতের টান ও মনের পরশ মিলিয়ে টানার কথা—সেসব রঙ রেখা তাদের যখন ঢালাই হতে দেখি তখন দেখি রূপ পাচ্ছে অ্যানাটমি ও পার্‌স্‌পেকটিভ কিন্তু পরশ পাচ্ছে না একটুকুও মুক্তির।

যখন প্রাচীন প্রথার মধ্যে কিংবা আধুনিক কোনো বাঁধা-প্রথায় রূপকে ঢালাই হতে দেখি তখন আমার আতঙ্কের সীমা থাকে না—জলের মাছকে বঁড়শি দিয়ে গেঁথে হাঁড়ির মধ্যে মুক্তি দেওয়ার মতো ঠেকে ব্যাপারটি। রূপ-সাধককে এই রকমের নিষ্ঠুর খেলা খেলতে হয়, শুধু রূপবদ্ধ হলে কী হয় আর ছাড়া পেলেই বা কী হয় তা জানার বেলায়, কিন্তু রূপসমস্তকে রসের স্পর্শে মুক্তি দেওয়াতেই রূপদক্ষের আনন্দ ও চরম সার্থকতা এ কে না বলবে!

একটা মাটির ঢেলা এক চাংড়া পাথর তাদের রূপ নিরেট করে বাঁধা নিয়তির নিয়মে—একেবারে সুনির্দিষ্ট রূপ, কিন্তু সেই ঢেলা আর পাথর রূপদক্ষের কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে যখন আসে অপরূপ সব মূর্তি ধরে, তখন মানুষ তার পুজো দেয়, তাকে প্রেমালিঙ্গন দেয়, খেলা করে মাটি পাথর মানুষের সঙ্গে। পাষাণ দিলে বর অভয়, পাষাণ দিলে ভিজিয়ে মন—এ অঘটন কি ঘটত যদি-না সুহস্ত রূপদক্ষ তাঁরা পাষাণকে তার জড়ত্বের কঠিন কারাগার থেকে মুক্তি না দিতেন! অনড় পাথর নটরাজ মূর্তিতে নাচল, অচেতন পাষাণ সে-চেতনার স্পর্শে আর-এক জীবন্ত সুন্দর মূর্তির মতোই চমকে উঠল থমকে দাঁড়াল। নবজীবন দিলে রূপদক্ষ তাদের। যেখানে আলো সেখানে অন্ধকার, যেখানে সোজা সেখানে বাঁকা, জড় পাষাণের কাঠিন্যের সঙ্গে মেশা সজীবতার তারল্য, এই ছন্দ রূপের জগতে মানুষ প্রথম এসেই লাভ করেছে সহজে, এই বাতাসের মতো সহজে। এ ছন্দ ভাঙলেই সর্বনাশ! এই কাঠিন্য এবং তারল্যের ছন্দে গাঁথা মানুষের পা থেকে মাথা পর্যন্ত সবটাই। দূরের পাহাড় সে জানায় এই ছন্দটি। চাঁদ সে আলো অন্ধকারের ছন্দ ধরে সুন্দর, রাত্রি ঘিরে আছে, তবেই পূর্ণচন্দ্রের রূপ আছে, প্রতিপদের চাঁদ সে আর-এক ছন্দ ধরে মনের আকাশে ভাবরূপে বিদ্যমান হল—সে আছে অথচ নেইও। এই ছন্দ। ছবিতে মূর্তিতে কবিতায় গানে শুধু ফুটন্ত রূপ নিয়ে কারবার নয় আর্টিস্টের—দেখা না-দেখা দুই রূপ মিললে তবে ছন্দোময় হয় কাজ। ফটোগ্রাফ শুধু দৃশ্য-রূপের মধ্যে বদ্ধ, কাজেই ছন্দ ছাড়া রূপ দিয়ে চলে সে। রেখার কাঠিন্য ও রেখার তারল্য—এই নিয়ে অঙ্কনের ছন্দ, সুরের কাঠিন্য মিলল গিয়ে মিড়ের তারল্যে এই হল গায়নের ছন্দ। সবদিকেই রূপ দেবার বেলায় এই ছন্দ না-ধরে উপায় নেই।

'চক্ষুর্গ্রাহ্যং ভবেদ্রূপম্‌' কিংবা 'ননু রূপাণি পশ্যন্তি'। দৃশ্য রূপের কঠিন অংশের সম্বন্ধে এ-কথা খাটল, কিন্তু যেসব রূপ মনে গিয়ে পৌঁছচ্ছে চোখে পড়ছে না, কিন্তু অনির্বচনীয় স্পর্শটুকুর উপরে যার নির্ভর এমন সব তরল রূপ? তার বেলায় মনশ্চক্ষু প্রাণরসনা ইত্যাদি না নিয়ে সেখানে কাজ চলল না। রূপের এই রহস্য জেনেই বাউল কবি বলেছেন—

চোখে দেখে প্রাণে ঠেকে ধুলো আর মাটি
প্রাণ রসনায় দেখরে চাইখ্যা রসের শাইখ্যাটি!

চোখে দেখি এক রূপ প্রাণে দেখি অন্য রূপ, এই হল রূপের দুই প্রকাশ। দৃষ্টির পথে যেমনি চোখাচোখি অমনি অভিসার রসরূপে মানসকুঞ্জে। হয়তো সে একটি রূপ যৌবনে পরিপূর্ণ, হয়তো সে একটি রূপ ন্যুব্জ কুব্জ জরাজীর্ণ, হয়তো সে একটি গাছের তলায় হরিণশিশু, হয়তো সে একটা ছাতামাথায় ব্যাঙ, কিন্তু দৃষ্টিপথ ধরে মনে পৌঁছোল কী সেটি রসের বস্তু হল রূপদক্ষের কাছে—

সই কিবা সে সুন্দর রূপ
চাহিতে চাহিতে পশি গেল চিতে
বড়ই রসের কূপ।

মানুষের মন বা চিত্তপট তো ক্যামেরার প্লেট নয় যে চোখ খুললেই ধরলে ছবি বুকে, কার কাছে কী যে মনোরম ঠেকে, কোন্ রূপটা কখনই বা প্রাণে লাগে তার বাঁধাবাঁধি আইন একেবারেই নেই; কিন্তু মনে না-ধরলে সুন্দর হল না, মনে ধরলে তবেই সুন্দর হল—এ নিয়ম অকাট্য। 'মনের মানুষ মনের মতো ঘরখানিতে'—এ তো কথার কথা নয়। রূপের ঠাট এক বাইরের মতো আর-এক মনের মতো, ফটো দেয় বাইরের ঠাট রূপদক্ষ দেন মনোমতো রূপের ঠাটসমস্ত।

উটের কিংবা পেঁচার ও ব্যাঙের বাইরের ঠাট বিধাতার মনোমতো হলেও সাধারণ লোকে দূর-দূর করলে দেখে। তবেই বলি সাধারণ মানুষের মনোমতো হবার মতো রূপ পেলে না তারা, কিন্তু রূপদক্ষের রূপসৃষ্টির নিয়ম—যা হল নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র—তার রসে উটের রূপ পেঁচার রূপ ব্যাঙের রূপ সুন্দর হল মনোমতো হল, সুন্দর তাকে ব্যঙ্গ করলে না একজনও।

একটা ক্যামেরা সে রূপকে ধরে নেয় ঠিক, কিন্তু রূপসৃষ্টির নিয়ম সে মানে না, পদার্থবিদ্যার জল বাতাস আলো ছায়ার অকাট্য নিয়ম মানে। তবুও সে কি ঠিক উট-পেঁচাটাই ঠিকভাবে দেয়?—সৃষ্ট রূপের একটা-একটা অপদার্থ নকল দেয় মাত্র। নিয়তির নিয়মে সৃষ্টির কিছুতে পুনরুক্তি হতে পারে না। কিন্তু কল সে বিজ্ঞানসম্মত নিয়মে এক জিনিশের হাজার-হাজার পুনরুক্তি করে চলেছে সুতরাং এ হিশেবে সে নিয়ম লঙ্ঘন করছে কিন্তু স্বতন্ত্র কোনো এমন একটা নিয়ম নেই তার যার দ্বারা রূপসৃষ্টি করতে পারছে সে।

নিয়তিকৃত নিয়ম থেকে স্বতন্ত্র অথচ নিয়তির নিয়ম থেকেই নেওয়া সমস্ত রূপকারের কারিগরির নিয়ম। পাষাণ তার একটা আকৃতি আছে বর্ণও আছে কাঠিন্য ইত্যাদি গুণও আছে কিন্তু চেতনা নেই, সুতরাং তার সুখ দুঃখ মান অভিমান কিছুই নেই—এই হল নিয়তির নিয়মে-গড়া সে পাষাণ, কিন্তু রূপদক্ষের কাছে পাষাণী অহল্যা নিয়তিকৃত নিয়মের থেকে স্বতন্ত্র নিয়মে যখন রূপ পেলে তখন সে পাষাণ কিন্তু তার সুখ দুঃখ মান অভিমান জীবন মৃত্যু সবই আছে। যে মাটির খেলনা গড়লে সে মাটিকে জড়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের খেলার সাথীরূপে ছেড়ে দিলে।

পাষাণে-গাঁথা গোসাঘর তার মধ্যে ধরা রূপবান রূপবতী, হাতুড়ির ঘায়ে তবে ভাঙে সে গোসাঘরের দেওয়াল, তারপর পাথরের মান ভাঙাতে অসাধ্য সাধন। মাটির দেওয়াল, তার মধ্যে লুকিয়ে আছে রূপ; সেও অভিমানে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজে কি বেরিয়ে এল? সোনা সে কি কম জ্বালালে আর্টিস্টকে? হীরক যাকে বলো বজ্রমণি সে বজ্রের মতো দুর্জয়, তাকে মানিয়ে তবে দিতে হল হীরের ফুল ফুটিয়ে। বিধাতার নিয়মে বাঁধা রূপজগৎ তার মধ্যেই

আর-একটা জগৎ যেটা আপনার নিয়মে চলেছে অথচ সেটা সত্যকার রূপজগৎ—বিশ্বামিত্রের ব্যাসকাশীর মতো ভুয়ো জগৎ নয়, সেখানে সত্য রূপসমস্ত বিধাতার নিয়মকে কোথাও মেনে কোথাও বা আর্টের নিয়মকে ধরে সৃষ্টি হচ্ছে। যেমন এই গাছ একে দিলেন নিয়ন্তা এক রূপ, যেমন সেই গাছ তাকে দিলে কারিগর টেবিল কেদারা নৌকো বাড়ির কত কী রূপ,—একা নিয়তির নিয়মে গড়াই হতে পারে না মানুষের চৌকি টেবিল বাক্স তোরঙ্গ।

আলঙ্কারিকেরা এইরকমের শিল্পকার্যসমস্তকে বলেছেন বন্ধ-চিত্র। দুই সৃষ্টিকর্তার নিয়ম স্বীকার করে তবে হয়েছে টেবিল চৌকি সোনারুপার অলঙ্কার ইত্যাদি ইত্যাদি। উনি দিলেন মাত্র কাঁচা সোনাটুকু, ইনি দিলেন পাকা সোনার কর্ণফুলের রূপ লাবণ্য ভাব ভঙ্গি সবই; উনি দিলেন কাঁঠাল গাছ, ইনি দিলেন কাঁঠাল কাঠের রাজতক্ত। এমনি দুই আর্টিস্ট মিলে হল গঠনসমস্ত। এইজন্য বলা হল বেদে—আমাদের শিল্প দেবশিল্পীর অনুরণন দেয়। এ-শিল্পীর ও-শিল্পীর বন্ধুতার ফলে হল এইসব নানা প্রবন্ধে নানা ছন্দে দেওয়া রূপসমস্ত, শুধু নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করেই হয় না আর্টের জগতে রূপসৃষ্টি। মনে কোরো না যেই টেবিল চৌকি গড়ে সেই হয়ে ওঠে দ্বিতীয় সৃষ্টিকর্তা; কেননা রূপসাধন সে সহজ সাধনা নয়। কোনো চৌকিতে বসলেই উঠি-উঠি মন করে, কোনো কেদারা এমন আরামের যে বসতেই শ্রান্তি দূর, সঙ্গে-সঙ্গে নিদ্রার আবেশ।

ফুটবল খেলা দেখতে মত্ত থাকি বলেই বুঝতে পারিনে ফুটবলের চার-আনার বেঞ্চ একজন রূপদক্ষে গড়েনি—সে প্রায় সৃষ্টিকর্তার কাঠখানাই বেঞ্চ বলে চালিয়ে বঞ্চনা করছে দর্শকদের।

রূপদক্ষ নিজের মনোমতো রূপটি রচনা করেই খালাস, যে রূপ দেখবে তাদের কথা রূপদক্ষকে একেবারেই ভাবতে হয় না—এ একটা কথাই নয়। আমার যা-খুশি রেঁধেই খালাস, তুমি খেয়ে দূর-ছাই করো তাতে এল গেল না—এ কোনো ভালো রাঁধুনিই বলে না। আমার মনোমতোকে দশের ও দশহাজারের মনোমতো করে দিলেম—এতেই আনন্দ হল রূপদক্ষের।

রূপ দেবার শতসহস্র নিয়মের যে দেখা পাই রূপবিদ্যার চর্চার বেলায় তার কোনো প্রয়োজনই ছিল না যদি-না রচনাসমস্তকে তোমারও মনে ধরাবার দরকার হত। ছেলে কাদা নিয়ে খেলে, কত গড়ন গড়ে সেও, কিন্তু রূপের কোনো নিয়ম তার কাছে নেই, সে যথেচ্ছা গড়ে চলে কিন্তু সেও থেকে-থেকে কোনো-একটি দর্শকের তারিফ পেতে কাজ হাতে ছুটে আসে। কাজেই দর্শক ও প্রদর্শক চাই-ই থাকা।

বড়-বড় কবি ও রূপদক্ষ নট ও পটরচয়িতা তাদের কথা ছেড়ে দিই, যে-লোকটা ছেলে-খেলানোর পুতুল গড়ছে—বাঘ ভালুক সাহেব মেম পশুপক্ষী হাঁড়িকুঁড়ি কত কী—সেই-যে পুতুলওয়ালা সে তো যথেচ্ছা গড়ছে না, ছেলে ভোলে কিসে এ তার স্মরণে রয়েছে অথচ তাকে নতুন-নতুন রূপ দিতে হচ্ছে নিজের মতে। ছেলের একটি ফোঁটা প্রাণ কিন্তু বিশ্বরূপকে নিয়ে খেলার ইচ্ছা তার—সে হাতি চায়, ঘোড়া চায়, পাখি চায়, বাঘকে চায়, শেয়ালকে চায় খেলার সাথীরূপে পেতে, কিন্তু সত্যি জানোয়ার দেখে সে ডরায়, ভারী খেলনা হলে তুলতে ও টানতে হয় শিশুর প্রাণান্ত, কাচের পুতুল নিয়ে খেলতে গেলে সে হাত পা কেটে বসে, এক খেলনা নিয়ে বেশিক্ষণও সে ভুলে থাকে না—নতুনের প্রেমে পাগল তার নতুন জীবন, সবই তার বিস্ময় জাগায়।

রূপ মান প্রমাণ ভাব ভঙ্গি সাদৃশ্য বর্ণ লাবণ্য কোনোদিক দিয়ে অনুকৃতির নিয়মকে মানা চলল না এখানে রূপদক্ষ খেলনাওয়ালার। বাঘ ঠিক বাঘ হলে চলল না, এমন একটি রূপ দিতে হল পুতুলকে যা বললে—আমি বাঘ বটে কিন্তু খেলাতে এসে যোগ দিতে পারব এমন

বাঘ আমি। লঘুভার চমৎকার বাঘ যাকে দেখতে বাহার, খেলতে মজা যার সঙ্গে—এই হল তো ছেলে ভুলল, নচেৎ নয়। আইনও হল এইসব ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ দিয়ে খেলনা প্রস্তুতের।

মূর্তিশিল্পের চরম হল যেখানে পাষাণে দেবতার আবির্ভাব হল। এইসব আর-এক প্রস্থ বুড়ো বয়সের খেলনা। পুতুল গড়ার নিয়ম সেখানেও খাটল অনেকখানি, তফাত শুধু হল মাপের দৈর্ঘ্য প্রস্থে কোথাও কোথাও। ছেলের খেলনা হালকা, বুড়োর খেলনা ভারী, এটা ছোট মাপ, ওটা নবতাল দশতাল এমনি তাল-তাল রূপ—এই যা তফাত। বালির স্তূপ গড়লে ছেলেতে আর পাথরের স্তূপ গড়লে বৌদ্ধরাজা—সাজের বাহুল্য এবং রূপের সমাবেশ ইত্যাদি নিয়ে আরো অনেকখানি পরিপূর্ণ হল বৌদ্ধস্তূপ কিন্তু রূপটা রইল সেই ছেলের গড়া বালির স্তূপেরই।

প্রতিকৃতি অনুকৃতি এসবের স্থান আছে রূপবিদ্যার মধ্যে, এদের জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম আছে—তারা হল রূপকে শত-শতবার পুনরাবৃত্তির নিয়ম। রূপদক্ষের সৃষ্টি যার পুনরাবৃত্তি নেই তার নিয়মসমস্ত স্বতন্ত্র নিয়তিকৃত নিয়ম রহিত বা খেলনা গড়ার নিয়মও বলতে পারো তাকে।

নিয়তির নিয়ম হল বিধাতার নিয়ম, আর নিয়তির নিয়ম থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র নিয়ম হল আর্টের নিয়ম। কিন্তু একেবারে যে নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘন করলে সে আর্ট রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ-নিরপেক্ষ আর্ট—হয়তো আছে হয়তো নেই। দুই সৃষ্টির নিয়মকে মানিয়ে যে আর্ট তাই নিয়েই রূপদক্ষের কারবার। একটা মাটির খেলনা তাকে ছেলের সাথী হবার উপযুক্ত করে ক্ষণিকের জীবন দিয়ে ছেড়ে দিলে আর্টিস্ট, একটা পাথরের দেবমূর্তিকে আরো বেশি পরমায়ু দিলে আর্টিস্ট—কেননা যুগ-যুগ ধরে মানুষের সঙ্গে খেলার সম্পর্ক পাওয়া চাই তার। ঠিক এই নিয়ম দেখি বিধাতারও সৃষ্টির মধ্যে কাজ করছে। নক্ষত্র একটা গড়লেন বিশ্বকর্মা—যুগ-যুগ ধরে ফুলঝুরি জ্বালিয়ে খেলে চলল সে, একটা খদ্যোত গড়লেন তিনি—ক্ষণিক খেলার অবসর পেলে সে বিধাতার কাছে। আর্টিস্টও ঠিক এর জবাব দিলে, ঘরের মধ্যে তার সে-ঘরের প্রদীপ তারার মতোই জ্বলল—শুধু রূপটি পেলে সে ক্ষণিকের।

বিধাতার-গড়া প্রজাপতি সে খেললে ক্ষণিক, আর্টিস্টের-গড়া পাষাণ সুন্দরী সে যুগ-যুগ ধরে খেলতে লাগল, মানুষের ঘরে সোনার কাঁটায়-বেঁধা প্রজাপতি শোভা ধরলে—একের পর এক যারা সুন্দরী জন্মাল তাদের খোঁপায় উড়ে বসল সে বিয়ের আগে। দেবতার সভায় বাজল মেঘের বাদল, আর্টিস্টের সভায় বাজল মাটির মাদল। গাছ সে ফুল সেজে ইশারায় জানালে—আমি গাছ নয়, আমি সবুজ শাড়ি পরে বনদেবী। আর্টিস্টের হাতের বীণা সে-সুরের সাজে সেজে বললে আমি কি শুধু বীণাই, আমি পরিবাদিনী সুন্দরীও বটে। এমনি নিয়ন্তাতে আর রূপদক্ষের বাজিখেলা রূপসৃষ্টি নিয়ে। খেলার সময় যেমন তাসগুলো হাত বদল করে তেমনি এই রূপসৃষ্টির লীলা খেলতে নিয়তির নিয়মগুলো আসা-যাওয়া করে আর্টিস্টের হাতে বারবার। এই নিয়ম-সমস্ত জানার জন্যই নেচার স্টাডি করতে হয় আর্টিস্টকে, না হলে শুধু নিজের নিয়মে চললে খেলা চলে না ঘুরেফিরে অনেকক্ষণ।

অক্ষরমূর্তিতে কতক, শব্দরূপে কতক, স্পর্শরূপে কতক—এমনিভাবে রূপসমস্ত ধরা দিচ্ছে আমাদের চেতনায়, আবার এই তিনে মিলিয়ে একটা রূপ তাও পাচ্ছি আমরা। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের তলায় শুক্তির মধ্যেকার মুক্তা সবই বিধাতার স্বাক্ষরিত রূপ। মিশরের মরুভূমির মাঝে পিরামিড সেখান থেকে সমুদ্রের বুকে যে লাইট-হাউস সমস্তই মানুষের স্বাক্ষরিত রূপ তারা। বিদ্যুল্লেখা একেবারে সোনার-জলে-টানা অক্ষররূপ, তার অনুগামী বজ্র একেবারে শব্দ-দিয়ে গড়া সে। কোকিলের কুহু—শব্দরূপ মাত্রে বসন্তশ্রী রইলেন সেখানে, মলয় বাতাস স্পর্শরূপ পরিমলরূপ তার। বর্ণরূপা যাঁরা

তাঁদের স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের হিশেবে অক্ষরমূর্তির কোঠায় ফেলা চলল। এইভাবে শুনে দেখা যায় ছুঁয়ে দেখা যায় চোখ বুলিয়ে দেখা যায় রূপ আর রূপের সমস্ত ইঙ্গিত ও আভাস।

পুতুলওয়ালা দুয়ারে পা দিয়েছে অমনি ছেলে ছুটেছে তার দিকে রূপের টানে—সহজে- গড়া পুত্তলিকা তাদের আকর্ষণ কতখানি! ছেলে কাঁদে পুতুল চেয়ে, ছেলে খায় না ঘুমোয় না পুতুল না-পেলে, মায়ের কোল ছেড়ে পালায় শিশু—এমন আকর্ষণ রূপের। বিধাতার সৃষ্টিতে এক আগুনের এই ধরনের আকর্ষণ—পাখিকে টানে পতঙ্গকে টানে, দলে-দলে মানুষ জড়ো হয় রূপ দেখতে। পুত্তলিকার আকর্ষণের মতো এমন বিরাট আকর্ষণ সেটা কি কুড়িয়ে পায় মানুষ? পুতুল গড়ার নিয়ম আর অগ্নিশিখার নিয়ম কিন্তু একটু স্বতন্ত্র। আগুনের আকর্ষণের শেষে ভীষণ নিরানন্দ, পুতুলের আকর্ষণের শেষে আনন্দ। যে পুতুল গড়ে সে বুড়ো, যে পুতুল খেলে সে ছেলে; রূপের ছাঁদে দুয়ের মিলন; আর ঐ বিশ্বকর্মা যিনি তারা গড়েন আর যে তারাবাজি পুড়িয়ে খেলে তাদের মিলন রূপের ছন্দে।

জগন্নাথের মন্দিরে একটা ঘর দেখেছি পুতুল দিয়ে ঠাসা—সৃষ্টির পশুপক্ষী জীবজন্তুর গাছপালা গড়ে-গড়ে ধরেছে সেখানে। পালপার্বণে এইসব পুতুলের ডাক পড়ে রাস দোল কত কী খেলার—দেবতায় মানুষে পুতুলে বেধে যায় রঙ্গ তারপর খেলার শেষে রূপসমস্ত যে যার স্থানে চলে যায়। ছেলে যতদিন ঘরে নেই ততদিন খেলনার আলমারিতে বন্দিতে সমস্ত পুত্তলিকা রূপ তারা বড় দুঃখেই আছে দেখি, যেমনি ছেলে এল আর রক্ষে নেই, পুতুলগুলো হাঁফ ছেড়ে বললে—যাক বাঁচা গেল, এইবার খেলে যাবার অবসর এল। এমনি রূপসমস্ত দিকে-দিকে জলে স্থলে আকাশে বন্দি থাকে—আর্টিস্টকে খোঁজে তারা সবাই, তাদের নিয়ে লীলা করবে এমন এক-একজন খেলুড়ি আর্টিস্টকে খুঁজে ফিরছে বিশ্বজোড়া রূপ সকলে। সেই বিক্রমাদিত্যের আমলে একটা শুকনো গাছ—মাঠের ধারে সে অপেক্ষা করছিল যে তাকে নিয়ে একটিবার সত্যি-সত্যি খেলবে তার জন্য। রাজা গেলেন পথ দিয়ে, দেখলে শুকনো গাছ। রাজার সঙ্গে রাজকবি—তিনি কবি নয় কিন্তু পদ্যে কথা বলেন—তিনি পদ্যে বললেন—'এ যে দেখি শুষ্ক কাঠ'। ভাগ্যি ছিলেন সঙ্গে সত্যিকার কবি ও খেলুড়ি, তিনি বলে উঠলেন—'কী কও শুকনো কাঠ?'

ও সে তরুবর রসের বিরহে—
হুতাশে দহে!

একটি ছেলে দেখলে শুকনো কাঠ নয়— সে ঘোড়া, সে মানুষ, সে কত কী? একজন কবি দেখলেন শুকনো গাছ নয়—রসের পাত্র সেটি, ছেলে করে রূপের আরোপ, কবি করেন রূপের আবির্ভাব শুকনো কাঠে। ছেলে রূপ আরোপ করলে যখন, তখন সে যা চায় তাই হল—সেই শুকনো কাঠের শুকনো কাঠ থাকা চলল না, ঘোড়া মানুষ কত কী হতে হল। ছেলে সে স্বমতে চলল, কাঠ রাখলে না গাছও রাখলে না—একে বলা চলল স্বারোপক রূপ। কবি যখন শুকনো গাছকে তরুবর বলে দেখালেন তখন তিনি একটা ইচ্ছামতো রূপের আরোপ করলেন গাছে এ-কথা বলতে পারিনে, কেননা, 'রূপারোপাত্তু রূপকম্'—এই কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। এখানে রূপের আরোপ হল না রূপের নষ্ট হয়েছিল যা, তা পুনর্বার ফিরে এল রূপে। সুতরাং একে বললেম স্বরূপক রূপ। এই দুই নিয়মই খাটল রূপসৃষ্টির কাজে।

কথা দিয়েই লিখি ছবি দিয়েই কি সুর দিয়েই বলি গাছটিকে খানিক শুকনো কাঠ বলে জানালেম তো কাঠুরের কাজে এল খবর, রসিকের তাতে কী এল গেল? শুকনো গাছের আশা-নিরাশা—কত বর্ষায় তার পাতায়-পাতায় ভরে-ওঠার স্বপ্ন, কত শীতে তার পাতা ঝরানোর গান, কত বসন্তে তার ফুলদোলের স্মৃতি সব কথা জড়িয়ে থাকে মরা গাছেও,

কত পাখির আসা-যাওয়ার খবর কত ছায়ার মায়া-দিয়ে-গড়া তার পরিপূর্ণ রূপ—তাই যদি না ধরা পড়ল রূপদক্ষের মায়াজালে তবে কী হল?

কাঠুরের এবং তুমি আমিও দেখব শুকনো কাঠ কিন্তু রূপদক্ষ যে সে দেখবে করুণ রসে সিক্ত বিরস বনস্পতিকে জীবন্তবৎ—এই হল নিয়ম। না হলে সমালোচক সেও যে পড়ে যায় রূপদক্ষের কোঠায়!

রূপ প্রকাশের পূর্বে তিন অবস্থার মধ্যদিয়ে চলল—ঘট্টিত অবস্থা লাঞ্ছিত অবস্থা রঞ্জিত অবস্থা। চলিত কথায় আমরা বলি শাদামাটা অবস্থা ছকা অবস্থা রাঙানো অবস্থা।

শাদামাটা অবস্থায় ঘটনা রয়েছে দ্রষ্টার অগোচরে আর্টিস্টের মনে এবং শাদা কাগজে শাদা পাথরে সোনার তালে মাটির স্তূপে। খানিকটা গোচর হল রূপ যখন নানা দাগদোগ মাপজোখ নিয়ে একটা কাঠামো পেলে ঘটনাটি, তারপর আলো ছায়া রঙবেরঙে রঙিয়ে উঠল সমস্ত ঘটনাটি—এই নিয়ম ধরে রূপের প্রকাশ আর্টে। যেন বৃন্ত হল কলি জাগল ফুল ফুটল পরে-পরে।

কিম্ভূতম্ আর কিমাকারম্—গ্রোটেস্ক আর ক্যারিকেচার—বৈরূপ্য শিল্পের এ দুটো প্রকাশ। কিম্ভূত যে-সমস্ত রূপ এবং কিমাকার যে-সমস্ত রূপ, দুয়ের মধ্যে এক আইন কাজ করছে না। যেখানে রেখাসমস্ত আকৃতি পাবার বেলায় একটা নিয়ম ধরে বাঁকছে সোজা হচ্ছে—মানুষ পাচ্ছে গাছের রূপ, আধা-মানুষ আধা-গাছ রূপ, নরসিংহরূপ, অর্ধনারীশ্বর রূপ, কিন্নর রূপ—ভূষা ও মণ্ডন শিল্পের নিয়ম এবং ছন্দ ধরে রেখা রঙ সবই সেখানে প্রকাশ পাচ্ছে এবং রূপটি সেখানে একটা ভবিতব্যতা স্বীকার করছে, সেখানে সেটিকে বলা চলল কিম্ভূতরূপ বা গ্রোটেস্ক রূপ। ক্যারিকেচার বা কিমাকার যে এক আকৃতির বৈরূপ্য করা ছাড়া আর কোনোকিছু করছে না বা গ্রোটেস্ক অর্থাৎ কিম্ভূতের মতো মানানসই রূপও দিচ্ছে না। বেমামান অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রেখা রঙ সমস্ত দিয়ে বেমানান রূপ প্রকাশ করাই হল ক্যারিকেচার। সাদৃশ্য সম্বন্ধে যখন বলব তখন এদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া যাবে, এমন ভূষা নিরপেক্ষ রূপ—রূপদক্ষের চরম দক্ষতা যার সৃষ্টি করার বেলায় দেখতে হয়—সেই বিষয়ে বলে আলোচনা শেষ করি।

অঙ্গান্যভূষিতান্যেব কেনচিদ্ ভূষণাদিনা।
যেন ভূষিতবদ্ ভান্তি তদ্রূপমিতি কথ্যতে ॥ [১২]

রূপজগতে কেবলি রয়েছে 'সাজ-সাজ' ধ্বনি—যেন নাচঘরের সাজঘর, সবাই সাজছে এখানে। কী সাজ কত সাজ এই বাঙলাদেশটার তাই দেখ না, ঐ-যে আকাশ ও কি তারার মালায় সাজেনি, সমুদ্র কি নীলাম্বরী পরে সাজেনি, নদী সে কি জলতরঙ্গ চুড়ি বাজিয়ে নেচে চলছে না? পাতার বাহার দিলে উপবন, কুঞ্জবন ফুলের মালায় সাজলে—অষ্ট অলঙ্কারে ভূষিতা সখী এরা রূপদক্ষকে ঘিরেই রইল—দিবারাত্রি সকাল সন্ধ্যা। বিচিত্র ছাঁদ বিচিত্র সজ্জা এদের। বিভূষিতা এই পৃথিবীতে কোথায় পাই নির্ভূষণ রূপটিকে?

নিরাভরণা নিরাবরণা সুন্দরী। রূপভোজের প্রমোদ-উদ্যানের গিল্টির-অলঙ্কারে-বাঁধা ন্যুড-স্টাডি তারাই কি নির্ভূষণা সুন্দরী বলে বলাতে পারে নিজেদের? রূপজীবীদের সহচরী বলে তাদের অনায়াসে চেনা যায়।

পর্বতদুহিতা উমা তিনি নির্ভূষণা রূপসী, শকুন্তলাও কতকটা এই ধাঁচের সুন্দরী, শ্রীরাধিকা নয় কিন্তু মথুরার কুব্জা তাকে ধরতে পারো নির্ভূষণা সুন্দরী বলে। অশোকবনের সীতা—ভূষানিরপেক্ষ সৌন্দর্য ছিল তাঁর।

এ তো গেল কবিজনের সৃষ্টি-করা নির্ভূষণা রূপসী তাঁরা; বিধাতার সৃষ্টিতে ভূষানিরপেক্ষ রূপ কোথায় পাই দেখি। মরুভূমির নিঃসঙ্গ রূপ সে একেবারে বিরাটভাবে ত্যক্তভূষণ ও পরম সুন্দর! ময়ূরের সবটাই প্রায় ভূষিত, বাবু কার্তিকের বাহন হল সে। মরাল নির্ভূষণ ও সুন্দর মানস-সরোবরে পেয়ে গেল স্থান।

বৌদ্ধশিল্প তার মধ্যে একা বুদ্ধমূর্তিটিই কেবল নির্ভূষণ সুন্দর রূপ, আর চৈত্য বিহার স্তূপ সবই ভূষাভারাক্রান্ত রূপ। সিংহলের কপিল মূর্তি—রূপেতেই সেটি রূপবান, বাঙলার নিকোনো ঘর—ভূষানিরপেক্ষ রূপের বাসা। এমনি পৃথিবীর সর্বত্র আর্টের মধ্যে এই পরম রূপ জায়গায়-জায়গায় ধরা রয়েছে দেখব অতি প্রাচীনকালে এবং একালেও।

রূপের অভাব দিয়ে ভূষানিরপেক্ষ রূপকে ফোটানো সম্ভব নয় এটি সুনিশ্চিত। কলঘরের চিমনি সম্পূর্ণ ভূষানিরপেক্ষ, কিন্তু তার রূপ কী? ভূষোকালি মেখে সে একটি নির্ভূষণ অশোকস্তম্ভের কিমাকৃতি দিচ্ছে মাত্র। রূপদক্ষের হাতে তাকে সাজতে হয় অনেকটা তবে সে স্থান পায় রূপরচনার মধ্যে। চৈতন্য ছিলেন নিজের রূপেই রূপবান, কিন্তু চৈতনচুট্‌কিধারী বাবাজি যদিও ভূষণ পরলে না তবু সে ভেকধারী বাবাজি কি স্বামিজি এইটেই প্রমাণ করলে। জলের উপরে জেলে-ডিঙি ভূষানিরপেক্ষ সুন্দর সে। গাছের তলায় শুকনো পাতা শ্রীচৈতন্যের মতো নির্ভূষণ সোনার পুতুল সে। প্রভাতের চন্দ্রকলা আলোর সাজ ছেড়ে পরম সুন্দর; নির্ভূষণা সুন্দরী সে। আগ্রার তাজমহলের চেয়ে সুন্দরী দিল্লির প্রাসাদে পাষাণ-দিয়ে-গড়া অন্দরমহলের গোপনতায় ঘেরা যে-একটুখানি মোতী মসজিদ সে হল নিরাভরণা নির্ভূষণা সুন্দরীর প্রতিমা, কিন্তু ঐ তাজমহল সেও সুন্দরী কিন্তু নাতিভূষিতা। একেবারে নিরাভরণা সূচ সে একেবারে নির্ভূষণ—সরলরেখাটি পরিষ্কার ঝরঝরে, কাজের উপযুক্ত রূপ তার কিন্তু তার রূপ দেখে মন মাতে না, সূচে-তোলা নানা কাজ দেখে কিন্তু চোখ মন সবই ভোলে। কুশ ও কাশ তারাও নির্ভূষণ সরল কিন্তু সূচের থেকে স্বতন্ত্র তাদের রূপ। টিনের জলপাত্র তার ভূষারিক্ততা আর শাদাসিধে অথচ সুন্দর চুমকি ঘটি তার ভূষারিক্ততা একধরনের নয় কাজেই তারা একরূপও নয়

ভূষার অতিরেক এবং ব্যতিরেক এই দুয়ের নিয়ম অতি সাবধানে প্রয়োগ করতে হয় রূপ-ফোটানোর বেলা। কতখানি সাজাব কতখানি সাজাব না, কাকে সাজাব কাকেই বা সাজাব না এর বিচার রূপদক্ষের হাতে। এই দুই মহাস্ত্র এরা রূপ ফোটায়—যদি রূপদক্ষের হাতে পড়ে এবং রূপকে মারে—যদি এদের নিয়ে কারবার করে রূপবিলাসী অথচ মোটেই রূপদক্ষ নয় এমন কেউ। যথাযথভাবে পুরোপুরি ভূষিত এবং অযথাভাবে ভূষণভারগ্রস্ত দুটো কাজ পাশাপাশি রাখি, নারকেলডাঙায় পরেশনাথ টেম্পল রঙিন কাচ আর সোনার হলকারি দিয়ে মোড়া, ঠিক এমনি সোনা আর কাচে সাজানো আগ্রার শিশমহল। দুটোতে তফাত কতখানি হয়ে গেল! একেও দেখতে লোক জমা হয়, ওকেও দেখতে লোক ছোটে। কিন্তু শিশমহল বইলে সার্থক রূপখানি আর টেম্পল বইলে কাচ আর গিল্টির অনর্থক ভার মাত্র। গহনা কেড়ে নিলেও সে রূপবতী, রূপসীর আদর্শ তাকে বলতে পারো। ভূষানিরপেক্ষ রূপ হল প্রকৃত রূপ—লাখে এক রচনায় তার দেখা পায় শিল্পজগতে। রচনার কৌশলে বর্ণের ছটায় ভাবের সমাবেশে রূপসমস্ত স্বতন্ত্র-স্বতন্ত্রভাবে আমাদের কাছে মূল্য পায়। চোখের দিক ঘেঁষা কোনো রূপ, মনের দিক ঘেঁষা কোনো রূপ। রূপের মোটামুটি ভেদ এই দুটো নিয়ে হয়, তারপর মন্দ নয়, পাঁচপাঁচি, মাঝারি—এমনি অসংখ্য রূপ তারাও আছে, একেবারে কাজের ও একেবারে অকাজের এমন সব রূপসৃষ্টি এও আছে—রূপের সংখ্যা করা যায় না এত রূপ, এবং তত নিয়ম রূপভেদের—এরি সাধন হল রূপ-সাধকের অসাধ্য সাধন বলতে পারি।

ভাব

ভাবয়তি পদার্থন্ ইতি ভাবঃ। [১৩]

ভাবযুক্ত পদার্থ নিয়ে কথা, শুধু রূপটা আর তার মান-পরিমাণ দিয়ে খালাস নয় আর্টিস্ট। ছুতোরে কুঁদে দিলে লাটিমের ডৌল, কামারে পরালে তাতে আল, তাঁতি পাকিয়ে দিলে দড়া। পেশা বিভিন্ন হলেও এরা তিনজনেই কারিগর—কেউ ডৌল দিতে পাকা কেউ সূচ বেঁধাতে পাকা কেউ সুতো জড়াতে পাকা, কিন্তু লাটিমকে বিয়ের কনেটির মতো অলকা-তিলকা দিয়ে সাতরঙের বরণডালাটি মাথায় সাজিয়ে ভাবযুক্ত করলে আর্টিস্ট—ভুলল তবে ছেলে। একটু বড় হলে ঘুড়ির সঙ্গে এইভাবে ভাব হল, আরো বড় হলে হল ছবির সঙ্গে ভাব, পরে হল রঙিন কাপড়ের সঙ্গে ভাব, এইভাবে কেউ ভাব করে ফেললে কবিতার সঙ্গে, কেউবা আর- কিছুর সঙ্গে। বণিকের ঘরে সুন্দর-সুন্দর অলঙ্কার ধরা থাকে স্তূপাকারে—কিন্তু এতে করে বুঝতে হবে না যে বণিকের সঙ্গে অলঙ্কারগুলোর ভাব হয়ে গেছে। ভাবুক সে নিজে ভালোবাসে সাজ, অপরকে ভালোবাসে সাজাতে, ভাব হল তার যেখানে যা-কিছু অলঙ্কৃত এবং যা-কিছু অলঙ্কারক আছে তার সঙ্গে। একজন যে সংসারের তেল-নুন-চাল-ডালের ভাবনা নিয়ে বসে আছে কিংবা যে গট হয়ে বসে মস্ত অফিসের ফাইল আর হিশেবের ভাবনা ভাবছে—তাদের বলতে হল ভাবনাগ্রস্ত। পরকালের ভাবনা ভেবেই আকুল, হরিনামের মালা জপছি, শাস্ত্রমতো ত্রিবিধ ভাবনাই ভাবছি, কিন্তু ভাবুক নয় একেবারেই। মালাও জপছি না হরিসভাতেও যাচ্ছি না খাচ্ছি-দাচ্ছি আফিস করছি আর খাতায় মিষ্টি মিষ্টি পদাবলী গীতা ছড়া নাটক লিখছি যা শুনে লোকের ভাব লেগে যাচ্ছে, তখন আমাকে ভাবনাগ্রস্ত নয় ভাবুকই বলবে লোকে। মালি রয়েছে ফুলগাছের ভাবনা নিয়ে কিন্তু পুষ্পলতার ভাবের সে তো ভাবুক হল না এতে করে। মালাকার গাছের ভাবনা ভাবে না, অথচ সে পড়ল ভাবুকের দলে—তার ভাবনাগুলি ফুলের হার ফুলের সিঁথি ফুলের তোড়া কত কী রূপ ধরে প্রকাশ হল। উকিল ভেবেচিন্তে পাকা দলিল লিখে ফেললে—যথেষ্ট গুণপনা প্রকাশ হল তার, কিন্তু ভাবুকতা প্রকাশ করলে দলিল লিখতে উকিল এ বললে তা ওকালতি বুদ্ধিকে খাটো করা হয়; তেমনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—সেখানে বঙ্কিমবাবু তাঁর ওকালতি বুদ্ধি খাটিয়েছেন ভাবুকতা নয় বললে মুশকিল। কুবেরের ছিল হিশেবি বুদ্ধি, তিনি ভাবতেন ধনের হিশেব আর কুবেরের অনুচর যক্ষরাজের ছিল রসবোধ, হিশেবি বুদ্ধি একটুও নয়, সে বসে হিশেবের খাতায় অঙ্ক না-কষে এঁকেই চলল প্রিয়ার ছবি—এ ওর ভাব বুঝলে না, একবছরের জন্য সসপেন্ড হলেন যক্ষরা। এই একবছরে বুদ্ধির জোরে তহবিলের ফাঁক পূর্ণ হল ধনপতির, আর বিরহী যক্ষের বুকে ভাবসম্পদে ভরে উঠল দিনে-দিনে। যক্ষ যদি বুদ্ধি খাটাতে চলত তো মেঘকে দিয়ে ডাক-পেয়াদার কাজ করাতে চলত না, সে ভাবুক ছিল তাই নির্ভাবনায় মেঘকে দূতের পদে বরণ করে নিয়েছিল। মেট্রোলজির রিপোর্ট বুদ্ধিমানে লেখে, আর ভাবুকে লেখে 'মেঘদূতম্'।

কেল্লায় তোপ পড়ল—রাত নটা বাজল এই জ্ঞান জন্মে দিয়ে চুকল তার কাজ, রাত্রির যে-ভাবটি সেটি মনে পৌঁছে দেওয়া হল না তোপের শব্দে, তোপ জানান দিলে মাত্র

প্রহর। সন্ধ্যায় আরতির ঘণ্টাধ্বনি—সে শুধু জানালে না আরতির বেলা হয়েছে; গির্জের ঘণ্টা—সে শুধু জানালে না এত প্রহর হয়েছে; বিয়ের বাঁশি—সে শুধু জানালে না লগ্ন আর সময়টা; ভাবযুক্ত ধ্বনি এরা, রসের সংবাদ দিয়ে গেল সবাই ভাবের সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে। শাস্ত্রকার বলেছেন, রস ছেড়ে ভাব নেই, ভাব ছেড়ে রস নেই। ধরো সখ্যরস—ভাব হল দুই ছেলেতে তবে রস জাগল মনে-মনে। এমনি ছেলেতে-ছেলেতে ঝগড়া—সেখানে দুই বিপরীতমুখী ভাবের ধাক্কা জাগালে আর-একরকম রস। আবার কোথাও কিছু নেই হঠাৎ মনে একটা ভাব জাগল, রসও বিঁধল প্রাণে সেইসঙ্গে। অহেতুক ভাবের উদয়ে কোথাও কিছু নেই হঠাৎ একটা সুর মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে ওঠে, একটা ছন্দ দোলা খেতে লাগে প্রাণের দোলায়, রঙের একটা নেশা উপস্থিত হয় চোখে—কারণ সন্ধান করে পাইনে খোঁজ।

কোকিল ডাকল বলেই বসন্ত এল, না বসন্ত এল বলেই কোকিল ডাকল? ভাব হল বলে রস হল, না রস জাগল বলে ভাব হল? এর মীমাংসা করা নৈয়ায়িকদের কাজ, তবে এটা নিজে-নিজে আমরা সবাই অনুভব করেছি যে শীতকালের বর-কনে দুজনের কাছেই কোকিল দিলে না সাড়া বাইরে, কিন্তু বুকের ভিতরে পড়ে গেল তাদের তাড়া ভাবের ফুল ফোটাবার; কিন্তু ফুল রইল ঘুমিয়ে শীতের রাত্রে বনে-বনে, হঠাৎ মনে-মনে বসন্তবাহার রাগিণীতে মনোবীণা বেজে উঠল আপনা হতে, লেগে গেল সেখানে বসন্ত-উৎসব।

মানুষের ভাব প্রকাশ করে যে-সমস্ত রসরচনা কবিতা গান ছবি ইত্যাদি ইত্যাদি—তারা কোনোটা সহেতুক কোনোটা এইভাবে অহেতুক বলে ধরতে পারি। দু-তিন পাট কাপড় জুড়ে কাঁথা বোনা হচ্ছে। এই কাঁথা বোনা হল শীতের নিমিত্ত, শীত হেতু এখানে কাঁথার। যেখানে শীত নেই সেখানে কাঁথা বোনার কাজ হয় অকারণে কাজ। শীতের কাঁথার উপরে যে-কাজটা করা যাচ্ছে সেটা কি শীত নিবারণের নিমিত্ত করা হচ্ছে? সুন্দর দেখাবে বলেই তো কাঁথার উপরটায় কাজ করছি, কাজেই শীত এবং সৌন্দর্য দুটো হেতু হল কাঁথা রচনার বলতে হয়।

যে-রচনার হেতু মাত্র আপনা হতে রসের উদয়, তাকে বলতে পারি অহেতুক রচনা। না হলে হেতু নেই কারণ নেই কোনোকিছুর নিমিত্তও নয় অথচ রচনা হল কিছু—এমনটা হয় না। ছেলেটা কোথাও কিছু নেই খেলতে-খেলতে হঠাৎ কান্না ধরলে কি গেয়ে উঠল কি নাচ শুরু করলে, ছেলের মনের ভিতরটাতে কী হচ্ছে ধরা গেল না, কাজেই বললেম—ছেলে অকারণে হাসে কাঁদে কেন দেখ তো।

শিল্পকাজ-সমস্তের মধ্যে একটা দিক থাকে যেটা রস ও ভাবের দিক। সেখানে ভাব উদয় হল, কবিতা লিখলেম ছবি লিখলেম গান গাইলেম নৃত্য করলেম; ভাবের বশে কলম চলল তুলি চলল হাত চলল পা চলল। শীতের জন্য যে-কাঁথা সেটা সুন্দর না-হলেও কাজের ব্যাঘাত হয় না কিন্তু তাকে যদি শুধু শীত-নিবারণকারী না-রেখে চিত্তহারীও করে দিতে চাই তবে খানিক সুন্দর কারুকার্য দিয়ে ভাবযুক্ত করা চাই, তবেই সেটা একটা স্থান পেলে শিল্পজগতে, না হলে সে রইল কাজের জগতে খুব কাজের জিনিশ হয়ে পড়ে।

একটা দিক শিল্পকাজের যেটা হচ্ছে প্রকরণের বা টেকনিকের দিক, সেখানে নৃত্যের আঙ্গিক ব্যাপার গানের বাচিক ব্যাপার ও কৌশল—এক কথায় রূপ দেবার ও ভাব প্রকাশ করার কৌশল—সমস্ত রয়েছে। ভালো করে লিখতে হবে তাই ভালো করে কলম বাড়ছি, রুল টানছি—ভালো করে বাজাব বাঁশি ফুটোফাটা বেছে কারিগরি করছি সরল বাঁশে;—নাচতে হবে ভালো করে তাই পায়ের নানা কায়দা শিখছি। ভাব নেই, ভাষাতে দখল

নেই—ছন্দ ছাড়া হল সব। পাগলের প্রলাপ আর ওস্তাদের আলাপ দুয়েরই মূল হল ভাব, তবু-যে দুয়ে ভেদ করি তার কোনো কারণ নেই?

লেখার বেলায় দেখি যে চেক লিখছে আর যে ছবি লিখছে—দুয়ের কাজে ভেদ হচ্ছে সব দিক দিয়ে। তামাক আনতে দেরি হওয়াতে রেগে চাকরের নামে ঘুসি বসালেম, আর অভিনয় করে স্টেজের উপরে উঠে একজন কারু বুকে ছুরি দিলেম—ভাবের বশে দুই ক্রিয়াই হল—কিন্তু দুই কাজকেই একশ্রেণীর কাজ বলে ধরা চলল না। চাকরকে মারলেম রাগের হেতু, নাটকের জগৎসিংহ হয়ে ওসমানকে মারলেম রসের খাতিরে, রাগের হেতু মোটেই নয়। রূপের কারণে নয় রসের কারণে যে মার তাই হল স্টেজের মার বা মারের ভান মাত্র। এখন রস ও ভাব সৃষ্টির জন্য সকারণ মার বা সত্যিই মার যদি রঙ্গমঞ্চে গিয়ে দেওয়া যায় তবে রসের আগেই এসে হাজির হয় পুলিশ এবং লোকটিকে অকারণে প্রহারের জন্যে পড়ে হাতে হাতকড়ি; ভাবের দোহাই চলে না তখন, কেননা সত্যি-সত্যি মার রস দেয় না বেদনা দেয়। মানচিত্র—ভাব জাগাবার কালে তাকে কাজে লাগানো চলল না, কোনো-একটা জায়গার স্মৃতি তাও জাগিয়ে দিতে কাজে এল না মানচিত্র। চিত্রপট দিয়ে ভাব জাগানো চলল, রস জাগানো চলল। এমনি তারাপীঠ শ্রীপাট প্রভৃতি প্রতীক চিত্র তন্ত্রমন্ত্রের কাজে এল কিন্তু ভাব জাগাবার কাজে এল না, আবার নীলাম্বরের নীরস চিত্র প্রতীক নয় কিন্তু আকাশের ভাবটার প্রতিম। নীলাম্বরী শাড়ি তাকে আকাশের প্রতীক বলে এক হিশেবে ধরা চলে আবার চলেও না—সে প্রতীক হয়েও প্রতিমা, কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের একটা যন্ত্রচিহ্ন সে কেবলমাত্র প্রতীক—বিশেষ নামে অভিহিত কতকগুলো রঙ ও রেখার সমাবেশ—নিজে সে কিছুর প্রতিমা নয়, ভাবও জাগায় না, ভক্তেরই কাজে লাগে। প্রতিমাশিল্পের কৌশলই হচ্ছে রূপটাকে ভাবের প্রতিম করে তোলাতে। একটা পোড়ামাটির পুতুল—তার সঙ্গে ভাব হয় কেননা সেটা ভাবের প্রতীক করে গড়া হয়েছে বলেই, কিন্তু বেশ করে পোড়ানো একখানা এগারো ইঞ্চি ইট বা টালি তার সঙ্গে ভাব হওয়া শক্ত—সেটা ভাবের বস্তু নয় বলেই। আকাশ থেকে ঝরে-পড়া একপশলা জল, চোখের কোণ থেকে গড়িয়ে-পড়া একবিন্দু অশ্রু—ভাবের বস্তু এরা, কিন্তু নোনা-ধরা দেয়াল থেকে খসে-পড়া এক চাংড়া বালি ভাবের বস্তু নয়, অথচ নদীর বালুচর—সেখানে বালি একটা ভাবের সৃজন করলে। বর্ষার শেষে আকাশে ভাসছে একটুকরো মেঘ—সারা বর্ষার ভাবটা থাকে তখনো রাখলে মনোহর করে; পুরোনো শালের চমৎকার টুকরো পুরোনো ছবি মূর্তি চীনের বাসনের টুকরো যেভাবে মনোহর তার চেয়েও ভাবসম্পদে মনোহর ঐ ছেঁড়া মেঘের একটি খণ্ড।

কাজেই বলি ভাবের প্রতিম যেটি হল, সে অখণ্ড ভাবেও যেমন খণ্ড ভাবেও তেমনি রস ও ভাবের বস্তু হয়ে রইল। একটি ইটের পাঁজা—সে জাগাচ্ছে ভাব, একটা পাথরের স্তূপ পিরামিড বা পাহাড়—তারা জাগাচ্ছে ভাব, একটা ভাঙা বাড়ি—সে জাগাচ্ছে ভাব, কিন্তু একটা ভাঙা টালি বা ইট সে ঝরাফুলের পাপড়ি একটি যেমন ভাবের বস্তু বলে চলতে পারলে না। পুরো মানুষটা কি বাঁচা কি মরা দুই অবস্থাতেই ভাবের সঙ্গে এক হয়ে আছে। শুধু মানুষ কেন, সব জানোয়ারের বেলাতেই এই কথা। কিন্তু মরা মানুষের কি বনমানুষের হাড়—তার সঙ্গে ডাক্তারেরও পুরোপুরি ভাব হয় কি না সন্দেহ, অথচ কঙ্কালমালিনী তাঁকে প্রতিমাকে ধরেছে আর্টিস্ট ভাব দিয়ে কত বার কত ভাবে কত ছাঁদে তার ঠিক নেই। জাদুকরের সঙ্গে জড়িয়ে বনমানুষের হাড় জাগায় একটা ভাব। ভাবের ইতর-বিশেষের কথা ছেড়ে দিয়ে দেখ—এক থলি টাকা দেখে যে ভাব হয়, এক থলি

মোহর কি একখানা কোম্পানির কাগজ দেখে ভাবটা সেই একই রকম হয়, কেবল মাত্রাটা বেশি হয় মাত্র। যে-রস দেয় খাদ্য সে-রস দেয় না অর্থ, এক থাল মোয়া সম্পূর্ণ অন্য ভাব দেয় এক থলি মোহর থেকে। যেসব জিনিশ নিয়ে মানুষ খেললে যাদের সঙ্গী করে পেলে লীলায় এবং কাজেও বটে, এমনকি যাদের চিবিয়ে খেয়ে ফেললে পর্যন্ত, তাদের সঙ্গেই ভাব হয়ে গেল মানুষের—একটা কোনো-না-কোনো রকমের ভাব। ধুলো নিয়ে খেলে, ধুলো তুলে মুখে পোরে ছেলে—ধুলো-কাদার সঙ্গে তার রকমরকম দিক দিয়ে ভাব, এমনি টাকার সঙ্গে ভাব হল কারু জুয়োখেলার দিক দিয়ে, কারু খাওয়া-পরার গাড়ি-ঘোড়ার স্বপ্নের দিক দিয়ে। খুঁটিনাটি তারতম্য নিয়ে দেখতে গেলে দেখি রসের রকম ভাবের রকম অনেকগুলো—রস কেবল নয়টা নয়, রস অনন্ত, ভাবও গোটাকতক নয়, ভাব অনন্ত।

রূপের বেলায় শাস্ত্রকার বললেন 'রূপভেদাঃ'—লক্ষ্য রইল রূপে রূপে ভেদ নির্দেশ করা। মান পরিমাণের বেলায় তেমনি বললেন 'প্রমাণানি'—বহুবচন দিয়ে নির্দেশ করা হল ভিন্ন-ভিন্ন রূপের জন্য বহু প্রমাণ। ভাবের বেলায় বললেন 'ভাবযোজনম্'—রূপকে ভাবের সঙ্গে যুক্ত করা চাই, ভাব যোজনা করতে হবে রূপে। এতে করে বোঝাচ্ছে যেভাবে রূপের সঙ্গে তার মান পরিমাণকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেভাবে ভাবকে পাচ্ছি না—বস্তুরূপ রয়েছে একঠাঁই, ভাব রয়েছে অন্য ঠাঁই। বলে থাকি ভাবযুক্ত কথা ভাবযুক্ত রূপ, ভাবযুক্ত লেখা, ভাবযুক্ত সুরসার ছবি মূর্তি, কাজের সময় কিছু-একটা দেখে বলিও আমরা এটা ভাবযুক্ত অন্য কিছু সেটি ভাবযুক্ত নয়। সকালের ভাব সন্ধ্যার ভাব দিনের ভাব রাতের ভাব এসব বুঝতে দেরি হয় না আমাদের, জীবনটা দিনরাতের মধ্যদিয়ে চলতে-চলতে ওদের সঙ্গে খানিক ভাব করে নিয়েছে। এমনি আরো জগৎসুদ্ধ জিনিস কারু সঙ্গে কাজের সম্পর্ক কারু সঙ্গে বা বাজে একটা সম্বন্ধ নিয়ে চেনাশোনা ও পরিচয় করে যাচ্ছি আমরা, চেনা পরিচয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যাদের কাছে পাই তাদের ভাবের খানিকটা পেয়ে যাই সেই সূত্র ধরে ক্রমে বন্ধুতা থেকে আত্মীয়তা পর্যন্ত ঠেকে গিয়ে ভাব হয় উভয় পক্ষে।

অবসরের অভাব ভাব বোঝার ব্যাঘাত ঘটায় অনেক ক্ষেত্রে—কেরানির অবসর নেই সকাল সন্ধ্যা অন্তরে অন্তর মিলিয়ে ভাব করে নেওয়া, কবির সে অবসর আছে। সামান্য অবসর সেখানে দু-একদিক দিয়ে অল্প ভাব, অনেকখানি অবসর সেখানে বহু দিক দিয়ে অনেকখানি ভাব। সহজে ভাব করতে চট করে ভাব ধরতে পাকা থাকে এক-একজন—তারাই ভাবুক। পুজোর কনসেশন পেয়ে যেন আমরা সবাই ছুটেছি নতুন-নতুন দৃশ্য ও দেশের মধ্যে দিয়ে নতুন-নতুন জিনিশ দেখতে-দেখতে, সবাই কিছু আমরা ভাবুক নয়, সুতরাং ভাব হয়েও হল না আমাদের যা দেখছি যা শুনছি যা নাগালের মধ্যে আসছে চোখের হাতের মনের তাদের সঙ্গে। ভাবুকের বেলায় এমনটা হয় না, সে ভাব কুড়োতে-কুড়োতে চলে যাত্রার আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত, সে যখন ছুটির শেষে দেশে ফেরে ফেরার পথেও ভাব করে নিতে আসে সবার সঙ্গে, ফিরে এসেও সে চলে নতুন থেকে নতুনের সঙ্গে ভাব করে নিয়ে। আর আমি যে ভাবুক নয় আমি আসি মাত্র নতুন দেশ দেখে বেশ খেয়ে মোটা হয়ে শীত কি গ্রীষ্ম বেশ ভোগ করে জলে স্থলে ঘুরে অনেকখানি স্বাস্থ্য নিয়ে—অনেকখানি ভাব নিয়ে নয়। একটা কিছুর তত্ত্ব জানা এক, আর ভাব জানা অন্য। বিশ্বের শিল্পকার্যের পুরাতত্ত্ব জানলেম এবং তাদের ভাবটা জেনে নিলেম—এই নিয়ে তফাত তত্ত্ববিদে আর ভাবুকে।

কোনোকিছুর হৃদ্‌গত ভাব বাইরের কতকগুলো ভঙ্গি দিয়ে ধরা পড়ে। রচনার ভঙ্গিতে কথার ভঙ্গিতে সুরের ভঙ্গিতে ওঠাবসা চলাফেরার ভঙ্গিতে ধরা পড়ল ভাব তবেই তো

পেলেম মনের সঙ্গে মিলিয়ে বস্তুটির আসল রসটা। শাস্ত্রকার বলেছেন, "যাহা গ্রীবা তীর্যককরণ ও ভ্রূনেত্রাদির বিকাশকারী তথা ভাব হইতে কিঞ্চিৎ প্রকাশক তাহাকে 'হাব' কহা যায়।" অন্তরের মধ্যে কুলুপ দেওয়া থাকে তো ভাব হয় না, কুলুপ খুলল তো ভাব হয়ে গেল এতে ওতে তাতে। হাবভাব দিয়ে সহজে জানা গেল এবং জানান দেওয়া চলল মনে কী আছে। চোখের ইশারা হাতের ভঙ্গি ইত্যাদি সব ব্যাপার এবং গলার স্বর ইত্যাদি—এরা হল ভাবপ্রকাশের ভাষা। সকালের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ জানাচ্ছে রঙের ভাষায় নানা ভাব, একমাত্র ভাবুক জানে এই ভাষা যা দিয়ে মেঘ যাচ্ছে জানিয়ে ভাব-ফুল ফুটছে এবং ঝরছেও জানিয়ে ভাব। যখন কবি একটি গাছকে সবুজপরী বলে বর্ণনা করলেন তখন এটা হতে পারে যে কবি নিজের মনের ভাবটা গাছেতে আরোপ করে গাছকে দেখছেন পরীরূপ, আবার এও হতে পারে যে গাছটি সত্য সত্যই আপনাকে ধরেছে কবির সামনে পরী সেজে। যাত্রার অধিকারী যখন যাত্রার পালার জন্য গেল কবির কাছে তখন কবি নিজের কল্পনার সাহায্যে মনোমতো করে পাত্রপাত্রীদের সাজিয়ে ছেড়ে দিলেন। সেখানে রূপসমস্ত কবির কল্পনার কবির ভাবের দ্বারা মণ্ডিত হল—যেমন ভীমের কল্পনা রাবণের কল্পনা। ভীম ও রাবণ চাক্ষুষ হল না কবির কাছে কিন্তু কবির দেওয়া সাজ ধরল এক-একটা ভাব ও রস ভীষণ মূর্তিতে। ধরো কবি যখন বললেন উপমা দিয়ে 'সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব'—এখানে ভাবটা তিনি মন থেকে আরোপ করছেন এও বলতে পারো, আবার লতার মতো অনেক রূপসী ও রূপসীর মতো অনেক লতা প্রত্যক্ষ দেখে এই কথাগুলি কবি বলছেন এও বলতে পারো। পঞ্চমুখী রুদ্রাক্ষ রুদ্রের ভাব ভঙ্গি আকৃতি প্রকৃতি কিছুই নেই তাতে, অথচ শিবত্ব সম্পূর্ণ আরোপ করে দেখলেন ভক্ত, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র তাতে দেখলেম সোনার থালের ভাবটা, ফুলে দেখলেম ফুলকুমারীকে,—সেখানে নিজের মনোভাব বা কল্পনা আরোপ করে দেখতে হল না, ভাবটা বস্তু থেকেই পেয়ে গেলেম। এইভাবে বলতে পারি আরোপিত ভাব এবং আহরিত ভাব এই দুই রাস্তায় চলাচলি ভাবুকের মনের। কেন যে একটা ভাবে একটা কিছুকে দেখি আমরা তার সঠিক হিশেব সব সময়ে খুঁজে পাওয়া যায় না। পেঁচাটা রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে চলাফেরা করে, চিৎকারটা বিকট পেঁচার, সুতরাং নিশাচর বলে একটা ভয়ের ভাবের সঙ্গে জড়িয়ে দেখার অর্থ বুঝি, কিন্তু কাক সে দিব্যি দিনের আলোতে দেখা দেয়, রঙটাও তার কালো কৃষ্ণের মতোই সুন্দর চিকণ কালো, কেন যে যমদূত ভেবে ভয় খেলে মানুষ তাকে তার অর্থই পাইনে। যার ভাবটা ঠিক বোঝা যায় না তাকে ভয়ের ভাবে দেখি আমরা, আবার যা ভালো বুঝি না এমন গভীর রহস্যেঘেরা কিছু সেও ভাব নিয়ে মনকে টানে। চাঁদনী রাত সেখানে ভাবুকের আনন্দ, হয়তো যে ভাবুক নয় তারও আনন্দ, সুতরাং দুজনেই নাহয় জোছনাারাতকে একটা ফুটন্ত ফুলের মতো আনন্দরূপ বললে, কিন্তু রাত্রির ভাব বুঝিনে সবাই যেখানে অন্ধকারে, যে ভাবুক নয় সে ভয়ে চুপ রইল কিন্তু ভাবুক সে গভীর রাতের স্তব্ধ ভাব দেখে ভাবে বিভোর হয়ে কত কথাই বলে চলল দেখি।

দিনে বোধ করি চারিদিকে জাগ্রত ভাব, রাতে বোধ করি সুপ্তির ভাব এবং এই দুই ভাবেতে করে সত্যিই আমাদের ঘুম ভাঙায় ঘুম পাড়ায়ও। উৎসবের রাত আলোতে আলো হল, নাচে গানে আনন্দে পরিপূর্ণ হল, ঘুম এল না তখন, রাত পোহাল জেগে-জেগে কোথা দিয়ে, কিন্তু যেমনি উৎসব বন্ধ হল অমনি আলস্যের ভাব এসে ধরল চেপে, ঘুম এল, মনমরা হয়ে থাকলেম শুয়ে যদিও জানি তখন বেলা দুপুরের জাগরণে সবাই জেগে বিশ্বে। বিচিত্র রকমে হয় ভাবের ক্রিয়া চরাচরের যা-কিছু তার উপরে।

একটা গাছ এক মনোভাব নিয়ে দেখলেম একরকম, পরমুহূর্তেই অন্য ভাব নিয়ে দেখলেম সে অন্যরূপ। একই বস্তুকে আমি দেখি একভাবে, তুমি দেখ অন্যভাবে। ফুল-পাতায় সেজে এই দেখা দিলে গাছ একভাবে, ফুল পাতা ঝরিয়ে দেখা দিলে সেই গাছই আবার অন্যভাবে। আমরা কখনো নিজের ভাবে চরাচরকে বিভাবিত দেখি কখনোবা নিজের অন্তরকে বিভাবিত দেখি চরাচরের ভাবের দ্বারা। ভাবুকের রচনা থেকে এবং আমরা নিজের-নিজের কাছ থেকেও এর প্রমাণ পাই।

সূর্যের আলোয় রুদ্র তেজস্বিতা ইত্যাদি অনেক ভাব, চাঁদের আলোয় শীতল কান্ত নানা ভাব। সূর্যের একরকম ভাব, জলের একরকম, আকাশের অন্যরকম ভাব। ঋতুতে-ঋতুতে চরাচরের ভাবপরিবর্তন এসব চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভাবের ক্রিয়ার। অবস্থাভেদে ভাবভঙ্গির ভেদ, ভাবের ভেদে নানা অবস্থাভেদ দেখতে পাই আমরা;—শয়ন, উপবেশন, গমন, গমনের ইচ্ছা, হাত-মুখ-চোখ ইত্যাদি নেড়ে বলা-কওয়া, সভাতে গম্ভীর হয়ে বসা, পাতে বসে যাওয়া ভোজে, বর সেজে আগমন, তালঠুকে মারামারি করতে যাওয়া, খেলা করতে এগোনো, কোমর বেঁধে কাজ করতে চলা, নৃত্য করা ঘুরে-ফিরে তালে তালে, যেন নাচব এইভাবে নড়ে-চড়ে ওঠা আনন্দে—ক্রীড়া-কৌতুক নিদ্রা সব অবস্থাতেই ভাব এক-এক রকম, ভঙ্গিও এক-এক রকম; ভাব থেকে ভাবান্তর, অবস্থা থেকে অবস্থান্তর—এই হল চরাচরের গতিবিধির নিয়ম।

হাবভাব দিয়ে আসল ভাবটা ব্যক্ত করা হয় যেমন তেমনি আবার হাবভাব দিয়ে আসল ভাবটা—যেটাকে বলতে পারি স্বভাব অভিপ্রায় (ইনটেনশান)—তাকে গোপন করাও হয়; যে চাবি খুললে তালা সেই চাবিই বন্ধ করলে তালা। অভিনেতাকে নিজের ভাবটা ধরে চললে তো চলে না, কেননা নিজের মনোভাব যাই থাকুক সেটা গোপন রেখে নায়কের ভাবটা অভিনয় করে দেখাতে হয়। হয়তো বাড়িতে কোনো দুর্ঘটনার চিন্তায় মুহ্যমান অভিনেতা, কিন্তু দেখাতে হচ্ছে অভিনয়ক্ষেত্রে তাকে বেশ স্ফূর্তিবাজ নায়কের ভাব। চোর তার মনে- মনে কুভাব, কিন্তু বাইরে দেখাচ্ছে সাধুর ভাব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। ছবিতে কবিতায় ভাব একেবারে গোপন রাখলে রচনার উদ্দেশ্য মাটি হয়, কাজেই নানা ব্যঞ্জনা নানা ভঙ্গি দিয়ে কোথাও ভাবকে সুপরিস্ফুট কোথাও অপরিস্ফুট করে দিয়ে কাজ চালাতে হয়। ভাব ভাবাভাস ভাবোদয় ভাবসন্ধি ভাবসরলতা এমনি ভাবের নানা দিকের কথা অলঙ্কারশাস্ত্রে বলা হয়েছে, এসবই কাজে আসে আর্টিস্টের রকম-রকম কাজের বেলায়। বিষয়টা এক কিন্তু কীভাবে তাকে প্রকাশ করা হল লেখায় বা চিত্রে—এই নিয়ে প্রভেদ এক রচনাতে অন্য রচনাতে। চন্দ্রোদয় জলের ধারে সে এক ভাব, চন্দ্রোদয় বনের শিয়রে সে আর-এক ভাব—'চন্দ্রোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশিঃ'—এ এক ভাবের ছবি জলের ঢেউয়ের গুটিকতক টান আর পূর্ণচন্দ্রটির আভা—জাপানের আঁকা ছবির ভাব। আবার 'শারদ চন্দ্র পবন মন্দ বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ'—এখানে আর-এক ছবি আর-একভাব যেন কাংড়ার কোনো শিল্পীর আঁকা ছবিখানি, হুবহু সেই ভাব। এখন কবি কালিদাসের চন্দ্রোদয়ের ছবি থেকে পাচ্ছি জলরাশির স্ফীত ও উচ্ছ্বসিত ভাব—এপার ওপার নেই কেবল ফুলে-ফুলে উঠছে জল আর জল, চাঁদ উঠি-উঠি করছে—এই ভাব এই ভঙ্গি এই অবস্থা। আবার ছেলে-ভুলোনো ছড়ার অজানা কোনো-এক কবি—তাঁর চন্দ্রোদয়—'দুলতে দুলতে বান এসেছে, জলে কত চাঁদ ভেসেছে, সোনার বরণ সোনার চাঁদ!' চাঁদের আলোয় কোনো নদী বইছিল গাঁয়ের ধারে সেই দেখে ভাব জাগল গেঁয়ো কবির কিন্তু কাজটা হল আর্ট হিশেবে কালিদাসের চন্দ্রোদয়ের সমানই ভাবের জিনিশ। যে ভাবুক সেসব জিনিশেই ভাব যোজনা

করে দিতে পারে, ভাব জাগাতেও পারে সামান্য অসামান্য সব জিনিশ দিয়েই; এক আঁজলা ফুল একমুঠো পুঁতি বা মোতি এগুলোকে ভাবযুক্ত করে দেওয়া সহজ কর্ম নয়।

প্রথম রাত্রে সুভদ্রার অভিসার অর্জুনের কাছে নির্মল হয়েছিল, তারপর আর্টিস্ট সত্যভামার হাতের একটু পরশ যখন সুভদ্রাকে ভাবময়ী করে ছেড়ে দিলে তখন ভাব হয়ে গেল অর্জুনে সুভদ্রায়। মালিনী সে যে হার গেঁথে দিলে সুন্দরকে, তা তো শুধু ফুলহার হল না, ভাবের বেড়িও হল। শ্বেতপাথর গেঁথে-গেঁথে ইমারত সাহেব-কোম্পানিও করেছে, কিন্তু কী পাথরের গাঁথনিই গাঁথলে তাজের নির্মাতা যা দেখে ভাবে বিভোর হতে হয় আজও কবি অকবি সবাইকে। ঈজিপ্টের পিরামিড তাকে কোনো অলঙ্কার দিয়ে সাজালে না আর্টিস্ট, কেবল ভাবযুক্ত করে ছেড়ে দিলে; একগোছা শুকনো পাতা—শীতের বাতাস তার রঙ ঢঙ হরণ করে মাটির উপরে ছড়িয়ে দিয়ে গেল শুধু একটু ভাবযুক্ত করে; এক পাট শাদা কাপড় তাতে সকালের শিশির—ভাব দিয়ে বুনে গেল আর্টিস্ট। বস্তু সামান্য ঘটনা সামান্য কিন্তু ভাবযোজনাতে অমূল্য অসামান্য অরূপ হয়ে উঠল সবাই—এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের ঘরে বাইরে যথেষ্ট ধরা রয়েছে। ভাব দিয়ে ধুলো-মুঠোকে সোনা-মুঠো করে দিচ্ছে আর্টিস্ট—এ রোজই ঘটছে চোখের সামনে আমাদের। ভাবুকের হাতে একতাল কাদা, একখানা পাথর, একটা কাঠ যেমন ভাব পায়, রূপ পায়, তেমনি কথাগুলো তেমনি সুরগুলোও ভাব পেয়ে যায় রূপ পেয়ে যায় যখন তখন বলতে পারি বস্তু ভাষা ও সুর এরা পাষাণী অহল্যার মতো জেগে উঠল ভাবের স্পর্শে।

ছবি যে লিখছে তার হাতে গোটাকতক রেখা আর তাদের গোটাকতক ভঙ্গি—দাঁড়ি কষি ইত্যাদি বোঝাতে রইল উন্নত আনত অবনত এমনি গোটাকতক অবস্থা, এই নিয়ে ভাবুক সে কখনো একটান কখনো দু টান মিলিয়ে এক-একটা ভাবযুক্ত রূপ লিখছে, রেখার ভঙ্গি দিয়ে জানাচ্ছে—বক দাঁড়াল, বক উড়ল। বক ঘুমোল, উড়ি-উড়ি করছে বক, চলি-চলি করছে বক—এমনি নানা ভাব নানা ভঙ্গি গোটাকতক রেখায়-রেখায়। ঝরনা ঝরছে, সমুদ্র গর্জন করে ফুলছে—সবার ভাব রেখার ফাঁদে ধরে নিচ্ছে ভাবুক ও আর্টিস্ট। দপ্তরি তো রেখা-বিষয়ে পাকা কিন্তু কই তার দ্বারা তো ভাবযুক্ত রেখা টানা কোনোকালেই হয় না। রূপের আর বস্তুর মূল্য তার ভাবসম্পদে না হলে একটুকরো পাথর ছেঁড়া কাগজ দুটো-একটা রঙ বা রেখা তার মূল্য কী?

রূপকথায় শুনেছি—পাতার ঠোঙায় কোনো-এক রাজকন্যার একগাছি চিকন কেশ তাই দেখে বিভোর হল ভাবে রাজপুত্র। এটা রূপকথা সুতরাং কথার কথা বলতেও পারো, কিন্তু আকাশের প্রান্তে কাজল মেঘের সরু একটি টান সেটা দেখে যে কবির ভাব জাগে তার কী! শুনেছি চীনদেশে তারা একটা তুলির টান দেখে রস পায়। শাদা কাগজে একটি টান, অন্ধকারে, একটি আলোর রেখা—এসব ভাব কিনা পরীক্ষা করে দেখলেই পারো।

জোর করে কারু সঙ্গে ভাব হয় না, জোর করে রচনাতে ভাব ঢোকানো চলে না। অভিনেতা কিংবা গায়ক যখন একেবারে চোখ আকাশে তুলে কতকগুলো কৃত্রিম হাবভাব করে তখন ধরা পড়ে যায় তার চেষ্টা আপনা হতে, এমনি ছবিতেও একটা যেমন-তেমন কিছুকে খানিকটা ভঙ্গি দিয়ে ছবির নিচে বড় কবির একটা কবিতা জুড়ে টেনেবুনে ভাবযুক্ত ছবি করতে চললে রচয়িতার ও রচনার ভাবের অভাবই অনেকখানি ব্যক্ত করা যায়। আর্টিস্ট নানা উপায়ে ভাবযোজনা করে থাকে রূপরচনাতে। প্রথমত ডৌল দিয়ে ভাবটা প্রকাশ হল, তারপরে সাজসজ্জা দিয়ে ভাব প্রকাশ হল, অঙ্গভঙ্গি ও সাজগোজ এই দুই দিয়ে ছবিতে মূর্তিতে ভাবটা ধরা পড়ল।

কুটির আর রাজবাড়ি দুটোর ভাব—ডৌল ও সাজ দুই মিলিয়ে একটা। সিংহদ্বারে আর খিড়কির দরজায় আঙ্গিক ভেদ এবং সাজসজ্জাতেও ভেদ। এমনি অনেক সাজসজ্জা বোঝায় উৎসবের ভাব, সাজসজ্জার অভাব বোঝায় উৎসবের অভাব দীনতা কত কী! অভিনয়ের সময়ে পরীকে দৈত্যকে খালি সাজ ও ডৌল দিয়ে প্রকাশ করি যেমন তেমনি ছবি মূর্তির বেলাতেও সাজের আর ডৌলের তারতম্য দিয়ে বোঝাই রূপের ভিন্নতা এবং ভাবেরও ভিন্নতা। পৈতের দিনে হঠাৎ ছেলেটা মাথা কামিয়ে গেরুয়া বসন পরে দণ্ড কমণ্ডলু ধরে যে হুবহু দণ্ডী বনে যায় তার মূলে সাজ আর ডৌল ফেরানোর কায়দা। বিয়ের দিনে বরবধূর ভাবযুক্ত রূপ এই কৌশলেই প্রকাশ হয় চোখের সামনে। এগুলো হল সহজ উপায় আর্টিস্টদের হাতে, ভাব ফোটাতে চলে তারা নানা রঙ-চঙ ইত্যাদি দিয়ে। এখন একটা দোকানঘরের ভাব আছে, বসতঘরের ভাব আছে,—দোকানির তৈজসপত্র দিয়ে বোঝানো গেল দোকানটা, বসতবাড়ির নানা জিনিশ দিয়ে বোঝালেম এটা বসতবাড়ি; কিন্তু সাহেব-কোম্পানির দোকান সেখানে বাড়ির ডৌল রাজবাড়ির মতো, ভিতরের সাজও যেন একটি ড্রয়িংরুম বৈঠকখানা কি দোকান বোঝাবারই জো নেই—এখানে দোকানি আসবাব খানিক জুড়ে তবে বোঝাতে হল এটা দোকান। কাজেই দেখতে পাচ্ছি কি বাইরের দৃশ্যটার ভাব কি নিজের অন্তরের ভাব দুই কাজেই আর্টিস্টকে ভাবোপযোগী রেখা রূপ প্রভৃতি জুড়ে দিতে হয় রচনাতে—একেবারে পরিকল্পনা বাদ দিয়ে কাজ হয়ই না। খেতাবে রাজা মহারাজা—সত্যিও হয়তোবা একটা রাজ্যেশ্বর, কিন্তু তার স্বাভাবিক ভাবখানা সাধারণ রকম, সুতরাং রাজা বলে তাকে চালানোই চলল না খালি ফটো দিয়ে, কাজেই তার ডৌল মান পরিমাণ ভাব ভঙ্গি সব ফেরালেম তবে পেলেম রাজরূপটি রাজভাবটি।

কথাই আছে—'কামালে জোমালে বর আর নিকোলে জুকোলে ঘর।' ডৌল ও সাজ ফেরানোর সঙ্গে ভাবের হেরফের ঘটে ছবিতে মূর্তিতে এটা জানা কথা। শুধু সাজ ফিরিয়ে-ফিরিয়ে আমাদের অনেকগুলি দেবতার রচনা হয়েছে—ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবদেবী, কেবল মুদ্রা আর সাজের পার্থক্য নিয়ে ভিন্ন-ভিন্ন রকম হল। আবার ডৌলের ভিন্নতা নিয়েও অনেক মূর্তি রয়েছে, যেমন—গণেশ কৃষ্ণ নটরাজ বুদ্ধ ইত্যাদি সমবঙ্গ ত্রিভঙ্গ অতিভঙ্গ মূর্তি সব। বিষ্ণুমূর্তি আর সূর্যমূর্তি দুয়ের ভিন্নতা ভাব দিয়ে হল না কিন্তু সাজসজ্জার একটু-আধটু অদল-বদল নিয়ে হল, আবার গণেশ আর বংশীধারী কিংবা নটরাজ ও বুদ্ধ সবাই আলাদা-আলাদা ভোল নিয়ে পৃথক-পৃথকভাবে দেখা দিলে। এখন দেখি যে কোনো কিছুর ভাবটি নানা উপাদান নানা উপায় ধরে প্রকাশ করা চলল। একটা ঝরনার ভাব কোনো আর্টিস্ট ফোটায় সেটি ঝরনা পাহাড় আকাশ ইত্যাদি নানা সামগ্রী জুড়ে একটা ছবি করে, আবার কোনো আর্টিস্ট শুধু মস্ত পটখানায় গোটাকতক জলের ধারা মাত্র টেনে বুঝিয়ে দিলে ভাবখানা। কিন্তু দুই আর্টিস্টের কেউ ঝরনাকে বাদ দিয়ে কিছু করলে না; শুধু একজন ঝরনার সঙ্গে তার আশপাশকে জুড়ে দেখালে, অন্যজন জলধারাটুকু মাত্র পৃথক করে নিয়ে ধরলে পটে—ঝরনা বাদ গেল না কোনো ছবিতেই। এইবার যাকে নিয়ে কথা—যার রূপ ও ভাব ফোটানো—তার নিজ মূর্তিটা বাদ দিয়ে স্বতন্ত্র উপাদান দিয়ে তাকেই প্রকাশ কেমন করে হয় দেখ। একটি সন্ধ্যা ভাব দুখানা মাণিক আর একটি পিদুম দিয়ে ফুটল, যথা—

সায়মণির কোলে
রতন মণি দোলে
দুর্গাপিদিম ঝলে।

শুধু কবিতাতেই যে এইভাবে তাকে ফোটানো চলল তা নয়। সংগীতে উপাদান উল্টে-পাল্টে ভাবের প্রকাশ হয়—যেমন সকালের ভৈরবী সন্ধ্যার পূরবী; কিংবা গড়ের বাদ্যির মার্চ সুর দিয়ে সকাল। সুর দিয়ে সন্ধ্যা, সুর নিয়ে যুদ্ধ। মূর্তি গড়ে এমনটা করা সহজ নয় তবু তাজমহলটা অনেককে বাড়ি না হয়ে নারী হয়ে দেখা দিয়েছে! অলঙ্কারশিল্পে এর প্রমাণ জলতরঙ্গ চুড়ি ও শাড়ি, গঙ্গাজলি কাপড়—এমনি কত কী জিনিশে বর্তমান। প্রতীক চিত্রেও এর নিদর্শন দেখি, যেমন পদ্মপত্রে জলবিন্দু, জগৎ-সংসারের ভাবটা বোঝালে।

এককে ভাব ভঙ্গি সব দিক দিয়ে অন্যের প্রতিম করা—এই হল সোজা রাস্তা ভাবরাজত্বের, আর-একটি রাস্তা হল প্রতীকের রাস্তা—কাক দিয়ে বক বোঝানোর মতো একটা রাস্তা—যাকে বলতে পারো ঘুরুনে রাস্তা। বাধা নেই কারু এই দুই পথেই চলার কিন্তু আর্টিস্ট না হলে চলতে গিয়ে পদে-পদে ঠকতে হয় এবং অপ্রযুক্ততা নিহতার্থতা প্রতিকূলবর্ণতা প্রসিদ্ধিত্যাগ দূরান্বয় প্রকাশিতবিরুদ্ধতা প্রভৃতি নানা অলঙ্কারদোষে ঠেকতেও হয়।

ভাবের আদানপ্রদানের সম্বন্ধ নিয়ে মিললেম রূপসমস্তের সঙ্গে তবেই হল যথাভাবে পাওয়া—আপনার করে পাওয়া কোনোকিছুকে, এইজন্য অনেকে বলেছেন আর্ট ইজ লভ—আর্টের মূলে ভালোবাসা। ভাব বুঝলেম তো ভাব হল এবং তা থেকে ভালোবাসাও জন্মাল, তখন তাকে নিয়ে ছবিই আঁকি মূর্তিই গড়ি কবিতা গান যাই করি—সেটি ভালো এবং ভাবের জিনিশ হল এবং অন্যের কাছেও আদর পেলে রচনাটি। প্রথম আপন করে নেওয়া ভাব করে, তারপর সেটিকে সকলের আপন করে দেওয়া ভাবযুক্ত করে—এই হল কৌশল আর্টিস্টের। আমার আপন যে হল তোমারও আপন সে হল—এই কৌশল আর্টের।

মায়া পড়ে যায় আমাদের অনেক জিনিশে কিন্তু যথার্থ ভাব হয় না। তাতে করে অনেকদিন যেখানে বাস যাদের সঙ্গে ঘরকন্না মায়া পড়ে তাদের উপর—ভাব থাক বা নাই থাক কিছু আসে যায় না। অনেক বন্দির কারাগারের উপরে একটা মায়া পড়ে যায় অনেকদিন সেখানে বন্ধ থেকে, পোষা পায়রার মায়া পড়ে যায় বিশ্রী খাঁচাটার উপর, কিন্তু এতে করে খাঁচার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে পায়রার তা জোর করে বলতে পারিনে, কেননা 'অঘটনপটীয়সী মায়া'। ঈশ্বর গুপ্তের মায়া পড়েছিল পাঁঠার উপরে এবং তিনি পাঁঠার উপরে কবিতাও লিখেছেন, কিন্তু সেটাকে কোনোদিন ভাবযুক্ত পদার্থ বলে ভ্রম হয় কারু? থেলো হুঁকোর উপরে মায়া পড়েছে শতসহস্রের কিন্তু থেলো হুঁকো কোনোদিন ভাবের প্রতিম বলে চলতে পারে এ বিশ্বাস করে কেউ? মায়া দিয়ে একটা বস্তু যুক্ত হতে পারে কেবল আমারই সঙ্গে কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার মিলন ঘটে না। দেশটার উপরে মায়া আছে কিন্তু তাই বলে দেশটার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে এ-কথা বলা চলে না। ভাবের জিনিশ সে মায়ার অতীত জিনিশ, কেননা সত্যভাবে তাকে লাভ করি আমরা এবং সেই কারণেই সত্য হয়ে ওঠে সে অন্যের কাছেও।

লাবণ্য

লাবণ্য সম্বন্ধে 'উজ্জ্বলনীলমণিকার' বললেন, 'মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় এবং স্বচ্ছতাপ্রযুক্ত অঙ্গসকলে যে চাকচিক্য প্রতীয়মান হইয়া থাকে তাহাকেই লাবণ্য বলে।' শ্রীরাধার অঙ্গদ্যুতির সঙ্গেমণিময় মুকুর এবং শ্রীকৃষ্ণের বক্ষদেশের সঙ্গে মরকত-মুকুরের তুলনা দিয়ে এটা বোঝালেন রসশাস্ত্রকার। বৈষ্ণব-কবিতায় লাবণি-শব্দ অনেকবার ব্যবহার হচ্ছে দেখি—'ঢল ঢল কাঁচা সোনার লাবণি'। বৈষ্ণব কবিদের মতে লাবণ্য হল—প্রভা, দীপ্তি, স্বচ্ছতাবশত ঔজ্জ্বল্য, চলতি কথায় পালিশ বা চেকনাই। অভিধানের মানের সঙ্গে মিলছে না—লবণস্য ভাবঃ অর্থাৎ লবণিমা কথাটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে স্বাদের, যাকে ইংরেজিতে বলে টেস্ট তাই। রূপ দিয়ে প্রমাণ দিয়ে ভাবভঙ্গি দিয়ে যা রচনা করা হল তা টেস্টফুল বা লাবণ্যযুক্ত করা হল তো হল ভালো। 'ভাবলাবণ্যযোজনম্'—ভাবযোজনা এবং লাবণ্য-যোজনার কথা বলা হয়েছে চিত্রের ষড়ঙ্গে। যাতে যেটা নেই তাতে সেইটি মেলালেম যখন তখন বললেম—এটি যোজনা করা গেল। রূপকে বা রূপরেখাকে ভাবযুক্ত করার সঙ্গে-সঙ্গেই লাবণ্যযুক্ত করার কথা উঠল। রন্ধনশিল্পে লবণিমা ও লাবণ্যের যোজনা একটা বড়রকম ওস্তাদি, সেখানে বেশি লবণ কম লবণ দুয়েতেই বিপদ আছে। রান্নাতে যখন নুন মিশল তখন সমস্ত জিনিশের স্বাদটি ফিরিয়ে দিলে লবণ-সংযোগ, লবণ জিনিশটাও তখন পৃথক নেই, সবার সঙ্গে মিলে একটা চমৎকার স্বাদে পরিণত হয়ে গেছে। তেমনি সকল রচনার বেলাতেই সূপকারের মতো রূপকারও একটুখানি লাবণ্য যোগ করে, যাতে করে স্বাদু হয়ে ওঠে রচনাটি।

রসশাস্ত্রকার বলেছেন—'মুক্তাকলাপের অন্তর হইতে যে ছটা বহির্গত হয় তাহাকে লাবণ্য বলি।' এতে করে বোঝাচ্ছে রূপের প্রমাণের ভাবের অন্তর্নিহিত হয়ে বর্তমান থাকে লাবণ্য, শুধু শিল্পীর অপেক্ষা রচনার কৌশলে সেটিকে প্রকাশ করা। খনির মধ্যে সোনা যখন আছে তখন লাবণ্য তার থেকেও নেই, কারিগরের হাতে পড়ল তো লাবণ্য দেখা দিলে সোনায়—'ঢল ঢল কাঁচা সোনার লাবণি'; মুক্তার বেলাতেও এই কথা—আর্টিস্টের স্পর্শসাপেক্ষ হল লাবণ্য। যিশুখ্রিস্ট বলছিলেন, 'Ye are the salts of Earth'. এ-কথার দুটো অর্থ হয়—মাটির নিমকে তোমরা মানুষ, কিংবা ধরাতলের লাবণ্যই তোমরা, মর্ত্যজীবনে স্বাদ দিতে তোমরা। আজকের বায়োকেমিক মতে মানুষ নানাপ্রকার লবণের সমষ্টি—এটা খ্রিস্টের আমলে জানা ছিল কি ছিল না জানা যায় না—কিন্তু বহুপূর্ব থেকে মানুষ লবণ নিমক লবণিমা নানা অর্থে নানা ভাবে প্রয়োগ করছে দেখা যায়। এককথায় বলতে হলে বলতে হয়—স্বাদ ফিরে যায় যার দ্বারা এবং স্বাদ করে তোলে যে বস্তুকে কিংবা রচনাকে সেই হয় লাবণ্য।

মুক্তাফলের লাবণ্য একরকম, হীরকের লাবণ্য অন্য, পাকা কাঁচা আমের লাবণ্য, মানুষের কালো চামড়ার লাবণ্য, শাদা চামড়ার লাবণ্য, মাথাঘষা দিয়ে মাজা চুলের লাবণ্য, গন্ধতৈলে চিক্কণ-চুলের পাকা চুলের কাঁচা চুলের লাবণ্য—সবাই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রকমের। কড়ি-দিয়ে মাজা সুতোর কাপড় যে-লাবণ্য সিল্কের কাপড়ে সে-লাবণ্য নহে, পাথরবাটির লাবণ্য আর

চীনের বাটি কি সোনা-রুপোর বাটির লাবণ্য সমান নয়। লাবণ্য প্রচ্ছন্ন রইল এবং লাবণ্য প্রকাশ পেল এটা বলা চলল, লাবণ্য হারাল বস্তুটি এও বলা গেল। নতুন টুকটুকে মলাটের বইটি, নিভাঁজ-ধোয়া কাপড়খানি, হাতে-হাতে চটকা-চটকিতে হারিয়ে ফেললে লাবণ্য—রঙ জ্বলে গেল, ধোপ মরে গেল, অপছন্দ করলে সাধারণ লোকে, কিন্তু আর্টিস্ট দেখলে দুটির মধ্যেই আর-একটুকু নতুন ধরনের লাবণ্য পুরাতনের স্বাদ দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। অলঙ্কারশিল্পে ওল্ড গোল্ড বাদ গেল না—উজ্জ্বল সোনা ম্যাড়মেড়ে সোনা দুই ধরনের লাবণ্য দেখল। পাথরের লাবণ্য সে পাথরের আছে, সোনার লাবণ্য সোনাতেই, জলের একটুখানি লাবণ্য আছে যেটা সমুদ্রে এক, নদীতে অন্যভাবে প্রকাশ পায়, মাটিতে জলের লাবণ্য নেই মোটেই—এখন নদীজল আঁকতে সমুদ্রজলের লাবণ্য দিলে যেমন বিস্বাদ হয় ছবিটা তেমনি মাটিকে জল করে লিখলেও ভুল হয়ে যায় জলে-স্থলে। তবেই দেখা গেল এক-এক বস্তুর ধাত বুঝে তবে ছবিতে লাবণ্য যোজনা করাই হল কাজ।

স্বভাবের নিয়মে গাছ পাতা ফুল স্বাভাবিক লাবণ্য পেয়েছে; ধুলো পড়ল, রোদে তাতল—লাবণ্যটুকু ঢাকা পড়ল; বৃষ্টিজলে ধোয়া হয়ে গেল গাছপালা—প্রকাশ হল পূর্বলাবণ্য তাদের। জলভর মেঘ সে এক লাবণ্য এক সোয়াদ দিলে চোখে ও মনে, জলঝরা মেঘ সে আর-এক লাবণ্য আর-এক সোয়াদ ধরলে সামনে।

লবণের সংযোগে বস্তুর স্বাভাবিক তারের সঙ্গে সুস্বাদ যেমন মিলছে দেখি রন্ধনশিল্পে তেমনি লাবণ্যের যোগে অন্যান্য শিল্পেও রূপ প্রমাণ ভাব সমস্তই চোখের এবং মনেরও তৃপ্তিদায়ক হয়ে উঠেছে এবং তখন দর্শকের শ্রোতার পাঠকের ভালো লাগছে রচনাটি! লাবণ্য তো অনুভব করি এবং চোখেও দেখি একসঙ্গে, অথচ জিনিশটা এমনই যে পাকাপাকি একটা ব্যাখ্যার মধ্যে ধরাছোঁয়া দিতেই চায় না। কথায় বলে মণিকাঞ্চন যোগ—পিত্তল ও মণি, কিংবা তাম্র ও মণি, দন্ত ও মণি, রজত ও মণি অজস্র শিল্পকাজে ব্যবহার হচ্ছে দেখি। মণি সোনায় বাঁধা হয়ে একটি লাবণ্য দেয়, পিত্তলে তামায় রৌপ্যে ও গজদন্তে বাঁধা হয়ে আর-একরকমের লাবণ্য পায় দেখি, এমনি শিল্প-রচনাটি ভাবভঙ্গির দিক দিয়ে মান-পরিমাণের দিক দিয়ে এবং রূপের দিক দিয়ে লাবণ্যের সংস্পর্শ পেয়ে গেল তবেই সুন্দর তার দিলে আমাদের। রূপ সমস্ত বিভিন্ন, প্রমাণ তারাও স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, ভাব সমুদয় নানা ভঙ্গিতে বিভক্ত, লাবণ্যের ঘেরে এরা এক হয়ে বাঁধা পড়ে যখন তখনই হয় মনোহর। সোনাতে সোহাগার কাজ করার মতো কাজ হল লাবণ্যের। 'মুক্তাফলেষু ছায়ায়া স্তরলত্বমিব'। তরঙ্গায়মান হচ্ছে এই লাবণ্য এই বললেন রসশাস্ত্রকার। রূপে প্রমাণে ভাবে একটা তরলতা দেয় লাবণ্য এই হল ভাবটা। যেসব রেখা রূপ দিতে আছে, মান-পরিমাণের বাঁধুনি শক্ত করে বেঁধে দিতে আছে, ভাবভঙ্গি বাঁধা রকমে প্রকাশ করতে আছে—সেইসব দস্তুরমতো টানা-রেখা রুল-কম্পাসের শক্ত-রেখা, তারি মধ্যে লাবণ্য যোজনা করা চাই তবে তারা আর্টের কাজে আসে—না হলে আফিসের দপ্তরখানার মিস্ত্রিখানার মধ্যেই বদ্ধ থেকে যায়। শাদা কথায় বলা গেল—উত্তরের আকাশে মেঘ লেগেছে; ঘটনাটা বোঝালে কাটা-কাটা কথাগুলো, কিন্তু নড়ে না চড়ে না যতটুকু বলবার বলে চুকল এক আঁচড়ে। এই কথাগুলোকে একটু গুছিয়ে বলা গেল—উত্তরেতে মেঘ লেগেছে;—কাটা-কাটা কথা বেশ একটু দোলন পেলে লাবণ্যের স্পর্শ হতেই। আরো সুন্দর হল যখন বললেন কবি—'মেঘৈর্মেদুরমম্বরম্' ইত্যাদি। লাবণ্যের ছন্দে ধরে লেখা যায় না বলেই গদ্য অনেক সময় কানে খটোমটো ঠেকে।

কবিতাতে ছন্দ গতি দেয় কথাগুলোকে, নানা লয়ে বিলয়ে পা ফেলে চলে কথাগুলো ছন্দের বশে। কথার লাবণ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা গেল না কিন্তু ছন্দে গাঁথা গেল

কথাগুলো, তাতে করে কাজ হল না—দু-এক ছত্র কবিতা থেকে বোঝাতে চেষ্টা করি। মা সরস্বতীর পাদপদ্মে যেন ভক্তি থাকে—এ হল নিছক কেজো কথা; এইটেই শুধু ছন্দে গেঁথে ফেললেম লাবণ্যের দিকে নজর না-রেখেই—

হে মা ভারতি! দিলাম প্রণতি
তোমারি সরোজ চরণে!

আবার আর এক কবি ঐ কথাই কথার এবং ছন্দের লাবণ্য বজায় রেখে বললেন—

নমি নমি ভারতি—
তব কমল চরণে।

শুধু ছন্দে গতিমান হয়েও কথা বেশিক্ষণ চলতে পারে না, লাবণ্য দিয়ে ছন্দে গাঁথা হল কথা, তবে হল রচনাটি উত্তম। এমনি ছবির বেলাতেও রূপরেখাগুলি লাবণ্য দিয়ে বাঁধা হল তবে হল কাজ।

গাড়ির চাকা মিস্ত্রি ঠিক ছন্দে বাঁধলে কিন্তু কারখানার বড় মিস্ত্রি দুচার পোঁচ চর্বি মাখিয়ে দিলে তবে নিখিরকিচ্ চাকা ঘুরল। আনাড়ির হাতের রান্নায় কিংবা তার প্রস্তুত করা জিনিশে লাবণ্যের অতিরেক কিংবা ব্যতিরেক ঘটেই—হয় বেশি নুন নয় কম নুন। পাউডার মাখলে তো এমন মাখলে যে একটা রাক্ষুসী সেজে দাঁড়াল মেয়েটা, ছেলেটা চুল বাগালে তা এমন ছাঁটন দিলে যে তার চেয়ে মাথাটা মুড়িয়ে এলে ভালো দেখাত। লবণিমার ওজন বোঝা সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার—সূপকারের পক্ষে এই কথা রূপকারের পক্ষেও ঐ কথা। এটা তো রোজই দেখা যায় যে, মাসিক পত্রের হাফটোন ও ত্রিবর্ণের ছবিতে আসলের লাবণ্যটি ভেস্তে যায় এবং কাগজওয়ালা সেইগুলো দেখেই আর্টিস্ট ও আর্ট-শিক্ষার্থীর মর্মান্তিক সমালোচনা করে বসে। আসল ছবির বিচিত্র বর্ণচ্ছটাকে তিন বর্ণের কাটছাঁটের মধ্যে ধরাতে জিনিশটার লাবণ্য আরবি থেকে বাংলাতে তর্জমা করার চেয়েও বেশি পরিমাণে ভেস্তে যায়, অথচ গম্ভীরভাবে সমালোচক বসে যায় চিত্র-সমালোচনায়, যথা 'হরপার্বতী' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—নিতান্ত কাঁচা; 'মুসাফির' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—ভালো; 'বিরহ যক্ষ' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—বেচারা যক্ষের অবস্থা শোচনীয়; 'পদ্মাবতী' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—গোড়াতেই রঞ্জনের অভাব, প্রস্ফুটিত না হইলেই ভালো হইত; 'ওমার খৈয়ামের ছবি' শিল্পী (অমুক)—পণ্ডশ্রম; 'আড়িপাতা' তিন বর্ণের, শিল্পী (অমুক)—তুলি ছাড়িয়া পেন্সিল ধরা আবশ্যক, ইত্যাদি ইত্যাদি। তিন বর্ণের রঙের টিনগুলোর উপরে বসে মাছি যদি চিত্র-সমালোচনা করতে চলে তবে সে-চিত্রের লাবণ্য বাদ দিয়ে রূপ বাদ দিয়ে রঙ বাদ দিয়েই বকে চলে যা-তা নিশ্চয়ই। চটকানো পদ্মে বসে ফুলের লাবণ্য সম্বন্ধে বলতে পারি যে অনেকখানি হারিয়েছে ফুল চটকানোর দরুন, কিন্তু ফুলের রচয়িতাকে উপদেশ দিইনে ফুলসৃষ্টি ছেড়ে মাসিক পত্রিকা লিখতে। এই লাবণ্য আছে বলেই সুকুমার-শিল্পের নকল দেখে আসলটাকে বোঝাই শক্ত হয় এবং সেজন্য অনেক সময়ে শিল্পীকে অযথা দায়-দোষে পড়তেই হয় কাগজওয়ালার কাছে।

আলো-মাখা হয়ে ফুল একটি লাবণ্য পাচ্ছে, ছায়াতে ফুল আর-এক লাবণ্য পাচ্ছে, শিশিরে-ধোয়া ফুল, বৃষ্টিজর্জর ফুল—লাবণ্য সবটাতেই রয়েছে শুধু অবস্থাভেদে লাবণ্যের বিভিন্নতা ঘটছে মাত্র। কবি কালিদাস বিরহী যক্ষকে একটি চমৎকার লাবণ্য দিলেন—'কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ'। এটা ম্যালেরিয়া রোগীর লাবণ্য বলে ধরা চলে না—অবস্থা-বিশেষে ক্ষীণ চন্দ্রকলার মতো লাবণ্যময় রূপটি দিয়েছেন যক্ষকে কবি; আবার যক্ষ যখন ফিরেছিল অলকায় তখনকার তার লাবণ্য যদি দিতেন কালিদাস তবে সেটা স্বতন্ত্র

রকমের নিশ্চয়ই হত। এমনি সকল দিকেই দেখব লাবণ্যের প্রকার-ভেদ হচ্ছে অবস্থা ও পাত্র ভেদে। অনেক জিনিশের সঙ্গে তুলনা দিয়ে লাবণ্যের প্রকার-ভেদ বোঝাতে চলেছেন প্রাচীন কবিরা, যেমন 'চম্পক শোণ কুসুম কনকাচল জিতল গৌরতনু লাবণীরে', কিংবা 'তপত কাঞ্চন কান্তি কলেবর', অথবা 'অখিল ভুবন উজারকারি কুন্দ কনক কাঁতিয়া', 'অপরূপ হেমমণি-ভাস অখিল ভুবনে পরকাশ' এই হল গৌরাঙ্গের লাবণ্য বোঝাতে অনেকগুলো ধাতু এবং ফুলের অবতারণা। তারপর শ্যামলাবণ্য বোঝাতে বলা হল, যথা— 'জনু জলধর রুচির অঙ্গ'; রাধাকৃষ্ণ দুজনের লাবণ্য বোঝাতে বলা হল—'ও নব জলধর অঙ্গ, ইহ থির বিজুরী তরঙ্গ; ও বর মরকত ঠাম, ইহ কাঞ্চন দশবাণ', আবার যেমন—'ও তনু তরুণ তমাল, ইহ হেম যুথী রসাল, ও নব পদুমিনী সাজ, ইহ মত্ত মধুকর রাজ, ও মুখ চাঁদ উজোর' ইত্যাদি। মানুষের লাবণ্য তারপর কাপড়ের লাবণ্য, তার বেলাতেও বললেন কবি—'বিজুরী বিলাসিত বাস', গলার হারের লাবণ্য—'হার কি তারক দৌতিক ছন্দ', হাসির লাবণ্য—'হাস কি ঝরয়ে অমিয়া মকরন্দ', পদতলের লাবণ্য—'পদতলে থলকি কমল ঘনরাগ', করতলের লাবণ্য—'করকিসলয় কিয়ে অরুণ বিকাশ'। শুধু রঙ বোঝাতেই নানা তুলনা তা নয় লাবণ্যটি বোঝানোর দিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে বৈষ্ণব কবিরা একটি-একটি বস্তুর উপমা দিয়ে চলেছেন; যেমন—'কুবলয় নীলরতন দলিতাঞ্জন মেঘপুঞ্জ জিনি বরণ সুছাঁদ'—বর্ণের ও লাবণ্যের ছন্দ একসঙ্গে পাই এখানে। আবার—'মরকত মঞ্জু মুকুর মুখমণ্ডল', কিংবা 'কুবলয় কন্দর কুসুম কলেবর, কালিম কান্তি কলোল'—লাবণ্যের কল্লোল পাচ্ছি। ভাবের লাবণ্য বোঝাতে নানা ভঙ্গি বা ভঙ্গের অবতারণা করেছেন কবিরা; যেমন— 'হেলন কল্পতরু ললিত ত্রিভঙ্গ'—যেমন-তেমন করে তেড়া বাঁকা নয় ভঙ্গিটি। ভুরুর ভঙ্গি— 'কামের কামাল জিনি ভাঙ বিভঙ্গ' আবার যেমন—'ও মুখচাঁদ উজোর, ইহ দিঠি লুবধ চকোর', কিংবা 'অরুণ নিয়ড়ে পুন চন্দ, গোবিন্দ দাস রহু ধন্দ'—লাবণ্যের পরিসীমা না-পেয়ে কবির বিভ্রম ঘটল। বিশেষণ হিসেবে শুধু-যে কথাগুলো নানা পদাবলীতে বসালেন কবিরা তা তো নয়, বিশেষ করে লাবণ্যটি বোঝাতে চেষ্টা পেলেন তাঁরা।

ভাবের ভঙ্গিমার সঙ্গে লাবণ্যের যোগাযোগ দেখলেম, এখন মান পরিমাণের সঙ্গে তার যোগের দু-একটা দৃষ্টান্ত কবিদের কাছে থেকে দেব, যেমন—'বিষদ বারণ বাহু বৈভব', 'কনক লতায় তমালহুঁ কত কত দুহুঁ দুহুঁ তনু বাঁধ', 'মাঝহি মাঝ মহা-মরকত সম শ্যামের নটরাজ', 'অবনি বিলম্বিতবলি বনমাল', 'বনি বনমাল আজানুলম্বিত', 'কামিনী কোটী নয়ননীল উতপল পরিপূরিত মুখচন্দ',—মুখচন্দ্রে লাবণ্য সৌন্দর্য মাপজোখ একসঙ্গে পেয়ে গেলেম। রাধিকার রূপের লাবণ্য জানাচ্ছেন কবি—'পঞ্চম রাগিণী রূপিণী রে',—সুরে লয়ে বিশুদ্ধ রূপের লাবণ্যটি পাই এখানে, আবার 'তনু তনু অতনু অযুত শত সেবিত, লাবণী বরণি না যাই'। চুল বাঁধার ছাঁদ ও লাবণ্য দেখাচ্ছেন কবি—'ধনি কানড়া ছাঁদে কবরী বাঁধে' কিংবা 'দলিতাঞ্জন গঞ্জ কালো কবরী, ক্ষণ উঠত বৈঠে তাহে ভ্রমরী'। হাতপায়ের নখের লাবণ্য—'নখচন্দ্র ছটা ঝলকে অনুপম, হেরি গোবিন্দ দাস তঁহি পরিণাম'।

লাবণ্য যেখানে তরঙ্গিত হচ্ছে মুক্তাফলের কান্তির মতো তারি বর্ণন দিচ্ছেন কবি—

যাঁহা যাঁহা নিকশয়ে তনু তনু জ্যোতি
তাঁহা তাঁহা বিজুরি চমকয় হোতি।
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণে চল চলই
তাঁহা তাঁহা থল-কমল-দল খলই।

*   *   *

যাঁহা যাঁহা ভাঙ্গুর ভাঙ বিলোল
তাঁহা তাঁহা উছলই কালিন্দী হিলোল।
যাঁহা যাঁহা তরল বিলোকন পড়ই
তাঁহা তাঁহা নীল উতপল বন ভরই।
যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস
তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ।

লাবণ্যের ঠিক প্রতিশব্দ ইংরেজি ভাষায় নেই, 'গ্রেস' বললে সবটা বুঝায় না, 'বিউটি' তাও বলা গেল না। লাবণ্য স্বাদ পৌঁছে দেয় সেইজন্য তাকে বলতে পারি 'টেস্ট', লাবণ্য চমৎকার সামঞ্জস্য দেয় ভাবে ভঙ্গিতে মানে পরিমাণে ও রূপের বিভিন্ন অংশে সেজন্য তাকে বলা চলে 'ইউনিটি', এইভাবে 'কোয়ালিটি' এবং 'ব্যালেন্স' তাও এসে পড়ে লাবণ্যের কোঠায়। টেস্ট সম্বন্ধে বিখ্যাত ফরাসি শিল্পী Rodin বলেছেন, 'It is the human soul's smile on the house and its belongings'। লাবণ্য-যোজন ছাড়া এ আর কী বোঝাচ্ছে?—অন্তরের লাবণ্যচ্ছটা বাহিরকে লাবণ্য দিচ্ছে, 'যাঁহা যাঁহা হেরিয়ে মধুরিম হাস, তাঁহা তাঁহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ'। কোয়ালিটি বা গুণ তার বেলাতেও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা লাবণ্যের ইঙ্গিত করলেন—'We say a line, a tone, a colour, an action has quality—when the artist has succeeded in endowing it with such beauty within itself (লাবণ্য-যোজন) that gives an interest quite beyond its purpose as storytelling machinery.'

এইভাবে লাবণ্য বলতে অনেকগুলো হিশেব বোঝায় দেখতে পাচ্ছি—কালে-কালে নানা গজদন্ত নানা রূপ ধরে, পিতলের জিনিশের উপরে মৃদু লাবণ্য আপনা হতে দেখা দেয়, পুরোনো শানের রঙে একটি চমৎকার লাবণ্য আসে যেটা নতুনে থাকে না, প্রাচীন অয়েলপেন্টিংগুলোও এইভাবে একটি স্বতন্ত্র লাবণ্যযুক্ত হয় কালবশে। কাজেই নতুনের লাবণ্য এবং পুরাতনের লাবণ্য দুই প্রকার হল। এমনি আকাশ জল স্থল এদের লাবণ্য ঋতুতে-ঋতুতে বদল হচ্ছে—নবজলধরের লাবণ্য, শরতের মেঘের লাবণ্য, এমনি নানাপ্রকার ভেদ দেখি লাবণ্যে এবং এই লাবণ্য ভেদ দিয়ে বস্তু তাকেও ভিন্ন-ভিন্ন ভাবে পাই আমরা। বর্ষার আকাশ এক ভাব দিচ্ছে এক স্পর্শ দিচ্ছে মনে, শীতের আকাশ অন্য ভাব ধরছে মনে, দিনের আকাশ রাতের আকাশ সকালের আকাশ সন্ধ্যার আকাশ বিচিত্র লাবণ্যে ভরে উঠছে দেখি এবং সেইসঙ্গে মনের ভাবেরও বদল হচ্ছে আমাদের।

জাপানি চিত্রকরেরা যে রেশমের পটের উপর আঁকে অপরূপ তার একটুখানি লাবণ্য আছে। যেমন-তেমন একটা পটে তারা আঁকেই না। আমাদের দেশে মোগল-শিল্পীরা যে- কাগজে আঁকত তার লাবণ্য এখনকার কোনো কাগজেই নেই। আমি অনেককে বলতে শুনেছি যে মোগল-পেন্টিং-এর মতো এখনকার ছবি হতেই পারে না। এইটির প্রধান কারণ হচ্ছে লাবণ্যে-মাজা একটুকরো কাগজের অভাব, আর্টিস্টের ক্ষমতার অভাব নয়। 'যেমন পাটা তেমন পট'—এ তো জানা কথা, দেওয়ালে-আঁকা ছবি আর গজদন্তের পাটায়-আঁকা ছবিতে লাবণ্যের তফাত অনেকটা হয়ে যায়। ছাপাখানায় কিছু ছাপাতে দিলে প্রুফ আসে এক কাগজে, ছাপা শেষ হয় গিয়ে অন্য কাগজে। এখন দুই কাগজের কোয়ালিটি বা গুণ দুই রকমের লাবণ্য দেয়, প্রুফকপির আকাট লাবণ্য এবং প্রকাশিত বইটার কাটছাঁট লাবণ্য সুস্পষ্ট দুটো স্বাদ দেয় চোখে ও মনে। এমনি ছবির বেলাতেও

আসল ছবি আর তার নকল এবং তিন বর্ণ প্রতিলিপি এক লাবণ্য দেয় না, দিতে পারেও না। এই লাবণ্যের ছোঁয়াচ নিয়ে শিল্পকাজের উচ্চ-নীচ ভেদ স্থির করা চলে। একটা মোমের পুতুলের লাবণ্যে আর আসল মানুষটির লাবণ্যে এইভাবে ভেদাভেদ লক্ষ্য করি আমরা এবং বলে থাকি—আহা মেয়েটি যেন মোমের পুতুল! সেকালের গিন্নিদের মনে ননীর পুতলী বলে একটা বিশেষ রকম লাবণ্যের বাটখারা ধরা ছিল—এখনো সুন্দর কিছু বলতে ঐ বিশেষণটা চলছে ভাষায়। আর্টের জগতে কিন্তু নিছক ননীর পুতুলের লাবণ্যের মূল্য বড়বেশি নেই। সংসারে ননীর পুতুল বৌ এনে গিন্নি নিশ্চিন্ত, বৌটি ননী খেয়ে-খেয়ে ক্রমে ননীর তাল হয়ে গিন্নি-জগতে উচ্চস্থান অধিকার করতে চললে খুশিই হত সেকালে সবাই, কিন্তু ছবিতে মূর্তিতে এরূপ ঘটনা লাবণ্যে ঘটতে দিলে বাড়াবাড়ি হয়ে পড়ে। এই অতিলাবণ্যের নিদর্শন বাঙলার নধরমূর্তি মহাদেবের অঙ্গে সুস্পষ্ট বিদ্যমান—জার্মান প্রিন্ট তাতেও পাবে। বিবাহের সময় মেয়েরা 'শ্রী' বা ছিরী বলে মাখনের তাল গড়ে তোলে সেইটেই পুরাকালের লাবণ্যময়ীর আদর্শ ছিল হয়তো! এই ননীর পুতুলে যেমন অতিলাবণ্য দেখি তেমনি পিটুলির পুতুলে আর-একরকম অতি-র দেখা পাই, কাজেই আর্টের দিক থেকে লাবণ্যযোজনের বেলাতেও বলা চলল—'অতিশয় কিছু নয়'।

বিশ্বকর্মা লাবণ্য দিচ্ছেন সকল রূপে সকল ভাবে নানা উপায়ে—আলো ছায়া দিয়ে রঙ-বেরঙ মিলিয়ে, কঠোরে কোমলে একত্র বেঁধে। নিছক কড়ি নিছক কোমল সুর নিয়ে সংগীতে যেমন কাজ হয় না বিশ্বজগতেও সৌন্দর্যসৃষ্টি রসসৃষ্টির কাজে আসে না নিছকের নিয়ম; সেখানে দেখি—একেবারে ভয়ঙ্কর শক্ত পাথর, তার উপর দিয়ে বইছে একেবারে তরল ঝরনা, নয়তো সবুজ শেওলাতে কোমল হয়েছে পাথরগুলো। পাহাড় শক্ত ঠেকে তখনই যখন তাকে বিচ্ছিন্নভাবে নিয়ে হাতুড়ি পিটে দেখি, কিন্তু আকাশের আলো যখন তাকে নানা লাবণ্যে বিভূষিত করেছে তখন কতখানি কমনীয় হয়ে গেছে পাহাড় তা তো দেখতেই পাই। জলের মধ্যে সবটা তরল বস্তু, মেঘ সবটাই বাষ্প, কিন্তু আশ্চর্য উপায়ে বিশ্বশিল্পী তিনি জলেতে মেঘেতেও কড়ি এবং কোমল দুই সুরই ধরেছেন, বাতাসেও কখনো ঘন কখনো ফুরফুরে কখনো তীব্র কখনো ক্ষুরধার নানা লাবণ্য দিয়ে পাঠাচ্ছেন শিল্পী। জয়দেবের কোমলকান্ত পদাবলীটাই কেবলি বাজছে না বিশ্ববীণাতে, সেখানে জীবন-মরণ হাসি-কান্না আলো-অন্ধকার সবই বাজছে একসঙ্গে সুরে বেসুরে চমৎকার, এবং সমস্ত ব্যাপারটি দেখি একটি লাবণ্যের পরিপূর্ণতার ঘেরে ধরা পড়ে যাচ্ছে—একেই আর্টের ভাষায় বলা হয় ইউনিটি। লাবণ্যের ঘেরের মধ্যে বিচিত্র রূপ প্রমাণ ভাব ভঙ্গি সবই একটি অপূর্ব একতা পাচ্ছে কি না এইটেই লক্ষ্য করবার বিষয় ছবিতে মূর্তিতে। হাড়েমাসে জড়িত দিব্য লাবণ্যযুক্ত শরীর—তার স্থানে আছে আর্ট, কিন্তু শুধু মাস শুধু হাড় বা কঙ্কাল রূপসৃষ্টির বেলাতে অদেয়। পৃথক ভাবটা ঘুচিয়ে না দিলে কিছু কিছু লবণ সংযোগ না করে উপায় নেই। পাখির পালকে প্রজাপতির ডানাতে কিংখাব মখমলের কাপড়ে যে-লাবণ্য তা শুধু কোমল সুর দিয়ে তৈরি হয় না—শক্ত সোনার তার, শক্ত কাঁটা, আঁষ, বিচিত্র বিভিন্ন রকমের কত কী দিয়ে এই লাবণ্যের সৃষ্টি করে আর্টিস্ট তবে চোখে লাগে মনে ধরে রচনাটি। লাবণ্য-যোজনের কৌশল শেখা বিদ্যের বাইরের জিনিশ, শিল্পবিদ্যাপীঠে পাঁচটাকা মাইনে দিয়ে ডিগ্রি নিয়ে সেটা দখল করা যায় না। ওটি আপনাতে রইল তো ফুটল, আপনার কাজে লাগল ছোঁয়াচ ওর, তবে সুন্দর হল নিজের ঘরের সাজ ও বাইরের সজ্জা।

দৃষ্টি ও সৃষ্টি

Those organs which guide and animal are under man's guidance and control.—GOETHE.

লক্ষ্য করবার জন্যেই হল চোখ, শব্দ ধরবার জন্যেই হল কান, হাত-পা–রসনা সব কটাই হল রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ ধরে বিশ্বের চারিদিককে বুঝে নেবার জন্যে। সজীব সব মানুষেরই বুদ্ধির চারিদিকে ইন্দ্রিয়সকল নানা শক্তিশেল নিয়ে খবরদারি কাজে দিনরাত ব্যস্ত রইল, এই হল স্বাভাবিক ব্যাপার; অথচ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ, কিংবা দশরথের শব্দভেদ এমনি নানারকম ভেদবিদ্যার কৌশল শিক্‌রে পাখি থেকে আরম্ভ করে শিকারি মানুষে যখন লাভ করল, দেখলেম তখন সেই জীব অথবা মানুষ নিজের চোখ কান হাত পা ইত্যাদিকে অস্বাভাবিক রকমে অসাধারণ শক্তিমান করে তুললে;—এই কথাই বলতে হয় আমাদের। ছেলেকে অক্ষর চিনতে শেখালে, বই পড়তে শেখালে তবে সে আস্তে-আস্তে চোখে দেখতে পায় কী লেখা আছে, বুঝতে পারে পড়াগুলো, এবং ক্রমে নিজেরই রচনা করার শক্তি পায় একদিন হয়তোবা। যে-মানুষ কেবল অক্ষর-পরিচয় করে চলল, আর যে-অক্ষরগুলোর মধ্যে মানে দেখতে লাগল, আবার যে-রচনার নির্মাণকৌশল ও রস পর্যন্ত ধরতে লাগল এদের তিনজনের দেখাশোনার মধ্যে অনেকখানি করে পার্থক্য-যে আছে তা কে না বলবে! কাজেই দেখি—শিল্পই বলো আর যাই বলো কোনোকিছুতে কুশল হয় না চোখ হাত কান ইত্যাদি, যতক্ষণ এদের স্বাভাবিক কার্যকরী চেষ্টাকে নতুন করে সুশিক্ষিত করে তোলা না যায় বিশেষ-বিশেষ দিকে—বিশেষ-বিশেষ উপায় আর শিক্ষার রাস্তা ধরে। এই শিক্ষার তারতম্য নিয়ে আমাদের সচরাচর মোটামুটি দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির সঙ্গে শিল্পীর ও গুণীর দেখাশোনার পার্থক্য ঘটে। ছবি কবিতা সুর-সার প্রভৃতি অনেক সময়ে যে আমাদের কাছে হেঁয়ালির মতো ঠেকে তা দুই দলের মধ্যে এই পরখ পরশের পার্থক্যবশতই হয়। কথাই আছে—'কবিতারসমাধুর্য্যম্ কবির্বেত্তি'; ঠিক সুরে-সুর মেলা চাই, না হলে যন্ত্র বললে 'গা,' কণ্ঠ বলে উঠল 'ধা'।

জেগে দেখার দৃষ্টি ধ্যানে দেখার দৃষ্টির সঙ্গে মিলতে তো পারে না, যতক্ষণ-না ধ্যানশক্তি লাভ করাই নিজেকে। এইজন্যেই কবিতা-সংগীত-ছবি এসবকে বুঝতে হলে আমাদের চোখ কানের সাধারণ দেখাশোনার চালচলনের বিপর্যয় কতকটা অভ্যাস ও শিক্ষার দ্বারায় ঘটাতে হয়, না হলে উপায় নেই। মানুষের সৃষ্টি বুঝতে যদি এই নিয়ম হল তবে সৃষ্টিকর্তার রচনাকে পুরোরকম বুঝেসুঝে উপভোগ করার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার-যে অপেক্ষা রাখে তা বলাই বাহুল্য।

The scene which the light brings before our eyes is inexpressively great, but our seeing has not been as great as the scene presented to us : we have not fully seen ! We have seen mere happenings, but not the deeper truth which is measureless joy.'—RABINDRANATH.

মোটামুটি দৃষ্টি—তীক্ষ্ণদৃষ্টি, অন্তর্দৃষ্টি, দিব্যদৃষ্টি—এর মধ্যে মোটামুটি রকমের কার্যকরী দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি সমস্ত জীবেরই থাকে; তার উপরে উঠতে হলেই শিক্ষা ও অভ্যাস দিয়ে চক্ষুকর্ণের সাধারণ দেখাশোনার মধ্যে অদলবদল কিছু-না-কিছু ঘটাতেই হয়। শিক্‌রে পাখি কতবার তার শিকার হারায় তবে তার চোখ এবং ঠোঁট আর আঙুলের নখরগুলো সুশিক্ষিত হয়ে ওঠে মেঘের উপর থেকে লক্ষ্যভেদ করতে—একেই বলে ধরার কায়দা, দেখার কায়দা। এই কায়দা ইন্দ্রিয়সকল লাভ করে অনেকদিনের শিক্ষা ও অভ্যাসে। চা খাবার সময় রুটির টুকরো যখন ফেলে দেওয়া যায়, তখন দেখি কাকগুলো সবাই একই কায়দায় সেগুলো এসে ধরে—মাটিতে রুটি পড়েছে যখন, তখন পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে ঠোঁটে করে সেটা টপ করে তুলে নেওয়াই দেখি সব কাকেরই দস্তুর; কিন্তু চিলগুলো শাঁ করে উড়ে এসে মাটিতে রুটি পৌছোতে-না-পৌছোতে লুফে নিয়ে পালায়। এই নতুন কায়দা আমার সামনে একটা কাককে দিনেদিনে অভ্যাস করে নিতে এই সেদিন দেখলেম এবং লক্ষ্যভেদ বিদ্যার দখলের সঙ্গে-সঙ্গে সাধারণ কাকের দেখাশোনা চালচলন সমস্তই উল্টেপাল্টে গেল তাও দেখলেম। শুধু ঐ একটুখানি শিক্ষা আর অভ্যাসের দরুন কাকের মোটা দৃষ্টি বা স্বাভাবিক দৃষ্টি ও চালচলনের ওলটপালট যদি কাকটা না ঘটাত, তবে সব কাকদের মধ্যে সে অর্জুন হয়ে উঠতে পারত না, কিংবা সময়ে-সময়ে চিলটিকেও সে হারিয়ে দিতে পারত না রুটির লক্ষ্যভেদের সভায় আন্দাজের পরীক্ষায়। কুরু-পাণ্ডবে মিলে একশো পাঁচ ভাই, দ্রোণাচার্য যখন তাদের আন্দাজের পরীক্ষা নিলেন তখন দেখা গেল একশো চার ভায়ের শুধু চোখই আছে—দৃষ্টি আছে কেবলমাত্র অর্জুনের! দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের দিন লক্ষ্যভেদের সময় অর্জুনের এই দৃষ্টিরহস্যের হিশেব আরো পরিষ্কাররূপে পরীক্ষা হয়েছিল। পৃথিবীর ধনুর্ধর একত্র হল স্বয়ংবরে—কৃপ কর্ণ নানা বীর, কিন্তু লক্ষ্যভেদের বেলায় কারো চোখ দ্রৌপদীর রূপের প্রভাব দেখলে, কারো দৃষ্টি নিজের গলার মণিহারের চমক লক্ষ্য করলে, কিন্তু লক্ষ্যভেদের যা আসল সামগ্রী সেটা জলের তলায় ঘূর্ণ্যমান সুদর্শনচক্রের প্রতিবিম্বের আড়ালে একটি বিন্দুর আকারে প্রকাশ পাচ্ছিল। সেটার বিষয়ে একেবারেই রাজারা অন্ধ রইলেন, একা অর্জুনের দৃষ্টি সেটা লক্ষ্য করলে ও বিঁধলে।

অস্থির হয়ে ভ্রমণ করছে এই দুটিমাত্র আমাদের চোখের দৃষ্টি, একটু অন্ধকারে ঝাপসা দেখে, বেশি আলো পেলেও ঝলসে যাবার মতো হয়, দূরবীন না হলে খুব দূরের জিনিশ দেখাই হয় না আমাদের! আবার যখন তিলকে দেখি তখন তালকে দেখি না, তাল দেখতে গেলে তিল বাদ পড়ে যায়। তাছাড়া দৃষ্টি আমাদের সামনেই চলে, পিঠের দিকে যা ঘটছে একেবারেই দেখা সম্ভব হয় না যে-চোখ এখন আছে তার দ্বারা। ঘড়ি যেমন শুধু ঘণ্টা প্রহর গুণে-গুণে আমাদের জানিয়ে দেওয়া ছাড়া আর-কিছু করতে পারে না, গ্রীষ্মের দিন কি শীতের, অথবা দিন দুই প্রহর কি রাত দুই প্রহর, এটা জানাবার সাধ্যই হয় না যেমন ঘড়ির—যতক্ষণ-না ঘড়ির মধ্যে কোনো-একটা বিপর্যয়শক্তি সঞ্চার করে দেওয়া হচ্ছে, তেমনি এই চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটু অদলবদল না-ঘটাতে পারলে চোখ আমাদের ওঠা-বসা চলা-ফেরা এমনি কতকগুলো নির্দিষ্ট কাজের সহায় হয়ে যান্ত্রিকভাবে খবরদারি করতেই নিযুক্ত থাকে। নিত্য চলাচলের পক্ষে যতখানি দরকার শুধু ততটুকু দেখাই, দিনরাতের মধ্যে বস্তু ও ঘটনাগুলোর মোটামুটি খবর পৌছে দেওয়াই হয় এদের কাজ; এই লোক অমুক, ও অমুক, নকিবের মতো এইটুকু ফুকরে যায় চোখ—অমুকের সম্বন্ধে তন্ন-তন্ন খবর নেবার অথবা দেবার সময় নেই। একটা গাড়ি এল, চোখ কান চট করে সেটা ধরলে—মোটামুটি গাড়ির শব্দ, আর-একটা আবছায়া, খুঁটিয়ে দেখার সময় নেই।

গলির মোড়ে একটা ভিড় জমেছে—তার মাঝে পাহারাওলার লাল পাগড়ির লাল রঙের ঝাঁজটা মাত্র লক্ষ্য করেই চোখ—মায় যার চোখ তাকে নিয়ে—কোন্ গলি-ঘুঁজি দিয়ে কেমন করে যে একেবারে গড়ের মাঠে হাজির হয় তার কোনো হিশেব দিতে পারে না! খুব বাঁধা ও খুব প্রয়োজনীয় কাজের ভার নিয়ে দারোয়ান ব্যস্ত থাকে; অভ্যাগত লোককে দেউড়ি ছেড়ে দেবার সময় শুধু মানুষটা চেনা কি অচেনা, ছোকরা কি বুড়ো এমনি মোটামুটিভাবেই দেখে নিয়েই তার কাজ শেষ। ঘুমোচ্ছি এমন সময় ঘরে খট করে শব্দ হল, কি গায়ে কিছু স্পর্শ করলে, অমনি কান হাত পা ইত্যাদি চট করে বুদ্ধিকে গিয়ে খবর দিলে—যন্ত্রের মতো সময়-অসময় জ্ঞান নেই! ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে নিমেষে-নিমেষে চোখ দেউড়ির ঝাঁপ খুলে বাইরেটা উঁকি দিয়ে দেখে নিচ্ছে আর নোট দিচ্ছে মানুষকে—এ হল তা হল, এ গেল সে গেল, এটা দেখা যাচ্ছে, ওটার খবর এখনো আসেনি! নিত্যনৈমিত্তিক কাজের অনেকখানি এইরকম মোটামুটি যান্ত্রিক রকমের দৃষ্টি দিয়েই চোখ আমাদের সম্পন্ন করে যাচ্ছে, এছাড়া অনেকখানি কাজ একেবারে চোখে না-দেখে হাত পা ও গায়ের পরশ এবং পরখ দিয়ে একটু, আর-সব ইন্দ্রিয়ের পরখের অনেকখানি মিলিয়ে করে চলেছি আমরা। জুতো পরায় জামা পরায়, চোখের পরখের চেয়ে গায়ের পরশ বেশি সাহায্য করে—কোন্‌টা আমার জুতো বা জামা চিনিয়ে দিতে।

মানুষের নিত্য জীবনযাত্রার মধ্যে নিবিষ্টভাবে রয়ে-বসে দেখা এত অস্বাভাবিক আর বিরল যে কাজের মধ্যে হঠাৎ থমকে দাঁড়ানো, নয়নভরে কিছু দেখে নেওয়া, স্থির হয়ে কিছু উপভোগ করার সময় পায় না বললেই হয় সাড়ে-পনেরো আনা লোকের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদি—এটা অত্যন্ত অদ্ভুত কিন্তু অত্যন্ত সত্য ঘটনা। এমন ছাত্র নেই যে প্রতি সন্ধ্যায় গোলদীঘির ধারে জমায়েত হয়ে দু-চার ঘণ্টা না-কাটায়, কিন্তু তাদের প্রশ্ন করো—গোলদীঘিটা গোল না চৌকা? হঠাৎ কেউ উত্তর দিতে পারবে না, গোলদীঘির লোহার রেলিঙ ত্রিশূলের আকার না বর্শার ধরন? একশোর মধ্যে একজন ছাত্র চট করে বলতে পারে কি না সন্দেহ। একটা রেলিঙ আছে এইটুকুই টুকে আসছে চোখ মনের নোটবইখানায় যন্ত্রের মতন, রেলিঙের কারুকার্য গড়ন-পেটন নিবিষ্ট হয়ে দেখার প্রয়োজন এবং অবসরের দরকারই বোধ করেনি চোখ। খুব ছোট থেকে খুব বড় বয়সেও আমাদের বুদ্ধির কোঠায় দর্শন স্পর্শন শ্রবণ এরা অহোরাত্র খবর পাঠাচ্ছে; বাইরের ঘটনা বাইরের বস্তুর পরিষ্কার একটি-একটি চুম্বক-রিপোর্ট চটপট বুদ্ধির ঘরে টেলিগ্রাম করাই এদের সাধারণ কাজ। রাতে পোহাল চোখ ঝাঁপ খুলেই দেখলে আলো হয়েছে, অমনি সঙ্গে-সঙ্গে তার গেল বুদ্ধির কাছে—'রাতি পোহাইল, উঠ প্রিয় ধন, কাক ডাকিতেছে কররে শ্রবণ।' সকাল, এই বুদ্ধি অমনি জাগল মানুষের, দ্বিপ্রহরের রোদ চনচনে হয়ে উঠল অমনি স্পর্শন বুদ্ধির কাছে তার পাঠালে 'ভানুতাপে তাপিত ধরণী', মধ্যাহ্ন, বুদ্ধি উদয় হল মানুষের।

এমনি অষ্টপ্রহর বুদ্ধির তাঁবেদারি করতেই কাটছে দিন দর্শনের স্পর্শনের শ্রবণের! একেবারে ঘড়ি-ধরা এদের কাজ একটু এদিক-ওদিক হলেই মুশকিল—কুয়াশা বেশি হলে, বাদলা ঘন হলে এই প্রহরীরা অনেক সময়ে ঠিক ঠাউরে উঠতে পারে না সকাল কি সন্ধ্যে টেলিগ্রামে ভুল থেকে যায়, বিছানা ছাড়তে বেলা হয়, ভাত চড়তে তিনটে বাজে, এমনি নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয় নিত্য কাজে। তখন বারবার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখতে হয়, নয়তো জানলা খুলে বাইরে উঁকি দিতে হয় ক্রমান্বয়ে। শুনে দেখি, চেয়ে দেখি অথবা পরশ করেই দেখি, সাধারণ মানুষের জীবনে এই তিন-দেখার সম্পর্ক হচ্ছে বস্তুজগতের যেগুলো সচরাচর ঘটনা এবং বাইরের যে মোটামুটি খবর তারি সঙ্গে। প্রহরীর কাজ খবরদারির কাজ; এর বেশি কাজ এদের দেওয়ার দরকারই হয় না জীবনে ইতর জীব

থেকে মানুষ পর্যন্ত কারু, অতএব বলতেই হল চোখ কান হাত এমনি সবার স্বাভাবিক কাজ ও অবস্থা হয় চটপট দেখা শোনা ছোঁয়া ও জানা যান্ত্রিকভাবে। চোখে দেখলেম বাইরের পদার্থ তার রূপ রঙ ইত্যাদি, পাঁচ আঙুলের পরশ করে দেখলেম সেগুলো; শুনে দেখলেম বাইরের খবরাখবর, এইভাবে জগতের বস্তু ও ঘটনার বুদ্ধিটা বেড়ে চলল মানুষ থেকে ইতর জীব তাবতেরই। মুখ চোখ কান হাত পা সব দিয়ে জীব যেন পড়ে চলল বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বিদ্যাসাগরের বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ—বড় গাছ, লাল ফুল, ছোট পাতা, কিংবা জল পড়ে, হাত নাড়ে, খেলা করে, অথবা নূতন ঘটি, পুরনো বাটি, কালো পাথর, শাদা কাপড়—শুধু চোখের পড়া; কিংবা যেমন মেঘ ডাকে, অথবা কাক ডাকিতেছে, বাঁশি বাজিতেছে, বেড়াল কাঁদিতেছে, মা বকিতেছে—শুধু শোনার পড়া; অথবা যেমন—শীতল জল, তপ্ত দুধ, নরম গদি, শক্ত লোহা—শুধু পরশ করার পাঠ।

ইন্দ্রিয়সকলের সাহায্যে এই উপায়ে সবাই পড়ে চলেছে শিশুশিক্ষা থেকে বোধোদয় পর্যন্ত, এর বেশি পড়া সাড়ে-পনেরো আনা মানুষ দরকারই বোধ করে না সারাজীবনে। বস্তু ও ঘটনার মোটামুটি বুদ্ধি হলেই চলে যায় সুখে-স্বচ্ছন্দে প্রায় সকলেরই সাধারণ জীবনযাত্রা এবং এই মোটামুটি বুদ্ধির উদ্রেক করে দেওয়ার কাজে লেগে থাকতে থাকতে দর্শন স্পর্শন ও শ্রবণের শক্তিও এমন ভোঁতা হয়ে যায় যে কোনোকিছু সূক্ষ্মদিকে বা গভীর দিকে যেতেই চায় না তারা। শিল্পকার্য সংগীত, এবং কোনো বিষয়ে পটুতা হয় না হতে পারে না ততক্ষণ, যতক্ষণ নানা ইন্দ্রিয়ের নিত্য এবং স্বাভাবিক ক্রিয়ার কতকটা অদলবদল ঘটিয়ে না-তোলা যায়। এমন কল সব আজকাল তৈরি হয়েছে যা চোখ যেমন করে দেখে ঠিক তেমনি করেই দেখে ও ধরে নেয় সৃষ্টির সামগ্রী চট করে নিমেষ ফেলতে! স্পর্শ করে কল, স্পর্শ করে শিউরে ওঠে, দুলে ওঠে, গরম ঠাণ্ডার ওজন-মাপে এবং পরশের তন্ন-তন্ন হিশেব লিখে চলে বাদলা হবে কি ঝড় উঠবে তা বাতাসের পরশ পেয়েই বলে দেয় কল; উত্তর মেরুতে ভূমিকম্প হলে তার হিশেব রাখে দক্ষিণসাগরের পরপারে বসে কল; আবার কল সে শুনছে, যা শুনছে তা লিখছে, যা লিখছে তা শুনিয়ে দিচ্ছে সুর করে বক্তৃতা দিয়ে আবৃত্তি অভিনয় করে পর্যন্ত। কাপড় কাচ্ছে কল, কাপড় ভাঁজ করে কাঁথা সেলাই করছে কল, দ্রুত দৌড়াচ্ছে কল, আকাশে উড়ছে কল! এতে করে মনে হয় এইসমস্ত কল মিলিয়ে একটা কলের পুতুল যদি কোনোদিন ছবি মূর্তি গান ইত্যাদি নানা জিনিশের সমালোচনা করতে এসে উপস্থিত হয় আমাদের মধ্যে তবে খুবই অদ্ভুত হবে সে-ঘটনা, কিন্তু আরো অদ্ভুত হবে কলের পুতুলের ছবি মূর্তি গান কবিতা ইত্যাদির সমালোচনা। বস্তুতন্ত্রতা সেই কলের পুতুলে এত অভ্রান্ত রকমের থাকবে যে ছবি যদি প্রতিচ্ছবি, মূর্তি যদি প্রতিমূর্তি, গান যদি হরবোলার বুলি না হয় তো সে তখনি তার নিন্দা ও কঠিন সমালোচনা করে বসবে, কবিতা কল্পনা এসবকে সে বলবে পাগলামি এবং ঠিক এখন সাধারণ মানুষ আমরা যেমন শিল্পশালায়, সংগীতশালায় বা অভিনয়ক্ষেত্রে ব্যবহার করি, অর্থাৎ বাস্তবের সঙ্গে শিল্পকার্য যতটা মেলে ততটা তার বাহবা দিই, একটু বাস্তবিকতার ভ্রান্তি উৎপাদনের ব্যাঘাত হলে বলে বসি 'দূর ছাই', কলের পুতুলটিও ঠিক সেই ব্যবহারই করবে।

সাধারণত শরীরযন্ত্রগুলো আমাদের প্রবল বস্তুপরায়ণতা নিয়ে দেখতে শুনতে পরশ এবং পরখ করতেই পাকা হয়ে উঠছে দিনের পর দিন। সারাজীবন বারেবারে একই জিনিশ দেখেশুনে পরশ করে, পরখ করতে-করতে কাজের দক্ষতা এমন বেড়ে যায় হাত পা চোখ কানের, যে মেকি টাকা, ভেজাল ঘি, পাকা ও কাঁচা, সরেস ও নিরেস ছোঁয়ামাত্র দেখামাত্র শোনামাত্রই তারা ধরে দিতে পারে; কিন্তু এটুকু হয় শুধু আশপাশের বস্তুগুলোর

সঙ্গে অনেকদিনের পরিচয়বশত। শরীরযন্ত্র, নিত্য ব্যবহারের নিত্য কাজের বস্তু ও ঘটনাগুলোর সম্বন্ধে এই অভ্রান্ত বস্তুপরিচয়ের পাঠ সাঙ্গ করেই থেমে রইল, এই হল সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা দর্শন স্পর্শন শ্রবণ দিয়ে যতটা এগোতে পারি তার চরম পরিণতি। মানুষের দেখা শোনা ছোঁয়া সমস্তই কাজ ও বস্তু এবং বাস্তবিকতার সঙ্গে লিপ্ত হয়ে রইল, নিখুঁত করে চিনে নিতে পারলে, অভ্রান্তভাবে ধরতে পারলে বাইরের এটা ওটা সেটা, এ ও তা, এমন তেমন ইত্যাদি বস্তু ও ঘটনা—এই-যে জ্ঞান একে বলা যেতে পারে বস্তুবুদ্ধি বা বাস্তববুদ্ধি—কিন্তু কিছুতেই একে বলা চলে না বস্তুর রসবোধ শিল্পবোধ সৌন্দর্যবোধ অথবা অর্থবোধ।

মানুষের এই বস্তুগত দৃষ্টি চিরদিন তার স্বার্থবুদ্ধির সঙ্গেই জড়ানো থাকে। নিত্য জীবনযাত্রার সঙ্গে আশপাশ থেকে যারা এসে মিলছে তাদেরই খবর আমরা দিন রাত অভ্রান্তভাবে নিয়ে চললেম এই বস্তুগত দৃষ্টি দিয়ে। ময়রা যেন চমৎকার মিঠাই গড়ে চলল মিঠাইয়ের রসবোধ করার কোনো অপেক্ষা না-রেখেও! কিংবা জহুরি রত্ন-পরীক্ষায় এমন পাকা হয়ে উঠল যে হাতে নিয়েই বলতে পারলে সামগ্রীটা কাচ কি হীরে, সরেস কি নিরেস; অথবা শব্দে কান এত পরিষ্কার হল যে কোথা কোমল কোথা বা অতিকোমল পর্দায় ঘা পড়ছে তা শোনামাত্র ধরে দিলে মানুষ। কিন্তু এই হলেই ময়রার জহুরির ও কালোয়াতের রসবোধ সৌন্দর্য ও সুষমাবোধ সম্পূর্ণ হয়েছে তা জোর করে বলা চলে না। বস্তুজগতের সঙ্গে পরিচয়, বুদ্ধির দিক দিয়ে ঘটিয়ে দর্শন স্পর্শন শ্রবণ মানুষকে খুব দক্ষতা চাতুর্য বুদ্ধির পরিচ্ছন্নতা দিয়ে পাকামানুষ কাজের মানুষ করে দেয় এটা যেমন সত্যি, আবার শুধু গুণগুলি নিয়েই মানুষ গুণী, কবি ও শিল্পী হয় না এটাও তেমনি সত্যি। সুরে কান হলেই-যে মানুষ গান রচনা করতে পারে তা নয়, জহরত চিনলেই-যে সবাই চমৎকার অলঙ্কার রচনা করতে পারে অথবা ভালো রসকরা গড়ে চললেই সে-যে সৃষ্টির রসের রসিক হয়ে ওঠে তাও নয়। বহির্বাটির রাস্তা ঘাট নিয়ম-কানুন সমস্তই যেমন অন্দরমহলের সঙ্গে স্বতন্ত্র তেমনি বুদ্ধির প্রেরণা আর রসবত্তা বিকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা। সদর দুয়ার দিয়ে বুদ্ধির কাছে পৌঁছোচ্ছে সৃষ্টির খবরাখবর, চলাচল কোলাহল করে, অবিরাম অস্থিরগতিতে সমস্তই সেখানে যাচ্ছে আসছে—কারো সঙ্গে দু-দণ্ড রসালাপ করার সময় সেখানে অল্পই মেলে! নিত্য দেখা শোনা দ্বারায় ভালো করে মুখচেনা ঘটলেও কিছুর সঙ্গে অবসরমতো রয়ে-বসে রসের সম্পর্ক পাতানো সদর রাস্তা এবং সদর বাড়িতে ক্বচিৎ সম্ভব হয়; এই কারণেই মানুষের ঘর, কাছারি ঘর, খাবার ঘর, শোবার ঘর, বৈঠকখানা, অফিস ঘর এমনি নানা কুঠরিতে ভাগ করা থাকে। অন্দরে অথবা বৈঠকখানার গানের ও নাচের মজলিশে প্রবেশ করতে হলে যেমন অফিসের চোগা চাপকান ছেড়ে উপস্থিত হতে হয়, কাজের দৃষ্টি কাজের কথা মায় কাজকে পর্যন্ত কড়া পাহারায় বাইরে আটকে, তেমনি রসবোধের রাজত্বে ঢোকবার কালে নিত্যকার দর্শন স্পর্শন শ্রবণের অনেকখানি পরিবর্তন করে চলে মানুষ—এটা কেবল মানুষেই পারে, ইতর জীব পারে না। কাজের সংস্পর্শ থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখার অভ্যাস চোখ কান ও সমস্ত ইন্দ্রিয়কে দেওয়ার ক্ষমতা অনেকখানি সাধনার অপেক্ষা রাখে, তবে মানুষের শিল্পজ্ঞান রসবোধ জন্মায়।

মানুষ অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে কখন? প্রাণের সঙ্গে বাক্যকে, চক্ষুর সঙ্গে মনকে, শ্রোত্রের সঙ্গে আত্মাকে যখন সে মিলিত করে। মানুষের শরীরযন্ত্রটাকে জীবনযাত্রার পথে নানা বিঘ্নবিপত্তি থেকে রক্ষা করে স্বচ্ছন্দে চালিয়ে নেবার কাজের দক্ষ হয়ে উঠল মানুষের ইন্দ্রিয়-কটা নিজের-নিজের পরিপূর্ণ শক্তি অনুসারে; দেখা শোনা ছোঁয়া ইত্যাদি নানা

উপায়ে এইটুকুই হল। আর কাজভোলা দৃষ্টি সে হল অনন্যসাধারণ অস্বাভাবিক দৃষ্টি, শিশুকালের তরুণ দৃষ্টি কবির দৃষ্টি শিল্পীর দৃষ্টি। নিত্য কাজের ব্যাপার সরিয়ে একটা জিনিশে গিয়ে মানুষের দর্শন স্পর্শন শ্রবণ নিবিষ্ট হল নিবিড়ভাবে যখন, তখনই মন পড়ল জিনিশে, এবং মনে ধরা-না-ধরার কথা তখনই উঠল। চোখ কান সমস্তকে কেবলি—পাতা পড়ে জল নড়ে ইত্যাদি কাজের পড়া থেকে ছুটি দিয়ে সৃষ্টির জিনিশের ও ঘটনার দিকে ছেড়ে দেওয়া গেল, এতে মানুষের পরশ ও পরখ করার একটা কৌতূহল দেখা দিলে। কাজের জগতের বাঁধাবাঁধি নিয়মে দেখা শোনা করতে অপটু থাকে শিশুকালে সব মানুষ স্বভাবতই, বাপ মাকে তারা কাজে খাটায় নিজের ইন্দ্রিয়গুলোর চেয়ে, কাজেই সামান্য-সামান্য জিনিশকেও বড়মানুষের চেয়ে বেশি কৌতূহলের সঙ্গে শিশুরা দেখবার অবসর পায়, মন তাদের আকৃষ্ট হয় বস্তুর উপর ঘটনার দিকে অনেকখানি এবং মন তাদের খেলেও অনেকখানি অনেক জিনিশের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে অগাধ কৌতূহলে।

শিশুকালের এই কৌতূহল দৃষ্টির কিছু-কিছু রেশ মানুষের বয়সকালেও নানা জিনিশ ও ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে দেখা যায়—চন্দ্রোদয় সূর্যোদয় শুকতারা ফোটা ফুল মেঘের ঘটা বিদ্যুৎ কিংবা একটুকরো হীরে অদ্ভুত গড়নের ঢেলা অথবা বিচিত্র গড়নের অলঙ্কার কি কিছু অথবা অদ্ভুত একটা সমুদ্রের ঝিনুক ইত্যাদি নানা টুকিটাকি নিয়ে খুব বয়সেও মানুষ অনেক সময়ে নাড়াচাড়া করছে কৌতূহলের বশে দেখা যায়। দক্ষিণাবর্ত শাঁখকে লক্ষ্মীকে ধরে রাখতে খুব কাজের জিনিশ বলে দেখা আর কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্মীপেঁচার একটা পালকের চিত্র-বিচিত্র নকশা দেখা অথবা লক্ষ্মীর ঝাঁপিটা বোনা কিংবা ঘড়ির ঘণ্টা শোনা ও নূপুরের ধ্বনি শোনায় প্রভেদ হচ্ছে ঐ কৌতূহলটি নিয়ে। তরুণদৃষ্টিতে সৃষ্টির সামগ্রী কৌতুকে রহস্যে ভরা দেখায়, কাজের সংস্পর্শে বড় হতে-হতে মানুষ যতই এগোতে থাকে ততই এই দৃষ্টির তারুণ্য সে হারাতে থাকে এবং শেষে এই সমস্ত বিশ্ব তারি সংসারের কাজে লাগবার জন্যে রয়েছে এমনও একটা বিশ্বাস সে করে ফেলে, বিশ্বে যেটাকে কাজের জিনিশ বলে সে নিজে বোধ করে না সেটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনতে চায় না, আর ছবি কবিতা প্রায় সবই বাজের কোঠায় ফেলে দিয়ে চলে মানুষ! স্ত্রী-পুত্র পরিবার পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি টেবিল-চেয়ারগুলোকেও খালি প্রয়োজনের দেখা প্রয়োজনের সম্পর্ক নিয়ে উপভোগ করে চলেছে এমন শক্ত মানুষ বড় অল্প নেই এ-কথা সহজে কেউ বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সকালে খবরের কাগজ পড়ার সময় কানের কাছে ছেলেগুলো শুধু-শুধু হৈচৈ বাধিয়ে দিলে, কিংবা ডিকশনারির পাতাটা ছিঁড়ে নৌকা বানিয়ে বর্ষার দিনে জলে ভাসালে, অথবা দস্তুরমাফিক সাড়ে-দশটায় ঘড়ির কাঁটা পৌঁছোলেই ছেলে ইস্কুলের জন্যে তৈরি না হয়ে বিছানায় গিয়ে সটান শুয়ে পড়লে, ছেলে কাজের ব্যাঘাত করলে, অকেজো হয়ে রইল, কাজের জিনিশ নষ্ট করলে এমনি শিশুচরিত্রকে কাজের চশমা দিয়ে উল্টো বুঝে নিজের চোখ কান লাল করে না-তোলে এমন মানুষ কমই দেখি। কাজের জগতে চলাচল করতে-করতে এই অত্যন্ত কাজের পরকলা এত শক্ত হয়ে আমাদের চোখে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখার উপরে বসে যায় যে মনে হয় চিরদিন এইভাবে দেখে চলাই বুঝি সব মানুষেরই কাজ; কিন্তু অত্যন্ত ছেলেমানুষ যারা তারা আমাদের এই ধারণা উল্টে দিয়ে যায়, কবিরা উল্টে দিয়ে যায়, শিল্পীরা উল্টে দিয়ে যায়, আর ঠিক সেই মানুষগুলিকেই আমরা বালক পাগল নির্বুদ্ধি বলে উড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বুদ্ধিমত্তার দাবি সপ্রমাণ করে চলি।

কিন্তু সৌন্দর্যে ভরা, রসে ভরা, রঙে ভরা, রূপে ভরা, ভাব লাবণ্য সব দিয়ে অনিন্দ্য-সুন্দর করে রচনা করা এই সৃষ্টির মাঝে মানুষ কেবল বুদ্ধিমত্তার সত্তা নিয়ে বর্তে থাকবে

নয়ন ভরে কিছু দেখে নিতে চাইবে না, প্রাণভরে মন দিয়ে কিছু শুনে যেতে চাইবে না, পরশ করে পুলকিত হতে চাইবে না, মানুষ সমস্ত বিশ্বের রস, এ যিনি মানুষকে মন দিয়ে সৃষ্টি করলেন তাঁর ইচ্ছে কখনো হতে পারে না এবং এই কথাই সপ্রমাণ করতে প্রথমেই এল কাজ-ভোলা কাজ-ভোলানো শিশু খুব কাজের জগতে অফুরন্ত কৌতূহল অকারণ হাসি কান্না ইত্যাদি নিয়ে। সেই শিশু, দিন রাত কাজে-কর্মে-ভরা মানুষের ঘরের মধ্যে এসে তার কৌতুক কৌতূহল যারা জাগাল—মাটির ঢেলা, কাঠের টুকরো—তাদের নিয়ে নিরিবিলি আপনার খেলাঘর বাঁধলে—কল্পনা পক্ষিরাজের অতি অপূর্ব আস্তানা, সেখানে কাজ হয়ে গেল একেবারে খেলা, খেলাই হয়ে উঠল মস্ত কাজ! কিন্তু জগৎ সেই শিশুর উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে রইল, শিশুকাল যেমন শেষ হতে থাকল অমনি কাজও কোনো-কোনো শিশুকে আস্তে-আস্তে আপনার ঘরের দিকে টেনে নিতে লাগল, একটু-একটু করে খেলাঘর ভেঙে গেল এবং কচি ছেলেকে কাজের যন্ত্রতন্ত্রগুলো দাঁতে চিবিয়ে ছোবড়া বানিয়ে ছেড়ে দিলে। আবার কোনো ছেলেকে কাজ তেমন করে জোরে ধরতে পারলে না, কিংবা কোনো ছেলেটা কাজে পড়েও বাজের সাধনা অনেকখানি করে চলল, তারাই কাজের চাবুক এড়িয়ে গিয়ে কিংবা সরে গিয়ে হয়ে উঠল ভাবুক, অদ্ভুত কৌশলে তারা তাদের চোখে-দেখা শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা ইত্যাদি যে অত্যন্ত কাজের আফিস-জোড়া তাদের পিঠে পক্ষিরাজের ডানা জুড়ে দিয়ে কাজ বাজাতে না গিয়ে, বাঁশি বাজাতে বেরিয়ে পড়ল জগতে। শিশুকালের হারানো চমৎকারি কাচ অনেক কষ্টে খুঁজে-খুঁজে সেইটে বার করে শাদাসিধে কাজের চোখে-দেখা শুনে-দেখা ছুঁয়ে-দেখার উপরে যেমনি বেশ করে এঁটে দিলে মানুষ, অমনি স্বর্গ মর্ত পাতাল আবার তার কাছে তরুণ হয়ে দেখা দিলে, কৌতুকে কৌতূহলে ভরে উঠল সৃষ্টির সামগ্রী! যেসব ইন্দ্রিয় কেবলি হিশেবের কাজে, পাহারার কাজে লেগেছিল তারা হয়ে উঠল কৌতূহলপরায়ণ এবং সন্ধানী, দিনের পর দিন বস্তুকে নিয়ে ঘটনাকে নিয়ে উল্টেপাল্টে খেলতে আর দেখতে অথবা শুনতে লেগে গেল : শুধু 'জল নড়ে ফল পড়ে' এ পড়ায় আর রুচি হল না, কেমন করে জল চলছে, কেমন করে ফুল ফুটছে ঝরছে, কিবা সুরে পাখি গাইছে, আকাশের তারা কেমন করে চাইছে ইত্যাদি কেমন তা জানার আগ্রহ এবং চেষ্টা জেগে উঠল। শাদাসিধে রকমের বুদ্ধির চাষ করে চলাতেই চোখে-দেখা শুনে-দেখা ছুঁয়ে-দেখা বদ্ধ রইল না। চঞ্চল দৃষ্টি এ-ফুলে ও-ফুলে এখনো উড়ে পড়তে লাগল বটে, কিন্তু হঠাৎ দৃষ্টির চঞ্চলতার মধ্যে এক-একটা সম্ আর ফাঁক পড়তে লাগল, প্রজাপতি যেন হঠাৎ ডানা দুখানা স্থির করে আলোর পরশ, ফুলের পাপড়ির রঙ এবং ফুলের ভিতরকার কথা ধরবার চেষ্টা করতে থাকল! দর্শন স্পর্শন শ্রবণের যান্ত্রিকতা কতকটা দূর হয়ে তাদের মধ্যে আন্তরিকতা একটু যেন বিকশিত হল। যেসব শরীরযন্ত্রের কাজই ছিল বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাইরের প্রেরণায় চটপট সাড়া-দেওয়া নির্বিচারে, অন্তরের সঙ্গে মানুষ যেমনি তাদের মুক্ত করে দিলে অমনি ভিতরকার প্রেরণায় তারা ধীরেসুস্থে একটুখানি যত্নের সঙ্গে একটু কৌতূহল নিয়ে যেন আত্মীয়তা পাতাতে চলল বাইরের এটা ওটা সেটার সঙ্গে, একটু দরদ পৌছোল দেখা শোনা ছোঁয়ার মধ্যে।

এ একটা মস্ত ওলটপালট ঘটল হাত পা চক্ষু কর্ণের কাজের স্বাভাবিক ও যান্ত্রিক ধারায়—উজান টান ধরল যমুনায়। ফুলের পাতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সাড়া ধরার জন্য আচার্য জগদীশচন্দ্রের যে-যন্ত্রটা, সেটা থেকে-থেকে আনমনে যদি ফুলের এবং পাতার শোভা নিরীক্ষণ করতে আরম্ভ করে কাজ ভুলে, তবে নিশ্চয়ই সবাই বলবে যন্ত্রটা বিগড়েছে—যেভাবে দেখা যেভাবে শোনা যন্ত্রটার উচিত ছিল তা করছে না। কিন্তু যন্ত্রের ঐরূপ

ব্যবহার দেখে একটা অত্যন্ত বিস্ময়কর বিপর্যয়শক্তি-যে যন্ত্রটা লাভ করেছে তা কারু অগোচর থাকবে না। তেমনি ইন্দ্রিয়সকলের সাধারণ ক্রিয়ার মধ্যে নিরূপণ-ইচ্ছা নিবিষ্ট হবার চেষ্টা যারা ঘটায় অভ্যাস শিক্ষা ও সাধনার দ্বারায়, বলতেই হবে সেইসব মানুষের দেখা শোনা সমস্তই অনন্যসাধারণ বা অসামান্য রকমের একটা শক্তি পেয়েছে। এই-যে কৌতূহলপ্রবণতা, দরদ দিয়ে সব জিনিশ দেখার অভ্যাস, কাজের দেখার প্রায় বিপরীত উপায়ে সৃষ্টির জিনিশকে আলিঙ্গন করে পরখ করা, ছেলেবেলাকার হারিয়ে-যাওয়া খেলাঘরের কাজ-ভোলা দৃষ্টি—একে ফিরে পাওয়া দরকার কি না, এ নিয়ে মানুষে-মানুষে মতভেদ দেখা যায় কিন্তু একদিনও মানুষ একটিবার সেই ছেলেবেলার দেখা শোনা খেলাধুলোর মধ্যে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলে না এমন ঘটনা মানুষের বিরল। চেষ্টা করলেই ছেলেবেলার সেই কাজ-ভোলা হারানো দৃষ্টি-যে ফিরে পাওয়া যায় তা নয়। নাসার ডগায় দৃষ্টি স্থির করলেও, চাঁদ তারা মেঘ অথবা সূর্যের দিকে উদয়াস্ত হাঁ করে চেয়ে থাকলেও অথবা খাঁচায় কোকিল পুষে তার গান দিন রাত শুনে এবং দক্ষিণ বাতাসকে চাদর উড়িয়ে ছুঁয়েও যোগীর এবং ভাবুকের দৃষ্টি পাচ্ছে না কত যে লোক তার ঠিকানা নেই। শখ করে নানা শৌখিন জিনিশের সাজসজ্জার দিকে অথবা বিচিত্র এই বিশ্বপ্রকৃতির শোভা সৌন্দর্যের দিকে চাওয়া হল বিলাসীর চাওয়া। বেতাল পঁচিশের ভোজনবিলাসী শয্যাবিলাসী এরা সাতপুরু গদির তলায় একগাছি চুল, রাজভোগ চালে শবগন্ধ অতি সহজেই ধরতে পারত, কিন্তু বিলাসীর দেখা প্রকাণ্ড রকম স্বার্থ নিয়ে দেখা অত্যধিক মাত্রায় কাজের দেখা এ দৃষ্টি ভাবুকের দৃষ্টি কিংবা কাজ-ভোলা শিশুর সরল দৃষ্টি একেবারেই নয়, অতিমাত্রায় বস্তুগত দৃষ্টিই এটা! এই ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি নিয়ে শয়নবিলাসী ভোজনবিলাসী দুটোতে মিলে বাসকসজ্জার কবিতা লিখতে চেষ্টা করলে যা হত তা এই—

সুন্দরীর সহচরী ভাল জানে চর্য্যা।
রতন মন্দিরে করে মনোহর শয্যা ॥
দুই দুই তাকিয়া খাটের দুই ধারি।
ডৌল ভাঙ্গি টাঙ্গাইল চিকন মশারি ॥
ভক্ষ দ্রব্য নানা জাতি মণ্ডা মনোহরা।
সরভাজা নিখতি বাতাসা রসকরা ॥
অপূর্ব সন্দেশ নামে এলাইচ্‌দানা।
ফুল চিনি লুচি দধি দুগ্ধ ক্ষীর ছানা ॥

চিনির পানা কর্পূর চন্দন কালাগুরু বিছানা-বালিশ লেপ-তোশক ইত্যাদি দিয়ে যে ত্রিপদী চৌপদী, সেগুলো কবিতা কিংবা ভাবের তিন পায়া চার পায়া টেবিল চৌকি বললেও বলা চলে। বিলাসীর দৃষ্টির সঙ্গে ভাবুকের দৃষ্টির কোন্‌খানে যে তফাত তা স্পষ্ট ধরা যাবে দুই ভাবুকের লেখা বাসকসজ্জার বর্ণনা দিয়ে; যথা—

অপরূপ রাইক চরিত।
নিভৃত নিকুঞ্জ মাঝে, ধনী সাজয়ে
পুনঃ পুনঃ উঠয়ে চকিত ॥

ধুয়োতেই, ভাব-সচকিত চাহনি নিভৃত নিকুঞ্জের অপরূপ শোভা মনকে দুলিয়ে দিলে; আবার যেমন—

আজ রচয়ে বাসক শেজ,
মুনিগণ চিত হেরি মুরছিত
কন্দর্পের ভাঙ্গে তেজ।
ফুলের অচির, ফুলের প্রাচীর
ফুলেতে ছাইল ঘর,
ফুলের বালিশ আলিস কারণ
প্রতি ফুলে ফুলশর ॥

বিলাসীর দৃষ্টিতে ধরা পড়ল ভালো-ভালো কাজের সাজ-সরঞ্জাম যা টপ করে গিলে খেতে ইচ্ছে হয় তাই আর ভাবুকের দৃষ্টিতে ধরা গেল সেইগুলো যাদের দিকে নয়নভরে দু-দণ্ড চেয়ে দেখতে সাধ হয়। বিলাসীর দৃষ্টি স্বার্থের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থেকে সৃষ্টির যথার্থ শোভা সৌন্দর্য ও রসের বিষয়ে মানুষটাকে বাস্তবিকই অন্ধ করে রাখে অনেকখানি, আর ভাবুকের দৃষ্টি কাজ-ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি সৃষ্টির অপরূপ রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে চলে মানুষকে। কাজেই ভাবুকের শোনা-দেখা বলা-কওয়ার মধ্যে শিশুসুলভ এমনতরো সরলতা ও কল্পনার প্রসার থাকে। ভাবুকদৃষ্টি এত অপরূপ অসাধারণভাবে দেখে-শোনে, দেখায়-শোনায়, যে, কাজের মানুষের দেখা-শোনা ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে দেখলে ভাবুকের চোখে-দেখা ছবি কবিতা সমস্তই হেঁয়ালি বা ছেলেমানুষির মতোই লাগে। কাজের দৃষ্টি নিয়ে মানুষের মন কোন্‌খানে কী ভাবেই বা খেলা করছে, আর ভাবুকের দৃষ্টি নিয়েই বা মন কোথায় কী খেলছে কেমন করে, দেখলেই দুয়ের তফাত স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমে কাজের কাজির দেখা দিয়ে লেখা মনের খেলাঘরের দৃশ্য—

মন খেলাওরে দাণ্ডা গুলি
আমি তোমা বিনা নাহি খেলি ॥
এড়ি বেড়ি তেড়ি চাইল,
চম্পকলী ধুলা ধুলী।

এইবার ভাবুকের দৃষ্টি কবির মনটিকে কোন্ কাজ-ভোলা জগতের খেলাঘরের ছুটির মাঝে ছেড়ে দিয়ে গেল তারি দুটি গান—

আকাশে আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া,
বাতাসে আজ কোন্ পরশের লাগে হাওয়া,
অনেক দিনের বিদায় বেলার ব্যাকুল-বাণী,
আজ উদাসীর বাঁশির সুরে কে দেয় আনি,
বনের ছায়ায় তরুণ চোখের করুণ চাওয়া।
কোন্ ফাগুনে যে ফুল ছোটা হল সারা,
মৌমাছিদের পাখায় পাখায় কাঁদে তারা,
বকুল তলায় কাজ-ভোলা সেই কোন্ দুপুরে,
যেসব কথা ভাসিয়েছিলেম গানের সুরে,
ব্যথায় ভরে ফিরে আসে সে গান গাওয়া।

কাজের তীক্ষ্ণদৃষ্টির মাঝে মনের মরুভূমির উপরে যেন হঠাৎ আকাশ থেকে শ্যামল ছায়া নামল, জল ভরে এল চোখের কোণে, কান শুনলে বাঁশির সুর উন্মনা হয়ে, কাজ-ভোলা

মন বকুলতলার নিবিড় ছায়ায় খুঁজতে লাগল ছেলেবেলার হারানো খেলার সাথীকে, আর গাইতে লাগল ক্ষণে-ক্ষণে—

শূন্য করে ভরে দেওয়া যাহার খেলা
তারি লাগি রইনু বসে সকল বেলা।

এমনিতরো ভাবুকদৃষ্টি দিয়ে সব মানুষের শিশুকাল সৃষ্টির যা-কিছু—আকাশের তারা থেকে মাটির ঢেলাটাকে পর্যন্ত—একদিন দেখে চলেছিল, কিন্তু অবোলা শিশুকাল আমাদের কেমন দেখলে কেমন শুনলে সেটা খুলে বলতে পারলে না, এঁকে দেখাতে পারলে না। কবিতা ছবি ইত্যাদি লেখার কৌশল, ভাষার খুঁটিনাটি, ছন্দের হিশেব না-জানার দরুন শিশুকাল আমাদের কবির ভাষায় ছবির ভাষায় আপনাকে ব্যক্ত করতে পারলে না। শিশুর তরুণদৃষ্টির মধ্যে সৃষ্টির সামগ্রীকে সখীভাবে খেলাবার সাথী বলে চেয়ে দেখবার শুনে দেখবার ছুঁয়ে দেখবার একটা আগ্রহ থাকে, সেই একাগ্রতা দিয়ে দেখা শোনা ছোঁয়ার রসটা ছেলেমেয়েরা উপভোগ করে মহানন্দে, কিন্তু সে আনন্দ ব্যক্ত করে কেবল অভিনয় ছাড়া আর-কিছু দিয়ে এমন সাধ্য শিশুর পুঁজি নিয়ে হয় না। শিশু যখন একটা-কিছু বর্ণনা করে তখন তার মুখ চোখ হাত পা সমস্তই যেন ঘটনাটাকে মূর্তি দিয়ে বাইরে হাজির করবার জন্যে আকুলি-ব্যাকুলি করছে দেখা যায়, যেটা বড় হয়ে আমরা কবিতায় অথবা ছবিতে ব্যক্ত করি সেটা অভিনয় করে ব্যক্ত করা ছাড়া শিশুকাল আর-কিছুই করতে পারে না; এমন বিচিত্র ভঙ্গিতে হেসে কেঁদে নেচে, কখনো গলা জড়িয়ে, কখনো ধুলায় লুটিয়ে, আধ-আধ কথায় অতি মনোহর অতি চমৎকারী একটা নিজের অদ্ভুতরকমে সৃষ্টি-করা ভাষায় শিশু আপনার দেখা শোনা সমস্তই ব্যক্ত করে চলে যে, বড় হয়ে যারা আপনাদের দৃষ্টি শ্রবণ স্পর্শনের উপরে অত্যন্ত কাজের চশমা এঁটে দিয়েছে তাদের বোঝাই মুশকিল হয় শিশুকাল অনাসৃষ্টি কী দেখছে, কিবা দেখাতে চাচ্ছে, কী শুনছে কিবা শোনাচ্ছে!

শিশুর হৃদয় যেভাবে গিয়ে স্পর্শ এবং পরখ করে নেয় বিশ্বচরাচরকে, একমাত্র ভাবুক মানুষই সেইভাবে বিশ্বের হৃদয়ে আপনার হৃদয় লাগিয়ে দেখতে পারেন শুনতে পারেন, এবং অবোলা শিশু যেটা বলে যেতে পারলে না সেইটেই বলে যান ভাবুক কবিতায় ছবিতে—রেখার ছন্দে লেখার ছন্দে সুরের ছন্দে অবোলা শিশুর বোল, হারানো দিনগুলির ছবি। অফুরন্ত আনন্দ আর খেলা-দিয়ে-ভরা শিশুকালের দিনরাতগুলোর জন্যে সব মানুষেরই মনে যে একটা বেদনা আছে, সেই বেদনাভরা রাজত্বে ফিরিয়ে নিয়ে চলেন মানুষের মনকে থেকে-থেকে কবি এবং ভাবুক—যাঁরা শিশুর মতো তরুণ-চোখ ফিরে পেয়েছেন। খুব খানিকটা ন্যাকামোর ভিতর দিয়ে নিজেকে এবং নিজের বলা-কওয়াগুলোকে চালিয়ে নিয়ে গেলেই আমাদের সৃষ্টির ও দৃষ্টির মধ্যে তারুণ্য ফিরে পাওয়া সহজেই যাবে এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা—শিশুকাল ন্যাকামি দিয়ে আপনাকে ব্যক্ত করে না, সে যথার্থই ভাবুক এবং আপনার চারিদিককে সে সত্যই হৃদয় দিয়ে ধরতে চায় বুঝতে চায় এবং বোঝাতে চায় ও ধরে দিতে চায়। শুধু সে যা দেখে শোনে সেটা ব্যক্ত করার সম্বল তার এত অল্প যে, সে খানিকটা বোঝায় নানা ভঙ্গি দিয়ে, খানিক বোঝাতে চায় নানা আঁচড়-পোঁচড় নয়তো ভাঙা-ভাঙা রেখা লেখা ও কথা দিয়ে—এইখানে কবির সঙ্গে ভাবুকের সঙ্গে পাকা অভিনেতার সঙ্গে শিশুর তফাত। দৃষ্টি দুজনেরই তরুণ, কেবল একজন সৃষ্টি করার কৌশল একেবারেই শেখেনি, আর-একজন সৃষ্টির কৌশলে এমন সুপটু যে কী কৌশলে যে তাঁরা কবিতা ও ছবির মধ্যে শিশুর তরুণদৃষ্টি আর অস্ফুট ভাষাকে ফুটিয়ে তোলেন তা পর্যন্ত ধরা যায় না।

ন্যাকামো দিয়ে শিশুর আবোলতাবোল আধভাঙা কতকগুলো বুলি সংগ্রহ করে, অথবা শিশুর হাতের অপরিপক্ব ভাঙাচোরা টানটোন আঁচড়-পোঁচড় চুরি করে বসে-বসে কেবলি শিশু-কবিতা শিশু-ছবি লিখে চললেই মানুষ কবি শিল্পী ভাবুক বলাতে পারে নিজেকে এবং কাজগুলোও তার মন-ভোলানো হয়, এ ভুল যারা করে চলে তারা হয়তো নিজেকে ভোলাতে পারে কিন্তু শিশুকেও ভোলায় না, শিশুর বাপ-মাকেও নয়। ছেলে-ভুলানো ছড়া একেবারেই ছেলেমানুষি নয়, তরুণদৃষ্টিতে দেখা শোনার ছবি ও ছাপ সেগুলি—

ও পারেতে কালো রঙ, বৃষ্টি পড়ে ঝম্ ঝম্
এ পারেতে লঙ্কা গাছ রাঙা টুক্ টুক্ করে

গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে!
অজানা কবির গান ছেলেমানুষি মোটেই নয়, এতে ছেলে বুড়ো সবার মন ভুলিয়ে নেয়। আমাদের খুব জানা কবি এই সুরেই সুর মিলিয়ে বাঁধলেন এরি মতো সরল সুন্দর ভাষায় ও ছন্দে আপনার কথা—

ওই যে রাতের তারা
জানিস কী মা কারা?
সারাটি-খন ঘুম না জানে
চেয়ে থাকে মাটির পানে
যেন কেমন ধারা।
আমার যেমন নেইকো ডানা
আকাশেতে উড়তে মানা,
মনটা কেমন করে,
তেমনি ওদের পা নেই বলে
পারে না যে আসতে চলে
এই পৃথিবীর 'পরে।

আমাদের তরুণ-চোখের নয়নতারা একদিন আকাশের তারার দিকে চেয়ে সেসব কথা ভেবেছিল, কিন্তু যে-ভাবনা ব্যক্ত করতে পারেনি আমাদের শিশুকাল, এতকাল পরে সেই ভাবনা ফুটে উঠল কবির ভাষায়।

কাজের চশমা-পরানো দৃষ্টি যেটা বড় হয়ে অবধি মানুষ দর্শন স্পর্শন শ্রবণের উপরে লাগিয়ে চলাফেরা করছে, সেটার মধ্যে দিয়ে উঁকি দিয়ে চললে তারাগুলো মিটমিটে আলোর কিংবা খুব মস্ত-মস্ত পৃথিবীর মতোও দেখায়, কিন্তু আকাশের তারার মাটিতে নেমে আসা দেখা অথবা আকাশে বসে তারাগুলো যে-কথা ভাবছে সেটা শুনিয়ে দেওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না উক্ত চশমা দিয়ে দেখে। ভাবুক যাঁরা, সচরাচর যান্ত্রিক দৃষ্টি যাঁদের নয়, তাঁদেরই পক্ষে সহজ হয় শিশুদের মতো হৃদয় দিয়ে আত্মীয়ভাবে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে পরিচয় করে নিয়ে বিশ্বের গোপন কথা বলা, আর গদ্যময় কাজের সাধারণ চশমা দিয়েই দেখলেম অথচ দেখতে চাইলেম ভাবুকের মতো গাঁথতে চাইলেম পদ্য—কিন্তু পদ্য কেন, ভালো একটা গদ্যও রচা গেল না সেই যান্ত্রিক দৃষ্টি নিয়ে—কল্পনা ভাবুকতা এসবের বদলে সাধারণ কথা এবং কাজের কথাই সেখানে বিকট ছাঁদে আমাদের সামনে হাজির হল; যথা—

মন্ত্রী রূপে চারিদিকে যত তারাগণ
ঘেরিয়াছে নলিনীরে শৈবাল যেমন।
শশী আর তারাবৃন্দ গগনে শোভিত
দেখিলেই মনোপথ হয় প্রফুল্লিত ॥

চাঁদকে ঘিরে তারাগুলো যখন সারারাত কী যেন মন্ত্রণা করছিল, নিশ্চয়ই এই কবিতার কবি সেই সময় লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছিলেন, নয়তো খুব কাজের চশমা পরে মকদ্দমার নথি পড়ছিলেন। সুতরাং 'মনোপথ' যাতে 'প্রফুল্লিত' হয় এমন একটা সামগ্রী তিনি দিয়ে যেতে পারলেন না, কিন্তু ধরতেও পারলেন না চোখ কান হাত পা কিছু দিয়েই।

'ভোলা' 'বাঁকা' হিন্দুস্থানিতে এ দুটোর অর্থ সুশ্রী, আবার কুব্‌জাও বাঁকা শ্যামও বাঁকা, একজন সুন্দর বাঁকা, একজন যৎকুচ্ছিত বাঁকা; তেমনি এ-কথা যদি কেউ বোঝেন যে, সব জিনিশকে সোজাসুজি সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে না-দেখে বাঁকারকম করে দেখলেই কিংবা উল্টোপাল্টা করে দেখলেই নিজের দৃষ্টির মধ্যে এবং নিজের বলা কওয়া লেখা ইত্যাদির মধ্যে ভাবুকতা রস সৌন্দর্য প্রভৃতি ভরে উঠবে কানায়-কানায়, তবে তার মতো ভুল আর-কিছু হবে না।

ভাবুকের কাজ-ভোলা দৃষ্টি অত্যন্ত কাজের সামগ্রী। ধানক্ষেতটা ঠিক কাজের মানুষ হিশেবে না-দেখলেও ক্ষেত ও মাঠের সৌন্দর্য যে নির্ভুল ও নিখুঁতভাবে তার কাছে ধরা পড়ে এবং সেই দৃষ্টি দিয়ে দেখা মাঠের বর্ণনা ও ছবি খুব কাজের চশমা দিয়ে দেখা ও দেখানো মাঠের রূপটার চেয়ে মনোরম পরিষ্কার হয়ে যে ফুটে ওঠে ভাবুকের লেখায় বর্ণে-বর্ণে, তা এই কাজের চশমা আর ভাবের চশমা দিয়ে দেখা ক্ষেত আর মাঠের দুটি বর্ণনা থেকে পরিষ্কার ধরা যাবে।

প্রথম কাজের চশমা দিয়ে মাঠ বর্ণন, মাস্টারমশায় যেন উপদেশ দিলেন শিশুকে—যে মাঠে ছোটাছুটিই করতে চায় তাকে—

হে বালক! মাঠে গিয়ে দেখে এসো তুমি
কত কষ্টে চাষা লোক চষিতেছে ভূমি ॥
পরিপাটি করে মাটি হয়ে সাবধান
তবে তায় শস্য হয়—ছোলা মুগ ধান ॥

এই কাজের দৃষ্টি দিয়ে মাঠকে তো দেখাই গেল না, শস্য কেমন করে হয়, মাটি পরিপাটি হয় কিসে, তাও দেখলেম না; মাটি পরিপাটিরূপে বর্ণন ও দর্শন কী করে হয় তা জানতে কাজেই ভাবুকের কাছে দৌড়োতেই হল আমাদের। সেখানে গিয়ে শস্যক্ষেত্রের এক অপরূপ রূপ দেখলেম—

'নবপ্রবালোদ্গমশস্যরম্যঃ প্রফুল্ললোধ্রঃ পরিপক্বশালিঃ বিলীনপদ্ম প্রপতত্তুষারঃ [১৪]

কিংবা যেমন—

পরিণত-বহুশালি-ব্যাকুল-গ্রাম-সীমা
সততমতিমানজ্ঞক্রৌঞ্চনাদোপগীতঃ ॥ [১৫]

নিছক কাজের দৃষ্টি দিয়ে কাজের মানুষের কাছে মাঠখানা কৃষিতত্ত্বের ও নীতিশাস্ত্রের বইয়ের পাতার মতোই দেখাল, মাঠের সবুজ প্রসার কেমন করে গ্রামের কোন্ পর্যন্ত বিস্তৃত

হয়েছে তা দেখলে ভাবুক। কাজের দৃষ্টি দেখলে মুগ মুশুরি ছোলা কলা ধান ফলানো হচ্ছে মাঠের পাট করে, কিন্তু ধান পেকে কোথায় সোনার মতো ঝকছে, লোধ্র গাছ গ্রামের ধারে কোথায় ফুল ফুটিয়েছে, রাঙা সবুজ নানা বর্ণের শস্য, শিশিরে-নুয়ে-পড়া পদ্মফুল এসব কিছু ধরতে পারলে না অত্যন্ত কাজের কাজি দৃষ্টিটা, অথচ মাঠের ছবি যথার্থ যদি দিতে হয় কি দেখতে হয় মাঠ কেমন করে চষা হয় এটা দেখানোর চেয়ে মাঠে কোথায় কী রঙ লেগেছে কী ফুল ফুটেছে ইত্যাদি নানা হিশেব না নিলে তো চলে না, সে হিশেবে ভাবুক দৃষ্টি ঠিক দেখার মতো দেখাই দেখলে বলতে হবে।

কাজের দৃষ্টি মানুষের স্বার্থের সঙ্গে দৃষ্টির জিনিশকে জড়িয়ে দেখে, আর ভাবুকের দৃষ্টি অনেকটা নিঃস্বার্থভাবে সৃষ্টির সামগ্রী স্পর্শ করে। কাজের মানুষ দেখে কেম্বিসটা পর্দা কি ব্যাগ অথবা জাহাজের পাল প্রস্তুতের বেশ উপযুক্ত, কিন্তু ভাবুক অমন মজবুত কাপড়টা একটা ছবি দিয়ে ভরে দেবারই ঠিক উপযোগী ঠাউরে নেয়। শাদা পাথর, কাজের দৃষ্টি বলে সেটা পুড়িয়ে চুন করে ফেলা, ভাবুক দৃষ্টি বলে সেটাতে মূর্তি বানিয়ে নেওয়াই ঠিক। নির্মম স্বার্থদৃষ্টি, কাজের চোখ নিয়েই সাধারণ মানুষ নিজের মুঠোয় ফুটন্ত ফুলগুলোর গলা চেপে ধরে বলির পাঁঠার মতো, সেগুলোকে বাগানের বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে পুজোর ঘরের দিকে চলে, আর ভাবুক যে-দৃষ্টি নিয়ে ফুলের দিকে চায় তাতে স্বার্থের ভার এত অল্প যে প্রজাপতি কি মৌমাছির পাতলা ডানার অত্যন্ত লঘু অতি কোমল পরশও তার কাছে হার মানে। অতিমাত্রায় সাধারণ অত্যন্ত কাজের দৃষ্টি সেটা ফুলের গুচ্ছকে পরকালের পথ পরিষ্কারের ঝাঁটা বলেই দেখছে, ছেলেবেলার কৌতূহল-দৃষ্টি সেটা রাঙা ফুলের দিকে লুব্ধ দৃষ্টি নিয়ে ডাকাতের মতো বাগান থেকে বাগানের শোভাকে লুটে নিয়ে খেলতে চাচ্ছে। কিংবা বিলাসের দৃষ্টি যেটা ফুলগুলোর বুকে সূঁচ বিঁধে-বিঁধে ফুলের ফুলশয্যা রচনা করে তার উপরে লুণ্ঠন বিলুণ্ঠন করে ফুলের শোভা মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে। এদের চেয়ে ভাবুকের দৃষ্টি কতখানি নিঃস্বার্থ নির্মল অথচ আশ্চর্যরকম ঘনিষ্ঠভাবে ফুলকে দেখলে, ভাবুকের লেখাতেই ধরা রয়েছে—

চল চলরে ভঁবরা কঁবল পাস
তেরা কঁবল গাবৈ অতি উদাস।
খোঁজ করত বহ বার বার
তন বন ফুল্যৌ ডার ডার॥

কবি কালিদাস এই দৃষ্টি দিয়েই দুষ্মন্ত রাজাকে দেখালেন শকুন্তলার রূপ—

অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়মলূনং কররুহৈ....মধুনবমনাস্বাদিতরসম্।' [১৬]

কিন্তু রাজার বিদূষকের ইন্দ্রিয়পরায়ণ দৃষ্টি অত্যন্ত মোটা পেটের মতোই মোটা ছিল, কাজেই রাজার কাছে শকুন্তলার বর্ণন শুনে সে পিণ্ডি খেজুর আর তেঁতুলের উপমা রাজাকে শোনাতে বসে গেল। রাজা বিদূষককে ধমকে বললেন—

অনবাপ্তচক্ষুঃফলোহসি, যেন ত্বয়া দ্রষ্টব্যানাং পরং ন দৃষ্টম্॥ [১৭]

তুমি দর্শনীয় বস্তুর যেটি দেখবার যোগ্য সেইটি যখন দেখতে পেলে না তখন তুমি বিফলই চক্ষু পেয়েছ।

রাবণটার চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা সমস্তই রামের দেখার চেয়ে দশগুণ বেশি ছিল—

কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটা বদন
রাক্ষসের রাজা সেই লঙ্কার রাবণ।
ত্রিভুবন তাহার ভয়েতে কম্পবান
মনুষ্য রামেরে সেটা করে কীটজ্ঞান।

রাবণের দশটা মাথার মধ্যে কী ভয়ঙ্কর রকম বস্তুগত বুদ্ধিই দিনরাত প্রবেশ করত তার দশদিকে বিস্তৃত দর্শন স্পর্শন শ্রবণ ইত্যাদির রাস্তা ধরে, ভাবলেও অবাক হতে হয়। কিন্তু সীতার পণ ভাঙা সুসাধ্য হল বালক রামের—কুড়ি হাত রাবণের নয়। কেননা ধনুকভঙ্গের সময় রামের মনটি রামের হাতের পরশে গিয়ে যুক্ত হয়েছিল, আর রাবণের মন নিশ্চয়ই সীতার দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়েছিল, ধনুক-তোলা ধনুক-ভাঙা যে-কটা আঙুলে হতে পারে তাদের ডগাতেও পৌঁছোয়নি সময়মতো।

দিনরাতের মধ্যে যেসব ঘটনা হঠাৎ ঘটে কিংবা আকস্মিভাবে উপস্থিত হয় প্রতিদিনের বাঁধা চালের মধ্যে সেগুলোকে মানুষ খুব কাজে ব্যস্ত থাকলেও অন্তত এক পলের জন্যেও মন দিয়ে না-দেখে থাকতে পারে না। হঠাৎ পুব কি পশ্চিম আকাশ রঙে রাঙা হয়ে উঠল; দৃষ্টির সঙ্গে মন তখনি যুক্ত হয়ে দেখে কী হল; পাড়ায় ট্রামের ঘণ্টার টুংটাং-এর উপরে হঠাৎ কোনো সকালে বাঁশির সুর বাজলে মন বলে ওঠে : কী শুনি! হঠাৎ দক্ষিণ বাতাস ঘরের ঝাঁপটা নাড়িয়ে দিলে, মন যেন ঘুম ভেঙে চমকে বলে : শীত গেল নাকি দেখি! পাড়ার যে-ছেলেটা প্রতিদিন বাড়ির সামনে দিয়ে ইস্কুলে যায় তাকে দু-একদিনেই চিনে নিয়ে চোখ ছেলেটার দিকে ফেরা থেকে ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু সেই ছেলেটা হঠাৎ বাঁশি বাজিয়ে বর সেজে দুয়োর-গোড়া দিয়ে শোভাযাত্রা করে যখন চলে তখন নয়ন মন শ্রবণ সবাই দৌড়ে দেখতে চলে—আর সেই দেখাটাই মনের মধ্যে লুকোনো রস জাগিয়ে দেয় হঠাৎ। তা রাঘবং দৃষ্টিভিরাপিবন্ত্যো, নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা। [১৮]—যা হঠাৎ এল তার দিকে, সমস্ত ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের আকৃষ্ট হবার একটা চেষ্টা থেকে-থেকে জাগে আমাদের সকলেরই। কিন্তু বাইরে থেকে প্রেরণাসাপেক্ষ চোখ কান ইত্যাদির এই কৌতূহল সব সময়ে জাগিয়ে রাখতে পারেন কেবল ভাবুকেরাই। বিশ্বজগৎ একটা নিত্য উৎসবের মধ্যে দিয়ে নতুন- নতুন রসের সরঞ্জাম নিয়ে ভাবুকের কাছে দেখা দেয় এবং সেই দেখা ধরা থাকে ভাবুকের রেখার টানে লেখার ছাঁদে বর্ণে ও বর্ণনে, কাজেই বলা চলে বুদ্ধির নাকে চড়ানো চলতি চশমার ঠিক উল্টো এবং তার চেয়ে ঢের শক্তিমান চশমা হল মনের সঙ্গে যুক্ত ভাবের চশমাখানি।

এমন মানুষ নেই যার শ্রবণের সঙ্গে ছুটির ঘণ্টা আর কাজে যাবার ঘণ্টার ছেলেবেলা থেকেই বিশেষ যোগাযোগ আছে; কিন্তু সচরাচর এত কাজের ভিড়ে মানুষকে ঘিরে থাকে যে-ভাবুক, মন দিয়ে এই ঘণ্টা শুনে যতক্ষণ-না বলে দেন ঘণ্টা দুটো কী বলে ততক্ষণ ঘণ্টাটা শোনাই আমাদের হয়নি—যথার্থভাবে এ-কথা বলা যায়। সবারই কানে আসে সন্ধ্যাপুজোর শঙ্খধ্বনি, সন্ধ্যায় আঁধার-করা ছবি চোখে পড়ে সবারই, কিন্তু সেই শঙ্খধ্বনি সন্ধ্যারাগের সঙ্গে মিলিয়ে সুর দিয়ে ছন্দ দিয়ে একটি অপরূপ রূপ ধরিয়ে যখন ভাবুক মানুষ আমাদের শুনিয়ে দিলেন দেখিয়ে দিলেন কেবল তখনই তো সন্ধ্যা, সন্ধ্যাপুজো এমনকি সন্ধ্যাকালের এই পৃথিবীকে যথার্থভাবে দেখতে শুনতে পেলেম আমরা—

সন্ধ্যা হল গো—
ওমা সন্ধ্যা হল বুকে ধর
অতল কালো স্নেহের মাঝে

ডুবিয়ে আমায় স্নিগ্ধ কর ॥
ফিরিয়ে নে, মা, ফিরিয়ে নে গো
সব যে কোথায় হারিয়েছে গো
ছড়ানো এই জীবন, তোমার
আঁধার মাঝে হোক না জড় ॥
আর আমারে বাইরে তোমার
কোথাও যেন না যায় দেখা
তোমার রাতে মিলাক আমার
জীবন-সাঁঝের রশ্মিরেখা ॥
আমায় ঘিরি আমায় চুমি
কেবল তুমি কেবল তুমি!
আমার বলে যাহা আছে, মা
তোমার করে সকল হর ॥

বুক সন্ধ্যার বুকের স্পন্দন অনুভব করলে, নয়নের দৃষ্টি অতল কালোর স্নেহভরা পরশ নিবিড় করে উপভোগ করলে, ফিরে এল নতুন করে তরুণদৃষ্টির করুণ চাহনি, নতুন করে জাগল প্রাণভরে শুনে নেবার গেয়ে ওঠবার ইচ্ছা, সারা সংসারে ছড়ানো জীবনের দিনগুলো সাঁঝের আঁধারের মধ্যে দিয়ে মিলল এসে একেবারে।

সন্ধ্যাতারার কোলের কাছটিতে রহস্যনিকেতনে, আলো আর কালোর ছন্দে প্রাণকে দুলিয়ে দিলে, রাতের সুরে গিয়ে মিলল দিনের সুর, আঁধারে গিয়ে মিশল—আলো। একেবারে ঢেলে দেওয়া গেল সব স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে নিজকে গভীর রিক্ততার প্রশান্ত আলিঙ্গনে। সন্ধ্যা, কতদিন ধরে যার সঙ্গে দেখা-শোনা হয়ে আসছে তাকে এমন করে দেখা ক'জন দেখলে? নিত্য সন্ধ্যার হাওয়াটা গড়ের মাঠে গিয়ে খেয়ে এসে এবং পুজোবাড়িতে গিয়ে শাঁখ-ঘণ্টা শুনে এসে আমরা পুঁথিগত ত্রিসন্ধ্যার মন্ত্রগুলোর চেয়ে একটুও অধিক দেখতে শুনতে পেলেম না। কিন্তু কবীর দু-ছত্রে সমস্ত সন্ধ্যার প্রাণটি এক-মুহূর্তে টেনে আনলেন আমাদের দিকে—

সাঁঝ পড়ে দিন বীতরে
চকরী দীন্হা রোয়।
চল চকরা বা দেশকো
জঁহা রৈন ন হোয় ॥

এ কোন্ অগম্য দেশের খবর এসে পৌঁছোল! রাত্রির পরপারে যুগল-তারার রাজত্বে যাবার সকরুণ ডাক, ভীরু পাখির গলার সুর ধরে এ কোন্ চির-মিলনের বাণী অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে এসে পৌঁছোল যারা দেখেও দেখছে না শুনেও শুনছে না ধরেও ধরতে পারছে না তাদের কাছে!

যে-চোখের দেখায় সন্ধ্যার অন্ধকার রাত্রির কালিমা শুধু আমাদের শঙ্কা আর সংশয়বুদ্ধিই জাগিয়ে তোলে, ভাবুকের দেখা কি সেই চলতি চোখ দিয়ে দেখা, না তেমন শোনা দিয়ে, তেমন পরখ দিয়ে চেয়ে-দেখা, শুনে-দেখা, ছুঁয়ে-দেখা? এ সে ভাবুকের কবির শিল্পীর সেই দিব্যদৃষ্টি, যা অন্ধকারে আলো দেখলে, দুঃখের পরশেও আনন্দ পেল, অসীম স্তব্ধতার ভিতরে সন্ধান পেয়ে গেল সুরের—

তিঁবির সাঁঝকা গহিরা আবৈ
ছাবৈ প্রেম মন অসেঁ
পশ্চিম দিগকী খিড়কী খোলো
ডুবহু প্রেম গগন মে
চেত-সংবল-দল রস পিয়োরে
লহর লেহ যা তনমেঁ ॥
সংখ ঘন্টা সহ নাই বাজে
শোভা-সিন্ধু মহল মেঁ ॥

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, আঁধারের প্রেম তনু মনকে আবৃত করলে, আলো যেদিকে অস্ত যাচ্ছে সেই দুয়ার খোলো, এই সন্ধ্যাকাশের মতো বিস্তৃত অন্ধকারের প্রেমে নিমগ্ন হও, চিত্ত-শতদল পান করুক রাত্রির রস, মনে লাগুক মনে ধরুক অতল কালোর প্রেমলহরি, সীমাহীন গভীরে বাজতে থাকুক আরতির শঙ্খঘণ্টা, মিলনের বাঁশি,—আঁধার-সমুদ্রে ফুটে উঠুক অপরূপ রূপ।

এ-যে হৃদয়ে এসে মিলতে চাইল নতুনতরো দেখা শোনা ছোঁয়া দিয়ে বিশ্বচরাচরের সঙ্গে। আগে আসছিল মানুষের বাইরেটা তার বুদ্ধির গোচরে ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় যন্ত্রে ধরা, এখন চলল মানুষের অন্তরটা বাইরের সঙ্গে মিলতে হাতে-হাতে চোখে-চোখে গলায়-গলায়—বাইরের আসা এবং বেরিয়ে যাওয়া এরি ছন্দ আবিষ্কৃত হল ভাবুক মানুষের জীবনে। অভিনিবেশ করে বস্তুতে ঘটনাতে নিবিষ্ট হবার শিক্ষা ও সাধনায় আপনার কার্যকরী ইন্দ্রিয়শক্তি সকলকে নতুনতরো শক্তিমান করে তুললেন যে-মুহূর্তে ভাবুক—সৌন্দর্যে অর্থে সম্পদে সৃষ্টির জিনিশ ভরে উঠল, জগৎ এক অপরূপ বেশে সেজে দাঁড়াল মানুষের মনের দুয়ারে; বারমহল ছেড়ে অভ্যাগত এল যেন অন্দরের ভিতর ভালোবাসার রাজত্বে। রসের স্বাদ অনুভব করলে মানুষ, যেটা সে কিছুতে পেতে পারত না যদি সে ইন্দ্রিয়সমস্তকে কেবলি প্রহরী ও মন্ত্রীর কাজ দিয়ে বসিয়ে রাখত বুদ্ধির কোঠার দেউড়িতে। এই নতুন শিক্ষা, নতুন সাধনা যখন মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো লাভ করলে, তখন মানুষের কণ্ঠ শুধু বলা-কওয়া হাঁকডাক করেই বসে রইল না; সে গেয়ে উঠল। হাতের আঙুলগুলো নানা জিনিশ স্পর্শ করে নরম গরম কঠিন কি মৃদু ইত্যাদির পরখ করেই ক্ষান্ত হল না, তারা সংযত হয়ে তুলি বাটালি সূঁচ হাতুড়ি এমনি নানা জিনিশকে চালাতে শিখে নিলে, বীণাযন্ত্রের উপরে সুর ধরতে লাগল হাত আঙুলের আগা, শুধু লোহার তারকে তার মাত্র জেনেই ক্ষান্ত হল না, সুরের তার পেয়ে যন্ত্রের পর্দায়-পর্দায় বিচরণ করতে থাকল আঙুলের পরশ গুনগুন স্বরে ফুলের উপরে ভ্রমরের মতো, কোলের বীণার সঙ্গে যেন প্রেম করে চলল হাত, কান শুনতে লাগল প্রেমিকের মতো কোলের বীণার প্রেমালাপ। সরু সূঁচের সোনার সুতোর রঙে-ভরা তুলির সজীব ছন্দ ধরে তালে-তালে চলল আঙুল, হাতুড়ি বাটালির ওঠা-পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাণ্ডবনৃত্য করতে শিক্ষা নিলে শিল্পীর হাত—কাজের ভিড় থেকে মানুষের চোখ ও হাত, সেইসঙ্গে মনও ছুটি পেয়ে খেলবার ও ডানা মেলবার অবসর পেয়ে গেল।

সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে সৃষ্টির দিকে এই অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি—এইটুকুই ভাবুকের সাধনার চরম হল তা তো নয়, সৃষ্টির বাইরে যা তাকেও ধরবার জন্যে ভাবুক আরো এক নতুন নেত্র খুললেন—খুবই প্রখর দৃষ্টি যার এমন যে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তাকেও হার মানালে মানুষের এই মানস-নেত্র, চোখের দৃষ্টি যেখানে চলে না—দূরবীক্ষণের দূরদৃষ্টিরও অগম্য যে-স্থান।

মানুষ এই আর-এক নতুন দৃষ্টির সাধনায় বলীয়ান হয়ে নিজের মনের দেখা নিয়ে বিশ্বরাজ্যের পরপারেও সন্ধানে বেরিয়ে গেল—সেই রাজত্বে যেখানে সৃষ্টির অবগুণ্ঠনে নিজকে আবৃত করে স্রষ্টা রয়েছেন গোপনে—

> যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে যথাপ্সুপরীব দদৃশে
> তথা গন্ধর্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে। [১৯]

এই ব্রহ্মলোক যেখানে ছায়াতপে সমস্ত প্রকাশ পাচ্ছে, গন্ধর্বলোক যেখানে রূপ ও সুর উভয়ে জলের উপরে যেন তরঙ্গিত হচ্ছে, এবং আত্মার মধ্যে যেখানে নিখিলের সমস্তই দর্পণের মতো প্রতিবিম্বিত দেখা যাচ্ছে, সমস্তই দিব্যদৃষ্টিতে পরশ ও পরখ করে নিলে মানুষ। দর্শকের ও শ্রোতার জায়গায় বসে মানুষ দেখবার মতো করে দেখলে, শোনবার মতো করে শুনে নিলে নিখিলের এই রূপের লীলা সুরের খেলা, এবং এরও ওপরে যে লীলাময় মানুষকে সমস্ত পদার্থ সমস্ত বস্তুর সঙ্গে একসূত্রে বেঁধে একই নাট্যশালায় নাচিয়ে গাইয়ে চলেছেন তাঁকে পর্যন্ত ছুঁয়ে এল মানুষ নেপথ্য সরিয়ে। দেখা শোনা পরশ করার চরম হয়ে গেল, তারপর এল দেখানোর পালা। মানুষ এবারে আর-এক নতুন অদ্ভুত অনিয়ন্ত্রিত অভূতপূর্ব সৃষ্টি সাধন করে গুণী শিল্পী হয়ে বসল। এই দৃষ্টিবলে আপনার কল্পনালোকের মনোরাজ্যের গোপনতা থেকে মানুষ নতুন-নতুন সৃষ্টি বার করে আনতে লাগল। যে এতদিন দর্শক ছিল সে হল প্রদর্শক, দ্রষ্টা হয়ে বসল দ্বিতীয় স্রষ্টা। অরূপকে রূপ দিয়ে, অসুন্দরকে সুন্দর করে, অবোলাকে সুর দিয়ে, ছবিকে প্রাণ, রঙহীনকে রঙ দিয়ে চলল মানুষ—

> প্রেমের করুণ কোমলতা
> ফুটিল তা
> সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে প্রশান্ত পাষাণে ॥

গ্রন্থ-নির্দেশিকা

ক্রমিক সংখ্যা	পৃষ্ঠা	যে পুস্তক হইতে গৃহীত
১	১৯	৩।৪৫।২৮ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ (বেঙ্কটেশ্বর প্রেস, বোম্বাই প্রকাশিত)
২	১৯	৩।৪৫।২৯ ঐ ঐ
৩	১৯	৩।৪৫।২৮ ঐ ঐ
৪	২০	৩।৪৫।২৯ ঐ ঐ
৫	২১	?
৬	২৩	৩।৪৫।৩১ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ
৭	২৩	ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
৮	২৩	৩।৪৫।১৮ বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণ
৯	২৪	বাৎস্যায়ণ—কামসূত্রে ১ম অধিকরণ, ৩য় অধ্যায় ১৬শ অনুচ্ছেদে যশোধর পণ্ডিতকৃত জয়মঙ্গলা টীকা
১০	৪১	শিক্ষাষ্টক—চৈতন্যদেব
১১	৪১	১।২ কাব্যপ্রকাশ মম্মটভট্ট (অমরেশ্বর ঠাকুর সম্পাদিত) হইতে গৃহীত
১২	৬২	১৩ শ্লোক, উদ্দীপনাবিভাবপ্রকরণম—উজ্জ্বল নীলমণি (শ্রীপাদ রূপগোস্বামী প্রণীত, হরিদাস দাস প্রকাশিত)
১৩	৬৪	?
১৪	৯১	৪।১ হেমন্তবর্ণনম্, ঋতুসংহারম্, (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ, রাজেন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত)
১৫	৯১	৪।১৮ ঋতুসংহারম্ ঐ
১৬	৯২	২।৪৭ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ৩য় ভাগ)
১৭	৯২	২য় অঙ্ক, অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্
১৮	৯২	৭।১২ রঘুবংশম্ (কালিদাসের গ্রন্থাবলী, ১ম ভাগ)
১৯	৯৫	২।৬।৫ কঠোপনিষৎ

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি '**চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা**'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

"সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলুন, পাঠাভ্যাস বৃদ্ধি করুন"

সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ)

পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচির পুরস্কারের জন্য মুদ্রিত

বিক্রির জন্য নয়